আসানসোল :
কালা শহরের মাফিয়ারা !

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, মূল্য ৫·০০

কলকাতা পুলিস:
এশিয়ার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

বোম্বাই মার্কা প্রেম :
স্রেফ
কেরিয়ারের জন্য ?
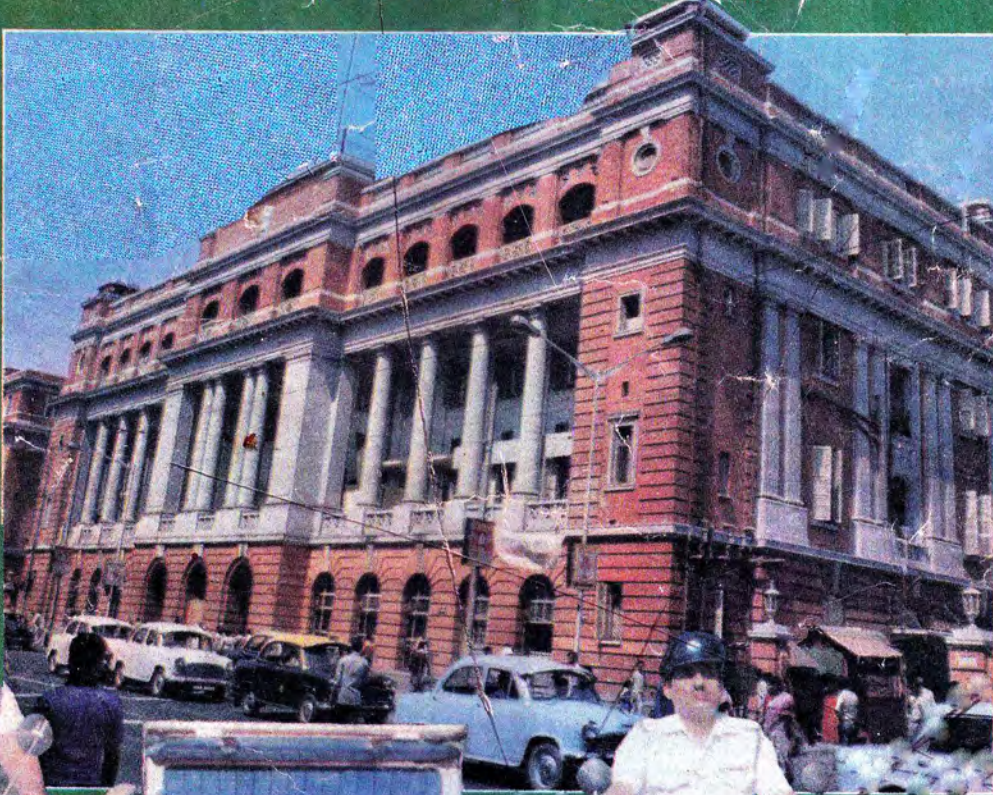
চা বাগানের
জীবন-রহস্য

শ্বেতপাথরের দীর্ঘশ্বাস
মল্লিক পরিবার !

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

অনুমোদিত দোকান:

বি এণ্ড বি এল দে, 'জি' ব্লক, নিউমার্কেট; **পরিধান**, সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে; **যশোদা স্টোর্স**, ১০৩বি, বিধান সরণী; **জগন্নাথ স্টোর্স**, সুভাষ কর্ণার, হাতিবাগান; **কলেজ স্টোর্স**, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট; **পূর্ণিমা**, ডবলিউ/বি, ২৬, এন্টালি মার্কেট; **বিচিত্রা**, ৮৯ রাসবিহারী এভেনু; **রঞ্জিত স্টোর্স**, বেহালা; **অঙ্গশোভা**, গড়িয়া; **স্বর্ণময়ী**, যাদবপুর; **লিব্বাস**, ৫৩এ, এইচ এম রোড; **নিউ ওয়েল**, লেক টাউন; **সাহা ড্রেসেস**, কদমতলা; **রূপ-রঙ্গ**, সালকিয়া; **রাধেশ্যাম বস্ত্রালয়**, কাছারী বাজার, বারুইপুর; **পোদ্দার ব্লাউজ হাউস**, নৈহাটী সুপার মার্কেট; **অশোকা স্টোর্স**, কাঁচড়াপাড়া; **গৌরী স্টোর্স**, বারাকপুর; **তনুশ্রী**, সোদপুর; **গান্ধী স্টোর্স**, মধ্যমগ্রাম; **পূর্বাশা**, শ্রীরামপুর; **তারক এম্পোরিয়াম**, চুঁচুড়া; **অঙ্গশ্রী**, নবগ্রাম, কোন্নগর; **সূর্যকমল**, কাঁথি; **রাম নারায়ণ হরিকিষণ**, মেদিনীপুর; **নিউ টিপ টপ**, গোলবাজার, খড়গপুর; **কিশোর কুমার পারমার**, আনারা; **ব্লাউজ মিউজিয়ম**, আসানসোল; **ফ্যাসন হাউস**, চিত্তরঞ্জন; **ইন্দ্রালয়**, রাণীগঞ্জ; **প্রার্থনা স্টোর্স**, বাঁকুড়া; **জয়শ্রী**, পুরুলিয়া; **গৌরী ড্রেসেস**, মালদা; **অন্নপূর্ণা ব্লাউজ সেন্টার**, বালুরঘাট; **লেডিস কর্ণার**, প্রভাকর মার্কেট, রামপুরহাট; **ম্যাডামস্**, রায়গঞ্জ; সন্তোষ পাল, বনগাঁ; **পদ্মশ্রী ড্রেসেস**, নালিকুল; **নরুলা ক্লথ হাউস**, মার্কেট বিল্ডিং, ভুবনেশ্বর; **জিতেন ফ্যাক্টরী**, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর।

দ্বিতীয় বর্ষ ■ প্রথম সংখ্যা ■ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক : আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক : রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক : প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক : হাবিব আহসান
গুরুপ্রসাদ মহান্তি

সংবাদদাতা :
দিল্লি : পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ : পারভেজ খান
মাদ্রাজ : নরেশ কুমার
লণ্ডন : বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন : শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস : আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান : রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী : বিকাশ চক্রবর্তী
অঙ্গসজ্জা : শান্তনু মুখোপাধ্যায়

দিল্লি কার্যালয় :
কে.এল. তলোয়ার : ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ : ৩৩১৯২৮৫
টেলেক্স : ০৩১৬১৭১৫ নিউজ ইন

বম্বে কার্যালয় :
জি. কৃষ্ণান; আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮৯০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ : ২৪৩৫৭৭ গ্রাম : মায়াকহানি
টেলেক্স : ০১১২৫৫৭ মায়া ইন

কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয় :
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ : ২৩-৯০৩৫
টেলেক্স : ০২১ ৫১৭৩
ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক : শুভাশিস মজুমদার

প্রধান কার্যালয় :
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ : ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম : মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স : ০৫৪০ ২৮০

প্রকাশক : দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং : মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shillong, Kathmandu and 25 Paise, Agartala

সূচীপত্র

ক্রাইম : পৃষ্ঠা ৫৬

আসানসোল ! পশ্চিমবাংলার কয়লাশহর। কয়লার খনির মতই এই শহরের পাতালপুরীতে ছেয়ে আছে নিকষ অন্ধকার। সেখানের অপচ্ছায়াদের নাম হয়ত ঝাল-পুড়িয়া, আব্বাস, আফতার, ছটুয়া, কস্তুরাঈ বা গুড়িয়া। বিপুল কাল-টাকা, মাসল পাওয়ার আর মাংসল উপাচার আবর্তিত হয় যে শহরকে কেন্দ্র করে, তারই বিপজ্জনক অনুসন্ধান।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন : পৃষ্ঠা ৩৮

বৃহত্তর কলকাতার এক কোটি মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্থিরতার অতন্দ্র রক্ষণ-দায়িত্ব যাঁদের হাতে, সেই কলকাতা পুলিশের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, বাহিনীর গঠন, ইতিহাস, কৃতিত্ব ও গতিময় কর্মধারা নিয়ে এক পুঙ্খানুপুঙ্খ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন।
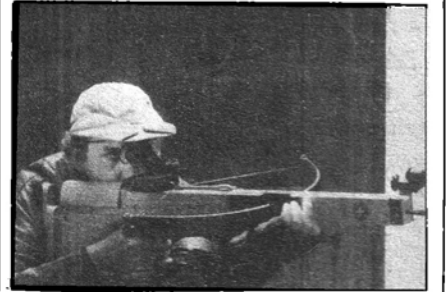
একান্ত প্রতিবেদন : পৃষ্ঠা ১৯

স্যুইস ব্যাঙ্কগুলি কি বিশ্বের কাল টাকার রহস্যময় ভাঁড়ার ? বিশ্বব্যাঙ্ক সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে কোন কোন ভি আই পি-কে নিয়ে বিতর্ক উঠেছে ? প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির এ ব্যাপারে কি কোনও ভূমিকা আছে ? বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং–ই বা কি বলেন ? অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভ সপরিবারে স্যুইজারল্যাণ্ডে রাজ-নৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন কেন ? আলোকপাত ব্যুরোর চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট।

প্রধান সম্পাদকের কলমে

নতুন বছরের প্রথম মাসটি ভাল কাটল তো? বড়দিন থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ারস ডে, সবই তো আপনাদের ভাল কাটবারই কথা। সল্টলেক স্টেডিয়ামে বোম্বের তামাম রূপালি জগত ছিয়াশির আশা নিয়ে হাজির হয়েছিল আপনাদের জন্য। উপরি পাওনা ছিল তথাকথিত গোর্খাল্যান্ডের উপরে দাঁড়িয়ে যৌবনদৃপ্ত প্রধানমন্ত্রীর 'বাংলা ভাগ হতে দেব না'–বলে জোরদার ঘোষণা। শেষ ছিয়াশির সফলতা এবং শুরু–সাতাশির সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।

এই সেই ফেব্রুয়ারি। বাঙলার ভাষা শহীদের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি। একথা আমরা কেউ কি ভুলতে পারি? আমাদের ভাইয়েদের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, বেদনার্ত গৌরবের দিন। যেদিনে শ্রীদেবীর হুল্লোড় নৃত্য কিংবা সুবাস ঘিসিং-এর হুংকারকৃত্য নাড়া দেবে না মনকে। ফেব্রুয়ারির প্রতিটি দিনই ঐতিহ্য স্মরণে। যাঁরা আমাদের মত উত্তর প্রজন্মের জন্য কিছু করে যান, তাঁদের স্মরণ। সেই প্রেক্ষাপটকে মনে রেখেই এই মহানগরে যারা প্রাণপাত পরিশ্রম করে আমাদের রক্ষা করেন এবার তাদের কথা নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। এশিয়ার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড: কলকাতা পুলিশ বাঙলার গর্ব। তাদের দেখি আমরা সমাজের বহুতা ক্ষেত্রগুলিতে। কিন্তু জানি না, কিভাবে তারা কাজ করেন আমাদের জন্য। কলকাতার সমাজ-রক্ষকদের সেই সব অজানা কাহিনী এবার মুখ্য কাহিনী হিসাবে আলোকপাতকে সমৃদ্ধ করবে।

কিন্তু এটুকুতেই ক্ষান্ত নই আমরা। শীতের বাজার জমিয়ে দিয়ে এর সঙ্গে থাকছে স্যুইসব্যাঙ্কে কাদের এত কালো টাকা, বিরোধী দলগুলির ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ, চা-বাগানের মানুষের মুখগুলি। সামনে বইমেলা। সেজন্যই আমরা কলকাতার ইনটেলেকচুয়ালস–কর্ণার কফিহাউসে তরুণমনগুলির কথা ভুলিনি। সেই সঙ্গে বোম্বাই এর প্রেমবিচিত্রা, কলকাতার নস্টালজিয়া, উত্তর-পূর্ব ভারতের হালহকিকৎ, খেলার মাঠে পদচারণা আলোকপাতকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।

আমাদের আগামী সংখ্যাই বর্ষপূর্তি সংখ্যা। তাতে যেমন হরেক সংবাদকেন্দ্রিক আখ্যানমঞ্জরী থাকবে, তেমনি সংযোজিত হবে সাহিত্যের দিকটিও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, এবং অমিতাভ চৌধুরীর মত বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের লেখার পাশাপাশি থাকবে হিন্দি, মারাঠী, পাঞ্জাবী সাহিত্যের অনুবাদ গল্পগুলি। আসুন, বাংলা রিয়েল লাইফ থীমের তিনসঙ্গী– লেখক, পাঠক এবং সম্পাদক সেই বর্ষ উদ্‌যাপন উৎসবের পথ চেয়ে থাকি। শুভমস্তু!

আলোক মিত্র

পাঠকের অধিকার

দ্বিতীয় বর্ষের অভিনন্দন

আলোকপাতের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই। যে যে কারণে আলোকপাত অভিনন্দনের যোগ্য: প্রথমত: এই পত্রিকা নিরপেক্ষতা ও সত্যের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত: সত্যের নগ্ন-মুখ দেখতে যারা আগ্রহী তাদের কাছে আলোকপাত এক নিখুঁত দর্পণ। তৃতীয়ত: সহজ ভাষা ও আঙ্গিক মনকে জয় করে। চতুর্থত: সাবলীল গদ্যের জন্য এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়। পঞ্চমত: এক নিজস্ব চিন্তাধারায় আলোকপাত সর্বদাই বিশিষ্ট। এছাড়া গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের কথাও ভাবে।

আলোকপাত বাংলা পত্রিকা জগতে এক অনন্য সংযোজন।

মনোজ ঘোষ
প্রধান শিক্ষক: করিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নলহাটি, বীরভূম

এ কোন কলকাতা!

আমাদের প্রিয় শহর কলকাতা ক্রমশঃই ম্লান হয়ে পড়ছে। অসামাজিক কাজকর্মে দূষিত হয়ে উঠছে কলকাতার আশপাশ। বেড়াবার জায়গাগুলো এখন সাধারণের ভ্রমণের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভিকটোরিয়া, ইডেন-গার্ডেন্স, কার্জন পার্ক, দেশবন্ধু পার্ক, ঢাকুরিয়া পার্কে সন্ধ্যের শুরুতেই শুরু হয় জঘন্যতম কার্যকলাপ। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই বিষয়ে আলোকপাত কি কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে না?

সোম কুমার
দমদম

ইডেনের মালিক কে?

বৃটিশ ভারতে রাজত্ব করেছিল পাক্কা দু'শ বছর। কিন্তু সব কিছু তারা দখল করতে পারে নি। কিছুকিছু জায়গা রয়ে গিয়েছিল এদেশের মানুষদের। কলকাতার ময়দান এবং ইডেন উদ্যানের বেশ কিছু অংশ ছিল রানী রাসমণির। এই ইডেনের একদিকে বৃটিশরা তৈরি করেছিল একটি ক্রিকেট মাঠ। স্বাধীনতার পরে ওই ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাব মাঠটি ন্যাশনাল ক্রিকেট-ক্লাবের কাছে বিক্রি করে দেয়। এর পরে ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়ল ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব। এবং ক্রিকেট অ্যাসোশিয়েশান অব বেঙ্গলের অফিস স্থান পেল ন্যাশনাল ক্রিকেট প্যাভিলিয়নের পাশে। এর পরের ইতিহাস অস্পষ্ট। তাহলে ইডেনের প্রকৃত মালিক কে? এ ব্যাপারে আলোকপাত করলে কেমন হয়?

রতন চক্রবর্তী
উত্তর হাবড়া
উত্তর চব্বিশ পরগণা

কেঁচো খুঁড়তে সাপ?

সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়াম ভারতবাসীর গর্ব। জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে নির্মিত বৃহত্তম ক্রীড়াকেন্দ্র আজ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্মেলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগে যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শতবর্ষের মে দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। এবার হয়ে গেল হোপ '৮৬। ক্রীড়াঙ্গনে কেন বারবার এই ধরনের সম্মেলন হচ্ছে? এর পিছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে? আলোকপাত করলে বিষয়টি থেকে অনেক সত্য বেরিয়ে আসবে। হয়ত কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে পড়তে পারে সাপও।

মানস কুমার চিনি
মেচেদা, মেদিনীপুর

জেনেটিক হরোস্কোপ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় নানা বৈচিত্রের খেলা। আজ যা ভাবি, কাল তা বাস্তবে পরিণত হয়। জেনেটিক হরোস্কোপও এই বৈচিত্র আর বিস্ময়ের আর একটি উদাহরণ। এই হরোস্কোপ আসলে একটি কম্পিউটারকৃত। এর মাধ্যমে মানুষের চরিত্র-চিত্রণ বাদেও শরীরের বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ করা হয়। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ এখনও অজ্ঞ। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ ব্যাপারে যদি আপনারা আলোকপাত করেন তাহলে অনেকেই উপকৃত হবেন।

নিরঞ্জন পাল
কার্তিক কুম্ভকার
হীরাপুর, বর্ধমান

ভ্রম সংশোধন:

'আলোকপাত' জানুয়ারি '৮৭ সংখ্যায় ভুলক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে তথ্যদপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, কেন্দ্রিয় মন্ত্রী অর্জুন সিং–এর ছবির জায়গায় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং–এর ছবি ছাপা হয়েছিল, এছাড়া ডিসেম্বর '৮৬ তে 'বাবুদের বাগানবাড়ি' রচনাটিতে ডঃ সত্যচরণ লাহার বাড়িটিকে বাগানবাড়ি বলে দেখান হয়েছিল, ভুলগুলির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকের অধিকার বিভাগের চিঠিপত্র আমাদের কলকাতা অফিসে পাঠিয়ে দিন

প্রধান সম্পাদক

বেল্ পলিনেট
নন্-স্লিপ ব্রা

বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৬.৫০)

ত্বকে বাতাস পৌঁছতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশী

'বিমল পলিনেট দিয়ে তৈরি বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠাণ্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না বহুবার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশন দুরস্ত দেখায়।

'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর—এসবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে বেল্ পলিনেট নন্-স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন—কটন টেপ	১১.৫০
কটন—লাইক্রা টেপ	১৭.৫০
কটন-ফোম—লাইক্রা টেপ	২২.৫০
* ২×২ রুবিয়া—কটন টেপ	১৫.০০
* ২×২ রুবিয়া—লাইক্রা টেপ	২২.৫০
বিমল পলি-রুবিয়া—লাইক্রা টেপ	২১.৫০
বিমল পলি-রুবিয়া-ফোম—লাইক্রা টেপ	২৬.০০

* লাল, কালো, গোলাপী এবং গায়ের রঙে

পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা

বেল্ ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪বি সুবারবার্ন স্কুল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৫। ফোনঃ ৪৮-৩৭০৮

ব্যবসায়িক অনুসন্ধানের জন্য উপরের ঠিকানায় লিখুন

অনুমোদিত ডিলারঃ রূপা, এফ/২৮, নিউমার্কেট; বৈজনাথ শ্রীলাল এন্ড কোঃ, বড়বাজার; রহমান রিজ্‌নেবল স্টোরস্, ট্রেজার আইল্যান্ড, গ্লোব সিনেমার বিপরীত দিকে; এস, এন, বাজপাই, ধর্মতলা স্ট্রীট; এইচ এন্ড আর বণিক স্টোরস্, বালিগঞ্জ ফ্যান্সি মার্কেট; আদি চট্টেশ্বরী, ৯১ রাসবিহারী এভিন্যু; আড্ডি এন্ড কোঃ, ৭৪ কলেজ স্ট্রীট; অরবী, হাতিবাগান; শিল্পশ্রী, শ্যামবাজার; কুন্ডু পোষাকালয়, বেহালা; নিউ ন্যাশনাল স্টোরস্ ফুলবাগান; যশোদা বস্ত্রালয়, গোরাবাজার; র‍্যাঙ্ক ওয়ান, বরানগর; ভারত লক্ষ্মী, বেলঘরিয়া; শ্রীগুরু বস্ত্রালয়, বারাসত; জনকল্যান সোসাইটি, বসিরহাট; অরবিন্দ স্টোরস্, হাবড়া; পদ্মাবতী ক্লাউস সেন্টার, নৈহাটী; শ্যামলী, হাসানাবাদ; বসাক ব্রাদার্স, শ্রীমার্কেট, হাওড়া; তপন স্টোরস্, চন্দননগর; রত্নালয়, চুঁচুড়া; দাস ব্রাদার্স রেডিমেড, শ্রীরামপুর; বৈশাখী, বর্দ্ধমান; সুকন্যা, সিউড়ি; পাঞ্জাব ক্লথ স্টোরস্, কাঁথি; স্টাইলো, টাউনশিপ, হলদিয়া; লিবার্টী ড্রেস মিউজিয়াম, তমলুক; মৌমিতা, রানাঘাট; পম্পা, চাকদা; ব্লাউজ মিউজিয়াম, চন্ডীদাস মার্কেট, দুর্গাপুর; জনতা স্টোরস্, স্টেশন রোড, দুর্গাপুর; ব্লাউজ মিউজিয়াম, হকারমার্কেট, খড়গপুর; ফকির চাঁদ জানা, মেদিনীপুর; রীণা ড্রেসেস, শিলিগুড়ি।

দরবারে সাপ

অর্জুন সিংকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হল। টেলিফোন আর ডাক ও তারের মন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে কিস্যার অন্ত নেই। সেবার তো এক সাপুড়ে বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে শেষটায় হয়রান হয়ে গেল। অর্জুনকে টলায় কার সাধ্যি। বিভাকরন্থ দুর্ঘটনায় তো একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থা। ভাগ্য ভালো, কেলেংকারির কোপটা ঘাড়ে বসল না। একটুর জন্য ফস্‌কে গেল সেটা। ফলে ভারত ভবন অক্ষতই রইল। এরপরও সাপুড়েরা যথারীতি 'মেরা মন ডোলে, মেরা তন ডোলে' বন্ধ করে 'বিন্দিয়া চমকেগী' বাঁশি বাজাতে লাগল। কিন্তু অর্জুন ফের আগের মত সাধু সেজে সারা মুখে নির্লিপ্ত ভাব এনে রাখলেন। সাপুড়ে তো পড়ল মহা মুশকিলে। তাহলে অর্জুন তাঁর সাপটা কোথায় রাখলেন ?

ওদিকে দিল্লি দরবারের ব্যস্ততার শেষ নেই। থাইল্যাণ্ড, কাম্পুচিয়া ঘুরে ব্যাংকক হয়ে ঘামে নেয়ে পালামে পা রাখলেন। দরবারের মেজাজ একেবারে গরম। কাগজের লোকেরা তো কাছ ঘেঁষতেই ভয় পেল। প্রকাশ শেঠীর ব্যাপারে দু'কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে নাকালের একশেষ। দিল্লি দরবার ফোঁস করে উঠলেন—'ওসব মিনিস্টেরিয়াল ব্যাপার।' সেই থেকে খবরের কাগজের লোকেরা শতহস্ত দূরে। তার ওপর দিল্লি দরবার নানা ব্যাপারে বড্ড ফ্যাঁসাদে পড়ে আছেন। সেই যে কি এক কেলেংকারির পর প্রকাশ শেঠী বলে গেছেন, 'দিল্লি দরবারের মধ্যে সাপ আছে।' ব্যস। তারপর থেকেই দিল্লি দরবারের মাথায় হাত।

কিন্তু দিল্লি দরবারের ভেতরে সাপুড়ে এনে বাঁশি বাজিয়ে সাপটা কিছুতেই ধরা গেল না। অর্জুন সিং দিব্যি আছেন। কোন ভাবান্তর নেই। অক্টোবরের মাঝামাঝি যখন দিল্লি দরবার বিদেশে ছুটলেন তখনই প্রকাশ শেঠী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দিল্লি দরবারকে সাপ, চোর আর মুর্খেরা ঘিরে আছে।' ১৫ অক্টোবর যখন সাংবাদিকেরা শেঠীর কাছে জানতে চাইলেন দিল্লি দরবারে কারা কারা সাপ, মুর্খ, চোর ইত্যাদি, তখন শেঠীসাহেব শুধু বললেন, অর্জুন সিং সাপ। ব্যস ! তারপর থেকেই তাঁর মুখে তালা। এর পরের দিন অর্জুনকে একথা জানাতে তিনি খুব হালকা ভাবেই বললেন, শেঠীজী যেন রাজীবজীকে বিরক্ত না করেন। আর বেশি কিছু না বলে অর্জুন সিং মৌজসে গোঁফ পাকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শেঠী আবার এক পাল্টা হুমকি ছাড়লেন। তারপর তো শেঠীজী ধপাস করে গদী থেকে চিৎপটাং, অর্জুনের আরেক দফা পদোন্নতি। একেবারে যোগাযোগ মন্ত্রী !

দিল্লি দরবার বিদেশ যাবার আগে তার কোঁচড়ের চাবি হয় ভি পি সিং, নয় পি ভি নরসিমা রাওয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে যান। এর আগে বুটা সিং-এর হাতে চাবি ছিল একবার। কিন্তু বুটা তাঁর কপি সংক্রান্ত কাজটা মোটেই ভালো করেন নি। তাই এরপর তাঁকে আর চাবি দেন নি দিল্লি দরবার। এদিকে শেঠীর -কাণ্ড-কারখানায় অর্জুন ক্ষেপে গিয়ে দিল্লি দরবারের সঙ্গে 'হট লাইনে' কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু ভি পি সিং কিছুতেই লাইন দিতে রাজি নন। তিনি মুখটা গম্ভীর করে বলে উঠলেন : 'হট লাইন সরকারি, এটা পার্টির ব্যবহারের জন্য নয়।'
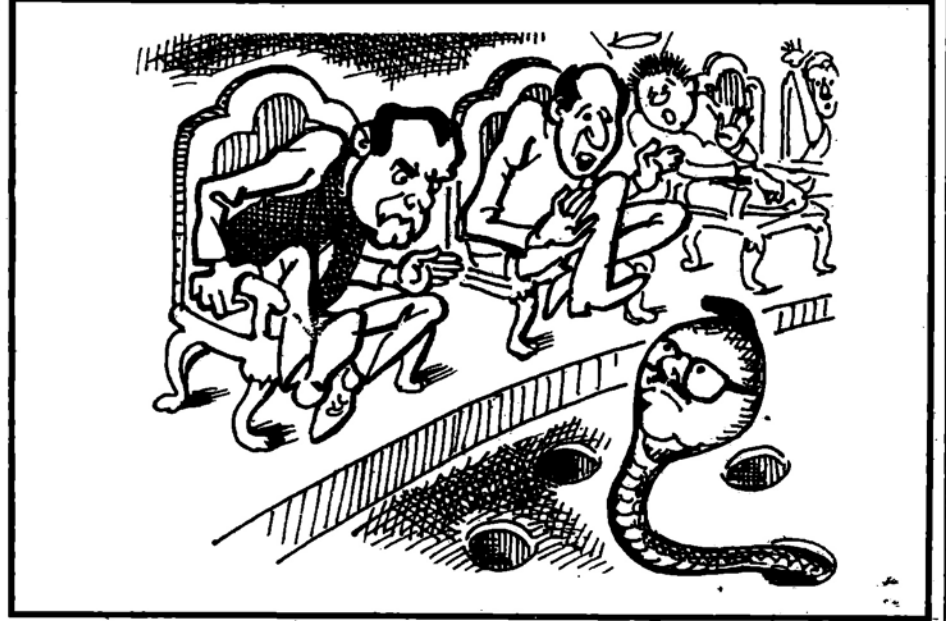
দিল্লি দরবার মাঝে মাঝেই বিদেশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গে থাকেন সোনিয়া। কিন্তু সুস্থিতিতে যে একটু বিদেশে যাবেন, তারও উপায় নেই। মাথায় গিজগিজ করছে যত গোর্খাল্যাণ্ড, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব সমস্যা। আবার খোদ দিল্লিতে ফিরলেও নানা ঝক্কি। এবার তো এরা অর্জুনকে নিয়ে পড়েছে। বেচারা বড্ড কাহিল। সবাই যেন তাঁকে কাতুকুতু দিতে চায়। তবে শেঠীর কাণ্ডটাই তাঁকে বেশি বেকায়দায় ফেলেছে। দিল্লি দরবার যখন তাঁকে ডাকলেন, তখন কাচুমাচু মুখে অর্জুন হাজির। দিল্লি দরবারকে বললেন, 'আপনি শেঠীর জন্য এত উতলা হচ্ছেন কেন, উনি তো মাঠেই নামেন নি। আপনার পলিটিক্যাল দর্শন তো—সমস্যা জট পাকালে ব্যোম ভোলা হয়ে থাকা।' ঠিক সেই সময়ই বিদেশী ফরমুলা নিয়ে রমেশ ভাণ্ডারি হাজির।

তারপর শেঠীজী ছুটলেন বিদ্যাচরণ শুক্লার কাছে। সফদরজং রোডে অর্জুন ঘাপটি মেরে বসে আছেন। মনে মহা দুঃখ কিন্তু মুখে হাসি। ওনার এই অ্যাকটিং পাওয়ার দেখেই তো করন্থ তাকে ঘায়েল করেছিলেন। তারপর মদ্য-কেলেংকারিতে সুপ্রীম কোর্ট তাকে বেশ দৌড়ও করালেন। ওই চিন্তায় তার মাথাটা গেল বেগড়বাই হয়ে। তার চেয়ে পুরনো বাণিজ্য দফতর ভালো ছিল। বেশ সুখ ছিল।

আবার অর্জুন যেন শুনলেন সফদরজং রোডে বিদ্যাচরণ ও শেঠী কানাকানি করছেন, তক্ষুনি তিনি ছুটলেন মাখনলাল ফোতেদারের কাছে। অর্জুন বললেন, 'শুনছেন, মূর্খরাজ।' শুনে ফোতেদারের চক্ষু ছানাবড়া। 'আমি না হয় সাপই হলুম। আপনাকে তো চোর বলতে পারি না।' ফোতেদারের কাঁধে হাত রেখে অর্জুন বললেন, 'এখন শেঠীই তো বলবে, কে চোর, কে মূর্খ।' এরপর ফোতেদার নমাল হলেন। তারপর ভি পি সিং-এর নৈতিকতা সম্পর্কে তিনি বড়সড় লেকচার ঝাড়লেন। আসলে সেদিনের হট লাইনের ব্যাপারে অর্জুনের রাগ কিছুতেই যায় নি। তিনি দিল্লি দরবারকে তো কিছুই বলতে পারেন না। কারণ তিনি সব সময়ই ব্যস্ত। বিদেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তো তার বদলে ফোতেদারই ভরসা। তাছাড়া দিল্লি দরবার এসব সমস্যা নিয়ে খুব একটা ভাবিত নন। এ জন্য মুপানার আছেন। তিনি সব ভেবেটেবে বললেন, 'ঠিক আছে। ওনাকে সন্ন্যাসী ডোজ দেওয়া হবে। একেবারে ত্রিশংকু অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হবে।' তারপর এক ভোজসভায় মুপানার ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'শেঠীর ফুটুস ডুম। ওকে হটিয়ে দিয়েছি।' আসলে কলকাঠি নেড়ে হাওয়া দিয়ে দিলেন অর্জুন। ফাটিয়ে গেলেন একটা বড় সড় ডিনামাইট। দূর থেকে নিজের ফাটানো ডিনামাইটের আওয়াজ শুনতে ভারি মজা।

ধন্যি বটে অর্জুন। দরবার যখন বিদেশ যাত্রায় ব্যস্ত থাকেন তখন তিনি যে এত ভাল গোল করতে পারেন, এটা কি সহজে বোঝা গিয়েছিল ? বুঝেছেন ঠিক প্রাণের ঠাকুর, তিনি তাঁকে গত অক্টোবরে সম্প্রচারমন্ত্রী করে দিয়েছেন।

দরবারি লাল

শ ওয়ালেসের ভবিষ্যৎ কি !

২০ নভেম্বর, ১৯৮৬। বুধবার। সারা দুপুর ধরে গুরুসদয় রোডের আইস স্কেটিং রিংক—এ বিখ্যাত মদের কোম্পানি শ ওয়ালেশের বার্ষিক সাধারণ সভায় এক নাটক ঘটে গেল। এই সাধারণ সভায় সুঁচ পড়লেও শব্দ হয়। এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা বিরাজ করছে সারা ঘরে। এই সভার সভাপতি সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত বিচারপতি বিমল চন্দ্র মিত্র ঘনঘন পরিস্থিতির দিকে নজর দিচ্ছিলেন। সাধারণ সভায় যখন তুমুল উত্তেজনা, তখন বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল পুলিশ। এই প্রেস্টিজ ইস্যুতে গোলমাল হবার আশঙ্কায় সকাল থেকেই পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

চারটে নাগাদ নাটকের ছেদ পড়ল। সম্পূর্ণ অন্যখাতে বইতে শুরু করল নাটক। অসংখ্য উদগ্রীব মানুষ যা ভেবেছিল, তার থেকেও চরম আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেল সভায়। সবাইকে অবাক করে বিতাড়িত করা হল এস.পি. আচার্যকে। বিতর্কিত ছাবরিয়া গোষ্ঠীও নিয়ন্ত্রণের নাগাল পেলেন না। ভোটদাতাদের কৌশল খেলায় লক্ষ্যভেদ করল কেন্দ্রীয় ঋণদান সংস্থাগুলি। 'আমি সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করছি যে শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে সভাপতি ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস. পি. আচার্য পরাজিত হয়েছেন।' সভার সভাপতি বিচারপতি বিমল চন্দ্র মিত্র ঘোষণা করলেন, 'আমাদের সভায় শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে পরাজিত হয়েছেন সর্দার আজাইব সিং এবং রাজেন্দ্র মোহন ভাণ্ডারিও।'

কপাল কিন্তু ছাবরিয়াদেরও পুড়েছে। কারণ এদের প্রার্থীরাও জিততে পারেন নি। এদের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং আচার্য। আচার্যের বিরোধিতাকে বাস্তবায়িত করলেন কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থাগুলি। এর ফলে বিতর্কিত শ ওয়ালেশের নিয়ন্ত্রণ পেলেন না ওরাও। কার্যতঃ ক্ষমতা এল ঋণদান সংস্থার হাতে। এদের হাতে রয়েছে ৩৩ শতাংশ শেয়ার।

বৃহত্তম মদের কোম্পানি শ ওয়ালেশ নিয়ে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা রীতিমত বিরল ও নজিরবিহীন ঘটনা। বাণিজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। এই লড়াইয়ে এক পক্ষ হলেন এস.পি. আচার্য অর্থাৎ সেনাপুর পাণ্ডুরঙ্গ আচার্য, অন্যপক্ষ মনোহর রাজারাম ছাবরিয়া। দুজনেই শ ওয়ালেশে ক্ষমতা দখলের দাবিদার। এই রুদ্ধশ্বাস ঘটনায় পর্দার আড়ালে রয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা। তাদের পেছনে বকলমে কেন্দ্রিয় সরকার।
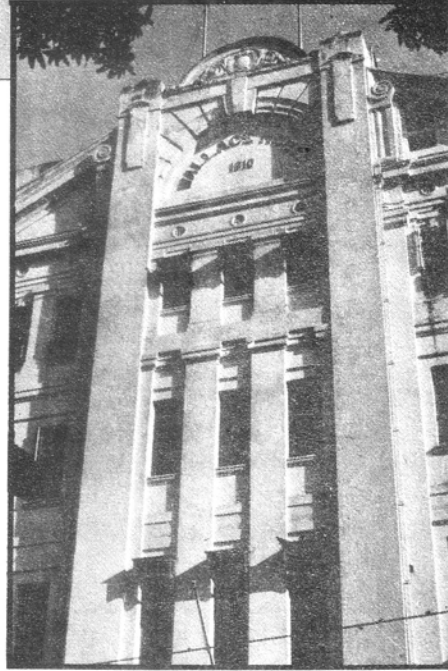
শ ওয়ালেশ হাউস

এক'শ বছরের পুরনো শ ওয়ালেশ সংস্থা এখন বিতর্কের শিরোনামে। নিয়ন্ত্রণ দখলের লড়াইয়ে আচার্য-ছাবরিয়া শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিগত সাধারণ সভায়। সেই লড়াইয়ে কিন্তু কেন্দ্রীয় ঋণদান সংস্থাগুলি একজনকে বিতাড়িত করেন, অন্যজনকে করেন প্রতিহত। ফলে মোটা অংশের মালিকানা সত্ত্বেও ছাবরিয়া গোষ্ঠীকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে আগামী সভার জন্য। শ ওয়ালেশ সংস্থায় কিসের দ্বন্দ্ব? কেন বারবার মামলা চলেছে? ছাবরিয়াদের পিছনে কে সেই রহস্যময় মানুষটি? কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাই বা কি? এই আপাত জটিল বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন আমাদের প্রতিনিধি মণিশঙ্কর দেবনাথ।

শ ওয়ালেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই এত জোরালো হয়ে ওঠে যে এই লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে এই ঐতিহাসিক সাধারণ সভা হয়। কারণ নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য দুই পক্ষ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে তখন সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই জরুরী।

কিন্তু আচার্য-ছাবরিয়া দ্বন্দ্বে নাটকীয়তা ছিল অন্যত্রও। ১৯৮৫–র নভেম্বরের মাঝামাঝি ব্রিটেনের আর.জি. শ কোম্পানি অর্থাৎ শ ওয়ালেশের প্রধান শেয়ারহোল্ডার এবং ছাবরিয়া গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ও ইণ্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ককে যৌথভাবে এক চিঠি লিখে জানান যে তারা বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। যদি সরকার এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি উদ্যোগ নেন তবে তারা সমঝোতা করতে প্রস্তুত। এগার পাতার এই চিঠির প্রতি ছত্রে ছিল আপোষের আবেদন। ছাবরিয়াদের অভিযোগ ছিল যে বর্তমান পরিচালক মণ্ডলী অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের এ আবেদনও ছিল যে আর.জি. শ যদি শ ওয়ালেশে তাদের প্রতিনিধি পাঠান, তবে ছাবরিয়ারা তার পূর্ণ সমর্থন করবেন। ছাবরিয়া এ রকম নিশ্চয়তাও দেন যে আর.জি. শ ভারত সরকারের আদেশ মেনেই পরিচালনায় আসতে আগ্রহী। যদি দেখা যায় যে কোন কার্যকরী সদস্য অযোগ্য হিসেবে বোর্ডে রয়েছেন তবে আর.জি. শ তাদের প্রতিনিধি পাঠাবেন। ছাবরিয়া গোষ্ঠীর মুখ্য অভিযোগ, অযোগ্য পরিচালনার দরুন শ ওয়ালেশের লাভ মার খাচ্ছে। তাদের মতে, পেশাদার পরিচালক গোষ্ঠীই পারে এই সংস্থাকে বাঁচাতে।

কিন্তু এই সমঝোতার প্রসঙ্গে শ ওয়ালেশ সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। বৃহত্তম মদের কোম্পানি শ ওয়ালেশের এক তৃতীয়াংশ আয় মদ বিক্রি করে। এদের সিংহভাগ আয় অন্যান্য জিনিস বেচে, কিন্তু শ ওয়ালেশকে সবাই চেনে মদের কোম্পানি হিসেবে। এরা তাদের মদিরা ব্যবসার কথা ঢালাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করে থাকেন।

কোম্পানির দ্রুত আর্থিক সফলতা ক্রমে সকলের নজর কাড়তে থাকে। এই কোম্পানির রমরমা ব্যবসার চিত্রটি দুবাই প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী মনু ছাবরিয়ার নজরে পড়ে। তিনি শ ওয়ালেশ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এদের

ব্যবসার গতিও লোভনীয় ।

ছাবরিয়া গোষ্ঠী এর আগে ভারতে প্রায় অপরিচিতই ছিল । ১৯৮৪ সালে যখন একটি নামী কোম্পানির মালিকানা বদলের খবর পাওয়া গেল তখন বিখ্যাত শিল্পপতি আর.পি. গোয়েঙ্কার সঙ্গে ছাবরিয়াও আসরে উপস্থিত ছিলেন ।

শ ওয়ালেশ নিয়ে ছাবরিয়া–আচার্যর লড়াই কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের । কোম্পানির ৩৯ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিল আর.জি. শ. কোম্পানি। তবে মূল মালিকানা ছিল মালয়েশিয়ার সাইম ডার্বির হাতে । ইংলণ্ডের দৈনিক কাগজগুলিতে ১৯৮৪ সালের শেষদিকে খবর বেরোতে শুরু করে যে সাইম ডার্বি আর.জি.শ. কোম্পানি বিক্রি করে দেবে। এর অর্থ শ'ওয়ালেশের ৩৯ শতাংশ শেয়ারও হাত বদল হবে। এই খবর স্বভাবতঃই ভারতের শিল্পপতি মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । সেইসময় সভাপতি ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস.পি. আচার্য বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন নি । তবে শ ওয়ালেশ কোম্পানির বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টরা ভাবিত হয়ে পড়েন । ১৯৮৪ সালের ২০ নভেম্বরের সাধারণ সভায় যখন বিষয়টি উত্থাপিত করা হয়, তখন আচার্য জানান যে শ ওয়ালেশের শেয়ার বিক্রির খবরটি গুজব মাত্র ।

কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে খবরটির সত্যতা প্রমাণিত হয় ।৩১ ডিসেম্বর এস.পি. আচার্য নির্ভর-যোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারেন যে শেয়ার বিক্রির খবরটি ঠিক । তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। তিনি এক আমেরিকান সংস্থা নাবিস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন শেয়ার কেনার ব্যাপারে ।

ঠিক এই সময়েই মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ছাবরিয়া । নাবিস্কোকে পর্যুদস্ত করে ছাবরিয়া গ্রুপ অনেকটাই সফল হলেন। ছাবরিয়া আমাদের জানান, ১৯৮৪ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সাইম ডার্বির সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হয়। একমাস পর অর্থাৎ নভেম্বরে চূড়ান্ত কথা হবার পর দর ঠিক হয় ২৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা। টাকা দেবার তারিখ ২রা ডিসেম্বর নির্দিষ্ট হলেও ২ ডিসেম্বর লেনদেন হয়নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডনে নাবিস্কো যে টাকা অফার করেছিল তার থেকে অনেক বেশি টাকায়, ৩৩ কোটি টাকা দিয়ে ছাবরিয়া গোষ্ঠী আর.জি.শ. কিনে নেন ।

এদিকে নাবিস্কো মালিকানা কিনতে ব্যর্থ হওয়ায় আচার্যর কোপ গিয়ে পড়ে ছাবরিয়ার ওপর। তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন যে, এই শেয়ারের ক্রেতা স্বয়ং ছাবরিয়া নন। প্রকৃত মালিক দেশের প্রধান মদের কোম্পানি ইউনাইটেড ব্রুয়ারিস-এর চেয়ারম্যান বিজয় মালিয়া। যেহেতু শ ওয়ালেশের শেয়ার কিনতে মালিয়ার অসুবিধে হচ্ছে তাই ছাবরিয়াকে দিয়ে শেয়ার কিনিয়েছেন মালিয়া। কিন্তু ছাবরিয়া তা মানতে কিছুতেই রাজি নন । তবে ছাবরিয়া-মালিয়া গোপন চিঠিপত্র একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করে দেয় । সেটি প্রমাণ হিসেবে জোরালো না থাকায় ছাবরিয়া ছাড়া পেয়ে যান ।

কিন্তু আচার্যর অভিযোগ পেয়ে ১৯৮৫–র
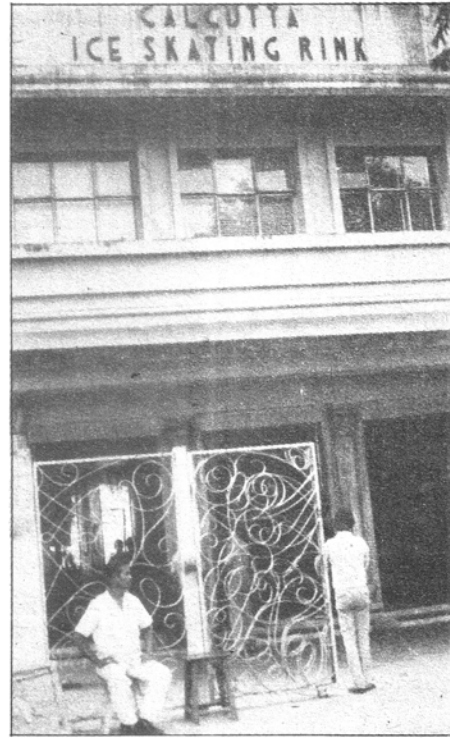
আইস স্কেটিং রিংক

ফেব্রুয়ারি মাসে কোম্পানি ল বোর্ড খোঁজ খবর আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে আর.জি. শ'র ভোট দেবার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়। বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর ৩১ অক্টোবর ১৯৮৫ কোম্পানি ল বোর্ড আর.জি. শ' কোম্পানিকে তাদের ভোটদানের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয় । তারা জানায়, যেহেতু আর.জি.শ'র শেয়ার হস্তান্তরের দ্বারা দেশের কোন আইন লঙ্ঘন করা হয়নি–তাই এ সম্পর্কে আচার্যের অভিযোগ থেকে ছাবরিয়াকে অব্যাহতি দেওয়া হল ।

এর পরের পর্বটিও কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় । ক্ষুব্ধ আচার্য একের পর এক মামলা ঠুকতে শুরু করেন । এ কারণে ছাবরিয়া ৩৯ শতাংশ শেয়ার কিনেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পাননি ।

ছাবরিয়া-আচার্য লড়াইয়ে কৌশলে পনের শতাংশ শেয়ার দিয়ে কি করে আচার্য ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মদের কোম্পানির পরিচালনা এত-দিন চালিয়ে এলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর । গত এক বছর ধরে শ ওয়ালেশ একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। আচার্যকে হটাবার জন্য ছাবরি-য়ারা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন । আচার্যর ক্রমাগত বাধাদান সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছিলেন ওই ২০ নভেম্বর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। আর সেই ঐতিহাসিক সাধারণ সভাতেই শেষ হ'ল এতদিনের রুদ্ধশ্বাস লড়াই ।

আইস স্কেটিং রিংকের শ ওয়ালেশের বিতর্কিত সাধারণ সভায় আচার্য অপসারিত ও ছাবরিয়াদের প্রার্থীরা পরাজিত হবার সুবাদে মূল ক্ষমতা কিন্তু কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থাগুলির হাতেই রয়ে গেল ।

মনোহর রাজারাম ছাবরিয়ার ভাই জানালেন, 'কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থাগুলির ব্যবহারে আমি আহত । ওরা আমাদের বিচার না করেই শাস্তি দিলেন!' ছাবরিয়াদের ব্যাঙ্গালোর কেলেঙ্কারির জন্যই কি ঋণদান সংস্থাগুলি তাদের প্রার্থীদের পরাজিত করলেন ? এ ব্যাপারে কিশোর ছাবরিয়ার বক্তব্য: 'আইন অনুযায়ী, যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে যে আমি অপরাধী ততক্ষণ তো আমি নির্দোষ।' পরে এই কিশোর ছাবরিয়া একটি বিস্ময়কর মন্তব্য করলেন, 'আমরা মনে করি না যে আমরা পরাজিত হয়েছি । যদি একটি অতিরিক্ত ব্যালট পেপার থাকতো তাহলে সেই ভোট আমাদের পক্ষেই যেতো ।'

কিন্তু কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থাগুলির এই ধরনের ব্যবহারের পিছনে কি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে ? সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা ছিল ওই সাধারণ সভায় কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থা ছাবরিয়াদের প্রার্থীদেরই ভোট দেবেন। কার্যতঃ কিন্তু তা ঘটেনি ।

শোনা গেল একটি বহুজাতিক সংস্থা ছাবরিয়া-দের প্রস্তাব দিয়েছে শ'ওয়ালেশের মালিকানা বিক্রি করতে। কিন্তু ছাবরিয়া গোষ্ঠী সেই প্রস্তাব অবজ্ঞা-ভরে নাকচ করে দিয়েছেন । কারণ তারা জেনে ছিলেন ওই প্রস্তাবটি মোটেই সত্যি ছিল না। এটা শুধু ছাবরিয়াদের কতটা ইচ্ছে আছে, সেটাই পরীক্ষা করা । কিশোর ছাবরিয়া জানালেন, 'শ ওয়ালেশের দাবি আমরা ছাড়ব না । আমরা প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ব ।' এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ছাবরিয়া গোষ্ঠী শ ওয়ালেশ বিক্রি করতে রাজি নন।

তবে ছাবরিয়াদের প্রবল প্রতিপক্ষ এখন আর কেউ নন, স্বয়ং ভারত সরকার । তারা কেন্দ্রিয় ঋণদান সংস্থাগুলির মাধ্যমে শ ওয়ালেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন । যদিও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে, আগামী বার্ষিক সভা কয়েকমাস পরেই হচ্ছে । ওই সভায় ছাবরিয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আচার্য-গোষ্ঠী থাকবেন না। ছাবরিয়াদের হাতে ৩৯ শতাংশ শেয়ার। প্রয়োজনে আরো শেয়ার তারা কিনে নিতে পারেন। তখন ঋণদান সংস্থাগুলি কি করবেন ?

আবার অন্যদিকে, ব্যাঙ্গালোরের মামলায় যদি ছাবরিয়ারা পরাজিত হন, তবে চিত্রটি অন্যরকম হয়ে যেতে পারে । এক অভিজ্ঞ শিল্পপতির মতে, 'ছাবরিয়ারা অবশ্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করলেও করতে পারেন । ওরা স্বীকার করেছেন, ব্যাঙ্গালোর মামলা একবছর ধরে চলতে পারে । তবে ২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা শ ওয়ালেশের কাছ থেকে ছাবরিয়ারা খুব কমই লাভ পাবেন। আবার অন্য দিকে দৈনিক সুদ তারা দেবেন ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।' ফলতঃ শ ওয়ালেশ নিয়ে তারা নাস্তানাবুদ হতে পারেন বলে ওই নামী শিল্পপতির অভিমত ।

১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানালেন যে শ'ওয়ালেশ কোম্পানির নবগঠিত বোর্ড দায়িত্ব-ভার নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। বিচারপতি ই.এস. বেংকট রামাইয়া, সব্যসাচী মুখার্জিকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে । সেইসঙ্গে নির্বাচিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস–এর পক্ষ থেকে সদস্য মনোনীত করতেও কোন অসুবিধে

নেই। নতুন ডিরেক্টর মনোনীত করার যে বাধা ছিল, তাও সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দিয়েছেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কিন্তু আর.জি. শ কোম্পানি ও সহযোগী কোম্পানিগুলির শেয়ারের বৈধতার সম্পর্কে নয়।

তবে এখনও চূড়ান্ত ঘন্টা কিন্তু পড়েনি। ক'মাস পরেই আবার শ'ওয়ালেশের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তখন বোঝা যাবে শ ওয়ালেশের ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাবে। সব কিছু নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টের ওপর। তাদের হাতেই ঝুলছে একশ বছরের ঐতিহ্যবাহী শ' ওয়ালেশের ভাগ্য। ওই সাধারণ সভাতেই নির্ধারিত হবে শ ওয়ালেশের গতিপথ। এবার ছাবরিয়ারা ছিটকে গিয়েছেন অল্পের জন্য। যে ছ'জন ডিরেক্টর এই টাগ-অব-ওয়ারে থেকে গেলেন, তাদের পক্ষেও কোম্পানি চালানো দুষ্কর। যতক্ষণ না কেন্দ্রিয় সরকার অনুমোদন করবেন ততক্ষণ তারা অসহায়। আসলে গোটা ব্যাপারটির কলকাঠি নাড়ছেন কেন্দ্রিয় সরকার। অবশ্য আগামী বার্ষিক সভা জিইয়ে রেখেছে দুবাই-প্রবাসী ছাবরিয়াদের ক্ষমতা দখলের শেষ আশাটুকু। তাদের বক্তব্য, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।' এর জন্য সরকারের বিরুদ্ধেও সুদূর দুবাইয়ে বসে তাঁরা লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত।

মনু ছাবরিয়া

এস.পি. আচার্য

আর.পি. গোয়েঙ্কা

মালিয়া

আমি ঘরে ফিরতে চাই : ছাবরিয়া

বাণিজ্যের জগতে ছাবরিয়া গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। দশ বছর আগে ভারত থেকে আরবে পাড়ি দিয়ে মনোহর রাজারাম ছাবরিয়া আরব দেশের কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা শুরু করেন। মনোহর রাজারামের তখন বয়স ২৯ বছর। পুঁজি বলতে পারিবারিক কিছু টাকা, আর আত্মবিশ্বাস।

বোম্বাই শহরে নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকতেন মনোহর। বি.এস.সি. পড়তে পড়তেই ভর্তি হন একটি প্রতিষ্ঠানে। ইচ্ছে, ইলেকট্রনিক্স-এ পড়াশুনো। এটাই ছিল তাঁর পরিবারের ইলেকট্রনিক ব্যবসায় ঢোকার প্রথম সূত্র। এর আগে পারিবারিক ব্যবসা ছিল অর্থনৈতিক লেনদেন। এছাড়া টুকিটাকি কারবার। কিন্তু মনোহরই ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দেন। শুরু হয় ইলেকট্রনিক ব্যবসা।

১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি। ওই দিনেই প্রতিষ্ঠিত দুবাইতে জামবো ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি লিমিটেডই তাঁদের লক্ষ্মী। এই সংস্থায় ছাবরিয়ার ৪০ শতাংশ শেয়ার ছিল। ১৯৭৫ সালে তারা জাপানের সোনি ইলেকট্রনিক্স-এর ডিলারশিপ নেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সোনি প্রডাক্টও পূর্বাঞ্চলে তাদের ব্যবসা ছড়াবার চেষ্টাচরিত্র করতে থাকে। মনোহর ছাবরিয়া তাদের আশা বাস্তবায়িত করেন।

নিখুঁত ও সুদক্ষ পরিচালনার গুণে জাম্বো সংস্থা তেলের খনি আরব দেশ জয় করতে শুরু করে। দুবাই জয় করে তারা আবুধাবি, ওমানেও পৌঁছতে সমর্থ হয়। এর পাশাপাশি ইরাণ ও ইরাকেও তারা মাল রপ্তানি করে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা কিছু জিনিসপত্র বাজারে ছাড়ে। এমন কি কমপিউটারও তারা বিক্রি শুরু করে। এক সময় গোটা পৃথিবী জুড়ে তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে যায়।

বেশ তো ছিলেন মনোহর রাজারাম ছাবরিয়া। তা হঠাৎই কেন তাঁর ভারতে ফেরার দরকার পড়ল? কেনই বা তিনি শ'ওয়ালেশের শেয়ার কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? কিসের জন্য ঘোষণা করলেন, 'যত দাম ওঠে, তার থেকে বেশি টাকা দিয়ে শ'ওয়ালেশের শেয়ার কিনব।' মনোহরের বক্তব্য, 'আমি ভাগ্যান্বষণে ভারত ছেড়েছিলাম। আজ আমি প্রতিষ্ঠিত।' তাঁর কথায়, 'যতই করের ঝামেলা থাকুক, ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমি ঢুকব। এটাকে ঘরে ফেরা বলতে পারেন। যদি আমলারাও আমাকে বাধা দেন, তবু আমি ভারতে ব্যবসা করব।' আসলে তাঁর ধারণা, ভারত সরকার তাঁকে স্বাগত জানাবে। আর বিদেশী মুদ্রা বিনিয়োগের বিষয়টিও প্রশংসার চোখে দেখবেন ওঁরা।

১৯৮২-র পর থেকেই ছাবরিয়া গোষ্ঠী ভারতে অর্থ বিনিয়োগের কথা ভাবতে শুরু করে। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা অরসন ভিডিও প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৩ সালে ব্যবসা শুরু হয়। সোনি ইলেকট্রনিকসের সঙ্গে যৌথভাবে এই ব্যবসা। তবে অরসনের বিক্রির খুব একটা উন্নতি ঘটে নি। সোনির রেকর্ডিং উঁচুমানের নয় বলেই এই ব্যর্থতা। পরবর্তী পর্যায়ে ছাবরিয়ার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা: অরসন ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিস। কিন্তু এটিও অনেক ক্ষতির মুখ দেখে। প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

এই ঝুঁকি দেখেও কিন্তু মনোহর ছাবরিয়া শ ওয়ালেশের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের লড়াই-এ হতোদ্যম হয়ে পড়েন নি। তাঁরা আর যে দু'টি সংস্থার শেয়ার কেনেন সেগুলি হল ডানলপ ও গর্ডন উড্রফ। এই দু'টি সংস্থাতেও এখন ওপর মহলে তোলপাড় চলছে। বলাবাহুল্য, গর্ডন উড্রফের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তবে ডানলপে ছাবরিয়া এখন আর.পি. গোয়েংকার সঙ্গে শেয়ারের ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

বিতর্কিত শ ওয়ালেশের লড়াই-এ তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এস.পি. আচার্য বিতাড়িত। ফলে ছাবরিয়ার সামনে এখন অনেকটাই ফাঁকা জমি। অনাবাসী এই ভারতীয় শিল্পপতি এ ব্যাপারে স্বরাজ পালকে টেক্কা দিতে পারেন কিনা এটাই দেখার।

ছবি: কুমার রায়, রাজা ঘোষ

উত্তর-পূর্ব ভারতে ছাত্ররাই রাজনীতি কন্ট্রোল করছে কেন?

সাত পাহাড়ি ভগ্নী রাজ্যে এখন তুমুল ছাত্র আন্দোলন। আসামে আসু, নাগাল্যান্ডে এন.এস.এফ., মেঘালয়ে কে.এস.এফ., মিজোরামে এম.এন.এস.এফ., ত্রিপুরায় টি.এস.এফ. ও স্টুডেন্ট ইউনিয়ন দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে। নাগাল্যান্ডে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এস.সি. জামির। দুই ছাত্রনেতা অরুণাচলের গেগং আপঙ্ এবং আসামের প্রফুল্ল মহান্ত তো এখন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্রদাবিতেই মণিপুরে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। সাত রাজ্যের যাবতীয় উপজাতি বিক্ষোভের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতে কেন? কেনই বা ছাত্রদাবির কাছে রাজ্য সরকারগুলিকে বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয়? ছাত্রদের এই দাবির উৎস কি? উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক-পশ্চাদপট বিশ্লেষণ করে ছাত্রআন্দোলনের সরজমিন হালহকিকৎ সংগ্রহ করে এনেছেন রমাপ্রসাদ ঘোষাল, গুরুপ্রসাদ মহান্তি ও সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী।

আসামের 'ছাত্র মুখ্যমন্ত্রী' প্রফুল্ল মহন্ত

৬ নভেম্বর, ১৯৮৬। বৃহস্পতিবার। কালীপুজোর দিন রাতে নলবাড়িতে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা পরীক্ষিৎ বর্মনের মৃত্যুর প্রতিবাদে সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা বা আসুর ডাকে আসামে ১২ ঘন্টার সফল বন্ধ পালিত হল। গত বছর ১৫ আগস্ট আসাম চুক্তি সম্পাদনের পর রাজ্যে এই প্রথম অ গ প সরকারের বিরুদ্ধে বন্ধ ডাকা হল। বন্ধ ব্যর্থ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকন। ভোর ৫টা থেকে বিকেল ৫টা অব্দি ১২ ঘন্টার এই বন্ধে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ১৪টি জেলা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। সরকারি বাস চলেনি নির্দেশ সত্ত্বেও। রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। অসম গণ পরিষদের এক বছর সরকার চালানোর পরেও তারই স্রষ্টা ছাত্রসংস্থা আসুর জনসমর্থন কতটা এবং তারাই যে রাজ্য রাজনীতি কন্ট্রোল করে এটা প্রমাণ হয়ে যায় ছাত্রনেতা পরীক্ষিৎ–এর মৃত্যুর পর আসুর কেন্দ্রিয় সমিতি দোষী পুলিশ কর্মীদের শাস্তি, মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে বন্ধের ডাক দেওয়ায়। আসুর সভাপতি কার্তিক হাজারিকা এবং সাধারণ সম্পাদক শশধর কাকতি যৌথভাবে দাবি জানান যুব ও ছাত্রদের উপর পুলিশী অত্যাচারের সংশ্লিষ্ট দোষী পুলিশ কর্মীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া না হলে রাজ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আসুর এই বন্ধ প্রত্যাহার করে নেবার অনুরোধে প্রফুল্ল মহন্ত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকন বন্ধের আগের দিন আসুর নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের সব রকম দাবি মেনে নেন সরকার। দু'জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেণ্ড এবং নামনি (লোয়ার আসাম) বিভাগীয় কমিশনারকে দিয়ে ওই ঘটনার তদন্তের কথা ঘোষণা করেন। এর আগে কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি মানেন নি। তথাপি ভৃগু ফুকনের ব্যক্তিগত অনুরোধের পরও গভীর রাতে আসুর কেন্দ্রিয় সমিতির বৈঠকে বন্ধ ডাকার সিদ্ধান্ত অনড় থাকে। ভৃগু ফুকন এই বন্ধের বিরোধিতা করলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত কিন্তু এই বন্ধের বিরোধিতা করে কোন দৃঢ় বক্তব্য রাখেননি জনগণের উদ্দেশ্যে।

নিজেদের অরাজনৈতিক ছাত্র সংস্থা হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও আসু এখনও আসাম রাজনীতির প্রধান শক্তি। এবং তাদেরই নেতা প্রফুল্ল মুখ্যমন্ত্রী, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকেই আসু অগপ সরকারের সব কিছু তদারকি করছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত থেকে শুরু করে বেশির ভাগ মন্ত্রীই আসুর কথামত চলতে চান। যারা চলেন না তাদের জন্য আসুর মুর্দাবাদ ধ্বনি। যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, কিন্তু সেই আসুই অগপ সরকারের বিরুদ্ধে বন্ধ ডাকল। এবং তা শুধুমাত্র রাজ্য মন্ত্রীসভায় আসু বিরোধীদের সুতর্ক করতে। সরকারের নড়বড়ে ভিত্তিমূলে একটা বড় ধরনের ক্ষত তৈরি হল। প্রমাণ হল, অগপ মন্ত্রীসভায় কিছু মন্ত্রী আসুর পছন্দসই, কেউ বা অপছন্দের।

অগপ সরকারের এই অল্প দিনের শাসনকালের মধ্যেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিদেশী বিতাড়নের যে দাবি আদায়ের জন্য অগপর জন্ম তাতেই সে ব্যর্থ। ফলত আসামের বর্ণহিন্দু অধি-

বাসীদের মধ্যে তাই চাপা ক্ষোভ জমা হয়েছে। শুধু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে আসুই নয়, বরাক উপত্যকায় আকসা (অল কাছাড়-করিমগঞ্জ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন) অগপ সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই করছে। যার ফলে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার করতে। আসামের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আসামে বসবাসকারী বাঙালিদের পক্ষে আকসা নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন), কারবি আংলং ছাত্র সমিতি, উপজাতিদের অধিকার আদায় নিয়ে জোরদার লড়াই শুরু করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখন অ-বর্ণহিন্দু জনগোষ্ঠী এইসব ছাত্রসংস্থার নেতৃত্বের উপর বেশি আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদী হটকারিতার মোকাবিলায়।

প্রফুল্ল মহন্ত সহ মন্ত্রীসভার অধিকাংশই আসু থেকে উঠে এলেও অগপ নেতৃত্বের একাংশের জামিরের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ শুরু করে এবং জামিরের পদত্যাগ দাবি করে। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে পূর্বেকার ইমেজ ফেরানোর জন্য জামির অনেক চেষ্টা শুরু করেন, কিন্তু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ফিরিয়ে আনা জামিরের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তখুনিই জামিরের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে। শুধু তাই নয়, মিছিলের উপর গুলিতে দু'ই ছাত্রনেতার মৃত্যুর

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় : উত্তর পূর্বাঞ্চলে ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি

১৮টি উপজাতি ছাত্রসংস্থা রাজ্যের ২১টি উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের সামিল। অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী উগ্রপন্থী সংস্থা নয়া 'আলফা'র (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম) রাজনৈতিক হত্যার মোকাবিলায় বাঙালিরাও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্ভর করছে ছাত্র সংস্থা আকসা ও আমসু (অল আসাম মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন)—এর উপর। তারুণ্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে আসামবাসী অগপ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। কিন্তু অগপ সরকারের নানান দুর্নীতি, বিতাড়ন ব্যর্থতায় গরিষ্ট বর্ণহিন্দু অসমীয়া জনমানসের একাংশ সন্দিহান হয়ে দিনকে দিন বাড়ছে। আসুর একটি শাখা আগসুর সাধারণ সম্পাদক সোমেশ্বর বরদলুই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভৃগু ফুকনের পদত্যাগ দাবি করেছেন। আসুর অধিকাংশ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এই দাবিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। অগপ সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শুধু নয় আতসু (অল আসাম উপর আসুর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা আসু ও অন্য ছাত্র সংস্থাগুলি বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যায় উসকানি দিয়ে আসামকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে অগপ সরকার পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে এবং আখেরে এই ছাত্র সংস্থাগুলিই রাজনীতির নেতৃত্ব দেবেন নতুন নামের নতুন দল গড়ে। তাতে অনেক ছাত্রনেতারই ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পূরণের পথ পাওয়া যাবে।

কিন্তু শুধু আসাম নয়, সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতভগ্নী রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে ছাত্ররাই রাজনীতি কন্ট্রোল করছে। তাদের কর্মসূচী এবং সফলতা তার প্রমাণ। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাস। নাগাল্যাণ্ডের কোহিমায় এন.এস.এফ.—দের ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে দু'জন ছাত্র নিহত হয়। এই দু'ই ছাত্রনেতার হত্যা নিয়ে সারা রাজ্যে নাগা ছাত্রদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্ররা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এস.সি. প্রতিবাদে ও নাগা ছাত্র-আন্দোলনের সমর্থনে অর্থমন্ত্রী টি এ নুগুলি সহ ছ'জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। হোকিসে সেমা, চিতেব জামির সহ দলীয় নেতারা সরকার বদলের প্রস্তাব দেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে। দলের ১৬ জন বিধায়ক এই ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী বদলের দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। যার পরিণতিতে মুখ্যমন্ত্রী এস.সি. জামিরকে পরিবর্তন করে হাইকমাণ্ডকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হোকিসে সেমার নাম অনুমোদন করতে বাধ্য হতে হয়। এভাবেই উগ্রপন্থী অধ্যুষিত সীমান্ত রাজ্য নাগাল্যাণ্ডে ছাত্র রাজনীতির সফল বুনিয়াদ স্থাপিত হল।

১৯৮৬ সালের ৭ নভেম্বর দিনটিকে বন্ধ হিসেবে পালন করার জন্য নাগা স্টুডেন্ট ফেডারেশন আগে থেকেই ঘোষণা করে রেখেছিল। প্রধান দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রী জামিরের অপসারণ। মুখ্যমন্ত্রী এস.সি. জামির নিজের অবস্থান বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ২৯শে অক্টোবর নিজেই পদত্যাগ

পণ্ডস্ এসেছে আপনার সোনার জন্যে আদরের ডালা সাজিয়ে, অপরূপ আধার নিয়ে – সোনাটির জন্যে ছোট্ট সুন্দর খেলনার ভালুকের আকার নিয়ে, নিবেদন করছে স্নেহের দুটি অবদান – স্পেশাল বেবী পাউডার ও সাবান – যাতে থাকছে, পণ্ডস্-এর সেই চির পরিচিত বিশুদ্ধ ও নিখুঁত গুণমান, যাতে সোনামনিটির কোমল সৌন্দর্য্য থাকে সদা অম্লান !

পণ্ডস্ – ছোট্ট সোনাদের কচি-কোমল ত্বকের জন্যে, মিষ্টি সুন্দর কোমলতা, যে কোমলতা জাগাবে সাধ, সোনাকে চুমায় চুমায় দিতে ভরে, সারাদিন ধরে !

তাই, আপনার সোনার সস্নেহ যত্ন নিতে, পণ্ডস্-এর ওপর পারেন পুরোপুরি ভরসা রাখতে।

আপনার সোনাটিরে, সযত্ন মমতা দিয়ে রাখুন ঘিরে

POND'S

পণ্ডস্ স্পেশাল বেবী পাউডার আর সাবান

করেন। পদত্যাগপত্র পেশ করেন রাজ্যপাল জেনারেল কে ভি কৃষ্ণরাও–এর কাছে। এর কিছু আগেই কংগ্রেস বিধায়ক দলের বৈঠকে হোকিসে সেমাকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। তারপর বিক্ষুব্ধ নাগা ছাত্ররা ৭ নভেম্বরের ধর্মঘটের দাবি তুলে নেয়। নাগাল্যাণ্ডের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান ছিল জামির মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো। এখন তা সম্ভব হয়েছে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-নাগাল্যাণ্ড সীমান্ত এলাকায় উপদ্রুত অঞ্চল আইন সম্প্রসারিত করার বিরুদ্ধে নাগাল্যাণ্ড ছাত্র ফেডারেশন সব সময় সরব।

মুখ্যমন্ত্রী হোকিসে সেমা পর্যন্ত মন্তব্য করেন, নাগা ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনে যদি জনগণের আগ্রহ থাকে কিংবা তাঁদের সুবিধা হবে বলে মনে হয়, তাহলে আমি এই আন্দোলনকে নিশ্চয়ই সমর্থন জানাব। কেন্দ্র যে ৬০টি আসন নাগাদের জন্য সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছিলেন তাতে নাগা ছাত্র ফেডারেশন আপত্তি জানিয়েছে। তারা নাগা নয় এমন আই.এ.এস. এবং আই.পি.এস. অফিসারের নিযুক্তি চেয়েছে নাগাল্যাণ্ডে।

ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে মেঘালয়েও। ভারতের সব চাইতে শান্তিপূর্ণ রাজ্য মেঘালয়ও আজ জোরদার আন্দোলনে নেমেছে। এবং 'বিদেশী খেদাও' স্লোগান সামনে রেখে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আছে খাসিয়া গারো জয়ন্তিয়া ছাত্ররাই। মেঘালয় থেকে নেপালীদের উৎখাত চলেছে দিনে দুপুরে। বিদেশী হঠাতে তিনটি উপজাতি ছাত্র সংস্থার শেষ নভেম্বরে ডাকা মেঘালয় বন্ধেও বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম সাংমা জংগী ছাত্র সংস্থা খাসিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনকে কৌশলে প্রথমদিকে আন্দোলনে নামতে না দিলেও এখন তারা জোরদার লোকাল ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে পা বাড়িয়েছে। এবং তাকে মদত দিচ্ছে শিলং-এর কংগ্রেসী এম.পি. জি.জি. স্যয়েল। সারা মেঘালয় ছাত্র ইউনিয়ন আসামের মতই রাজ্যের সর্বস্তরে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলছে। ছাত্র ইউনিয়নের দাবি মেনে নিয়ে মেঘালয় সরকার ১,০৫৬ জন নেপালী ও ৫৮ জন বাংলাদেশীকে উৎখাতও করেছে। এই মেঘালয় থেকে বিদেশী হঠানোর ছাত্র আন্দোলনে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ সায় দিচ্ছেন। বিপজ্জনক ঝোঁক হলেও রাজ্যবাসীরা ধীরে ধীরে ছাত্রদের আঞ্চলিকতাবাদী তারুণ্যের উপর আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন। রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিক কারণেই ধারণা হয়েছে মেঘালয়ের ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক আকার নেবে এবং তা উগ্র 'নেপালী তাড়াও' কে কেন্দ্র করে।

এখুনিই যে ইস্যুকে মূলধন করে রাজধানী শিলং থেকে ছাত্র সংস্থাগুলির কাজকর্ম রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে তা হচ্ছে, তুরার এম এল এ মাণিক দাসের নির্মম হত্যার কিনারায় পুলিশী ব্যর্থতা।

'আকসা'–র দেওয়াল লিখন

ছ'দফা দাবি নিয়ে জোর আন্দোলনে নেমেছে অরুণাচল প্রদেশের ছাত্ররা। এই দাবিগুলির মধ্যে বিদেশী বহিষ্কার, আসাম-অরুণাচল সীমানা বিরোধ সমাধান, সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা, চীনা আক্রমণ রুখতে কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। সারা অরুণাচল প্রদেশের ছাত্র ইউনিয়ন আজ আন্দোলনের সামনে এসেছে। আসামের আসুর আদি উপজাতি ছাত্র সংস্থার মতই তারা অরুণাচলে আন্দোলন শুরু করেছে। অরুণাচল প্রদেশের ছাত্রনেতারাও স্বপ্ন দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী গেগং আপং–এর অপসারণের পরে ইটানগরের মন্ত্রীসভাও তাঁরাই চালাবেন আসামের আসুর মত। এ জন্য অরুণাচলের ছাত্রসংস্থা এমন ক'টি স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে লড়ছেন যাতে অরুণাচলবাসী অ-আদি জনগোষ্ঠীগুলির সমর্থন পাওয়া দুরূহ নয়। কেননা, তীব্র প্রতিযোগী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে গেগং আদি উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ। তাই ছাত্রদের এই আন্দোলনকে তাঁরা গোপনে সমর্থন জানাচ্ছেন গেগং বিরোধী অন্যান্য বিক্ষুব্ধ নেতাদের মতই। অরুণাচল ছাত্রনেতা তাবিন তাকি বলেছেন, অরুণাচল-আসাম সীমানা বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে এটাই অরুণাচল গরম করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

গ্রামের হাইস্কুলে এইমাত্র ছুটির ঘন্টা বাজলে শুরু হল গান :

'রিগনাই বরকযতন মা কান্নাই। শাড়ি ওয়াঞ্জাই রগনিকা নমুং। আর কানই
মান্ গুলকি। চিনিহা ওয়াঞ্জাই রগ সেক্কা।
চি নিহা নারাগ না নাং নাই।'...

কথাগুলি এদের মাতৃভাষা ককবরক। বাংলা তর্জমায় এরকম দাঁড়ায়

'বাঙালিরা আমাদের মাতৃভূমিকে নিয়েছে। আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতেই হবে। তরুণীরা, শাড়ি পরা বন্ধ করো। ওটা বাঙালিদের পোষাক। সুতরাং সবাইকেই 'রিগনাইবরক' পরতেই হবে।' (রিগনাইবরক হল ত্রিপুরীদের জাতীয় পোষাক)

পূর্বোত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরায় ঠিক এভাবেই উপজাতি স্বার্থ সুরক্ষার নামে প্রচারের জোয়ার এসেছে উগ্র জাতবিদ্বেষের। 'ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন' নামে উপজাতিদের প্রভাবশালী ছাত্র সংস্থা ত্রিপুরার গ্রামগঞ্জে স্কুলে কলেজে শুরু করেছে এই উগ্র ইমোশ্যানাল প্রচার। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি শাসিত ত্রিপুরায় প্রভাবশালী আঞ্চলিক দল 'ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি–'র ছাত্র সংগঠন এটি। শাসক পার্টির প্রধান প্রতিপক্ষ উপজাতি দল। ত্রিপুরা বিধানসভায় ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক গঠিত 'উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ', গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বত্র যুব সমিতির প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

এই ছাত্র সংস্থাটির দাবি : ত্রিপুরায় বসবাসরত সমস্ত বিদেশীদের হটিয়ে দিতে হবে এ রাজ্য থেকে। 'বিদেশী অনুপ্রবেশ রোধে চালু করতে হবে ইনার লাইন পারমিট প্রথা। ৬০ সদস্য–র ত্রিপুরা বিধানসভায় পাহাড়ি বাঙালি-সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে অচিরেই।'

শুধু পাহাড়ি অঞ্চলেই নয়, উগ্র উপজাতীয়তার প্রচারের ঢেউ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আছড়ে পড়ছে খোদ রাজধানী আগরতলায়ও। অক্টোবরের গোড়ায় আগরতলার একটি কলেজে এই প্রচারকে ঘিরে দুই প্রতিপক্ষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা, বিবৃতি, নিন্দা, সমালোচনার ঝড়। ত্রিপুরার গ্রামগঞ্জ থেকেও খবর আসছে বিক্ষিপ্ত সহিংসতার, প্রায় প্রতিদিন।

ত্রিপুরার আকাশে বাতাসে এখন বারুদের

> কথাগুলি এদের মাতৃভাষা : ককবরক। বাংলা তর্জমায় এরকম দাঁড়ায় : 'বাঙালিরা আমাদের মাতৃভূমিকে নিয়েছে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করতেই হবে। তরুণীরা, শাড়ি পরা বন্ধ করো। ওটা বাঙালিদের পোষাক। সুতরাং সবাইকেই 'রিগনাইবরক' পরতেই হবে।' (রিগনাইবরক হল ত্রিপুরীদের জাতীয় পোষাক)

ঝাঁঝ, বাতাসে ঝলসানো মৃতদেহের গন্ধ। টি এন ভি নাম দিয়ে উগ্রবাদী উপজাতিদের একটা অংশ প্রতিবেশী বাংলাদেশের চট্টগ্রামে গোপন ঘাঁটি থেকে পরিচালনা করছে সশস্ত্র রক্তাক্ত সংগ্রাম। হত্যা, সন্ত্রাস, গৃহদাহ, সংবাদ শিরোনাম।

ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের 'বিদেশী হটাও' শ্লোগান রাজ্য প্রশাসন থেকে গ্রাম ত্রিপুরা—সর্বত্র সৃষ্টি করেছে গভীর উদ্বেগ আর আতংক। প্রশ্ন উঠেছে—এই 'বিদেশী

জামিরের পদত্যাগ ছাত্র আন্দোলনের ফলশ্রুতি

শ্লোগান' কি ত্রিপুরার বুকে প্রতিবেশী আসামের মতোই ডেকে আনবে আরেক অশান্তি? আরেক রক্তাক্ত অধ্যায়?

ত্রিপুরার বিশিষ্ট উপজাতি নেতা ও শাসক বামফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথদেব এই উগ্র-আঞ্চলিকতার নিন্দা করে বলেন, এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। পৃথক রাজ্য করলেই কি ত্রিপুরার উপজাতিরা মুক্তি পাবেন? পোষাক দিয়ে কি একটি জাতিকে রক্ষা করা যায়? এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আগরতলায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন এস.এফ.আই.—এর রাজ্য সম্মেলনে ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।

১৯৭৮ সালে 'বিদেশী হটাও' দাবিতে আসুর জঙ্গী আন্দোলন ঘিরে প্রতিবেশী আসাম রাজ্য উত্তাল। সে বছরই মার্চ মাসে দক্ষিণ ত্রিপুরার তৈদুতে যুব সমিতির রাজ্য সম্মেলনে ত্রিপুরায় প্রথম 'বিদেশী ইস্যু' নিয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজ্যব্যাপী চলে ব্যাপক প্রচারাভিযান, বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ। ওই বছরই জুন মাসে যুব সমিতির বাজার বয়কট আন্দোলন ঘিরে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পার্বত্য ত্রিপুরার বুকে নজিরবিহীন পাহাড়ি-বাঙালি ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা। বেশ কয়েক হাজার নির্দোষ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ হানি। তারপরই যুব সমিতির 'বিদেশী ইস্যু'

আসুর সাধারণ সম্পাদক : শশধর কাকতি

চাপা পড়ে যায়।

তারপর ১৯৮২তে রাজধানী দিল্লিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস-যুব-সমিতি নির্বাচনী-সমঝোতা। সংকীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে জাতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে আসে আঞ্চলিক দল যুব সমিতি। সেই থেকে কংগ্রেস-সমিতি আঁতাত শাসক সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়ছে অদ্যাবধি।

> ত্রিপুরার বিশিষ্ট উপজাতি নেতা ও শাসক বামফ্রন্টের উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথদেব এই উগ্রআঞ্চলিকতার নিন্দা করে বলেন, এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। পৃথক রাজ্য করলেই কি ত্রিপুরার উপজাতিরা মুক্তি পাবেন? পোষাক দিয়ে কি একটি জাতিকে রক্ষা করা যায়? এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

সেই যুব সমিতির ছাত্র সংগঠন টি এস এফ নতুন করে ত্রিপুরার পাহাড়গঞ্জে আসামের ধাঁচের 'বিদেশী ইস্যু' নিয়ে প্রস্তুতি চালাচ্ছে আন্দোলনের। ১৯৮৬–র এপ্রিলে পশ্চিম ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় টি.এস. এফের তিনদিন ব্যাপী ১৮তম রাজ্য সম্মেলনে বিতর্কিত বিদেশী ইস্যু সহ ২৩ দফা দাবি প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' 'বিদেশী বাছাই', 'ইনার লাইন পারমিট' চালু প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাবি ওঠে—
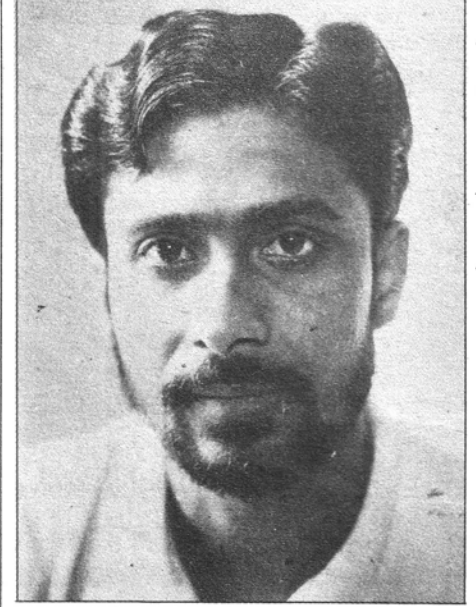
আকসা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়

প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রোমান হরফে উপজাতিদের মাতৃভাষা 'ককবরকে' শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশ রোধে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে। বাকি দাবিগুলি উপজাতিদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক।১৯৮৪ এবং '৮৭-র সম্মেলনেও অনুরূপ দাবি তোলা হয়।

১৯৮৫ সালে আমাদের 'বিদেশী' প্রশ্নে আসু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব এক বিতর্কিত চুক্তিতে উপনীত হন এবং সে বছরই নির্বাচনে জঙ্গী ছাত্রসংস্থা আসু গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পূর্বোত্তর ভারতের আসাম রাজ্যে গঠিত হয় অগপ মন্ত্রীসভা, যার ফলে ক্ষমতাসীন হন অনেক ছাত্র নেতা। উগ্র আঞ্চলিকতাবাদের উৎকট উত্থানে বিধ্বস্ত হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যের ভিত।

আসু আন্দোলনের অভাবিত সাফল্যের ঢেউ আছড়ে পড়ে প্রতিবেশী ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরামে। শুরু হয় নতুন করে বিদেশী শ্লোগান নিয়ে মিছিল, ঘেরাও, হরতাল। উগ্র আঞ্চলিকতাবাদের জোয়ার। ট্রাইবেল স্টুডেন্টস ফেডারেশানের ত্রিপুরায় বিদেশী ইস্যু নিয়ে নতুন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে উপজাতি যুব সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা এবং বিধান পরিষদীয় দলনেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেন—টি.এস. এফের উপর এখন আমাদের কোন কন্ট্রোল নেই। ওরা আমাদের
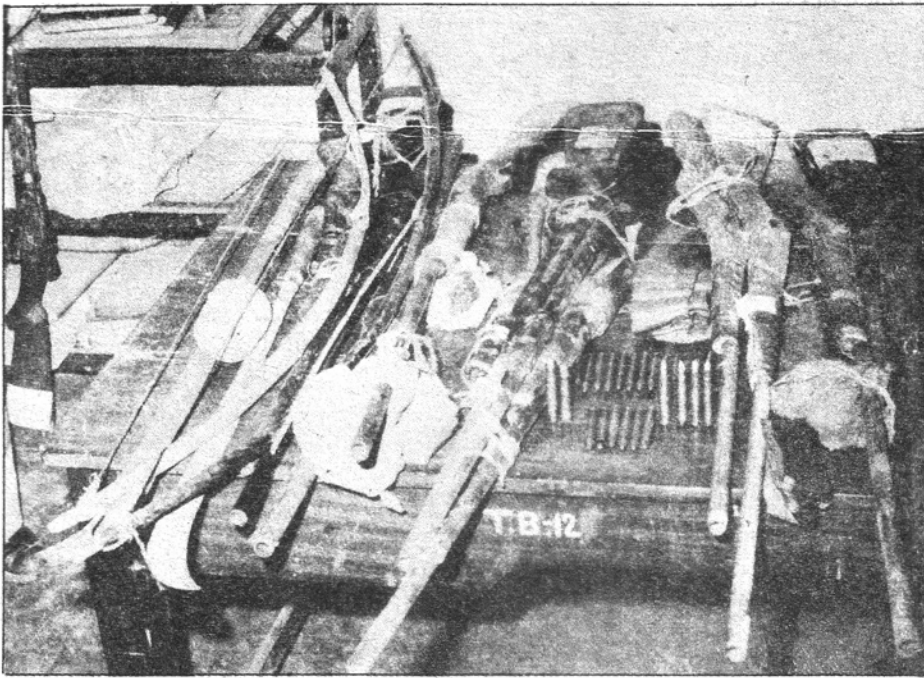
উপজাতীয় ছাত্রদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত অস্ত্রশস্ত্র

কথা শুনছে না। ঠিক কাদের বুদ্ধিতে ওরা পরিচালিত হচ্ছে সেটা বলতে পারব না। তবে আমি বিশ্বাস করি যুব সমিতির সমর্থন ছাড়া এককভাবে এ ধরনের আন্দোলন সফল হবে না—অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি।

বিদেশী প্রশ্নের আন্দোলনে মাতৃ সংগঠন যুব সমিতি প্রকাশ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব দেখালেও ত্রিপুরার গোয়েন্দা মহল মনে করেন, যুব সমিতির পরোক্ষ মদতেই শুরু হয়েছে এই বিতর্কিত স্পর্শকাতর উগ্র আন্দোলনের প্রস্তুতি।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে—স্ট্র্যাটেজিগত কারণেই সমিতির নেতৃবৃন্দ এক্ষুণি এই বিতর্কিত আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে চান না। কারণ তারা এখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে উদ্ভাসিত। তবে বিদেশী প্রশ্নটি ঘিরে আন্দোলন চাগিয়ে উঠলে ভবিষ্যতে অভিভাবকের ভূমিকায় মধ্যস্ততায় এগিয়ে আসবেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল আসামে আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদের মধ্যে।

পূর্বোত্তরের অন্যান্য আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থাগুলির সঙ্গেও টি.এস. এফের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ১৯৭৮—এ শিলং—এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে গঠিত হয় নর্থ ইস্টার্ন হিল স্টুডেন্টস ফোরাম। টি এস এফ প্রতিনিধিরাও এর সদস্য।

১৯৮০—র ফেব্রুয়ারি মাসে আসামের জোড়হাটে এক সম্মিলিত অনুষ্ঠানে গঠিত হয় নারসু অর্থাৎ নর্থ ইস্ট রিজিওন্যাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। উদ্যোক্তা ছিল অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। বর্তমান অগপ মন্ত্রীসভায় ছাত্রনেতৃবৃন্দ, ত্রিপুরার ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনও সেখানে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই থেকে পূর্বোত্তরের জঙ্গী ছাত্র সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনীভূত হয়। ক্রমেই তা জোরদার হচ্ছে। মিশনারীদের কলকাঠিও এর পেছনে সক্রিয় বলে জানা যায়। টি.এস.এফ.—এর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীদাস দেববর্মা একজন ধর্মান্তরিত ক্রিশ্চিয়ান, আবেগউত্তাল উঠতি নেতৃত্ব। শ্রী দাস বলেছেন, বিদেশী বিতাড়ন করতে সরকারকে বাধ্য করা হবে। এবং তা আমাদের বলা ভিত্তিবছর অনুযায়ীই। যুব সমিতির নেতৃবৃন্দেরও পরোক্ষ অভিমত এটাই। বিদেশী প্রশ্ন নিয়ে স্মারকপত্র দিতে ডিসেম্বরের গোড়ায় শ্রী দাসবাবুর নেতৃত্বে একটি ছাত্র প্রতিনিধি দল রাজধানী দিল্লি গিয়েছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবেন তাদের দাবির কথা, আন্দোলনের সিদ্ধান্ত। তারপরেই নেবেন পরবর্তী পদক্ষেপ। টি.এস.এফ.—এর এই তৎপরতা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন এখন উদ্বিগ্ন। আতংকগ্রস্ত ত্রিপুরায় বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় মানুষ।

১৯৬৮ সালে গঠিত এই টি.এস.এফ.—এর সদস্য সংখ্যা এখন ২৫ হাজার। উপজাতি মহল্লায় তাদের এই উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী দাবিদাওয়া এবং তৎপরতার দিনদিন প্রভাব বাড়ছে। একদিকে টি.এন.ভি.'র আন্দোলন অন্যদিকে টি.এস.এফ.—এর 'বিদেশী খেদাও' শ্লোগান ত্রিপুরার জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে। পাঞ্জাবের মতই ত্রিপুরায়ও কি উগ্র উপজাতিয়তাবাদের আগুন জ্বলে উঠবে ?

অন্যান্য রাজ্যগুলির মত মিজোরামেও সেই একই ঘটনা। একদিকে যখন লালডেঙ্গার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস—এম.এন.এফ. কোয়ালিশন সরকার বৈরি মিজো তৎপরতার লেশ মুছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য লড়ছে তখন মিজো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন দাবি তুলেছে চাকমা হটাবার। বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী লালডেঙাও তাতে সায় দিচ্ছেন। এবং চাকমা বিরোধী বক্তব্য রাখছেন। কারণ সামনে নির্বাচন। এভাবেই সরকারী নীতিকে কন্ট্রোল করছে মিজো ছাত্ররা। যখন রাজীব-লালডেঙ্গা চুক্তি সম্পাদনের জোর চেষ্টা চলছিল তখন থেকেই আইজলের ছাত্রনেতারা বিদেশী খেদাও মার্কা দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল আসামের মধ্যেই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র নেতাদের দাবি আসামের ভিত্তিবর্ষ যে বছর থেকে ধরা হচ্ছে, মিজোরামের ক্ষেত্রেও সেই বছরকেই ভিত্তিবর্ষ ধরা উচিত। আসামের ক্ষেত্রে যা মানা হয়েছে মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দিক থেকে তা মানা উচিত—ছাত্রদের এই দাবিকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই মিজোরামে ছাত্র আন্দোলনের

অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তাবিয়েন তাকি

এই যুক্তিযুক্ত দাবির পেছনে মিজো জনসাধারণের স্বীকৃতি আছে। আর ভোটের রাজনীতি কব্জায় রাখতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উসকে দিচ্ছে ছাত্রদের। আসু নেতা প্রফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্রীর গদি দখল করার পর উত্তরপূর্বের অনেক ছাত্রনেতারাই সে ধরনের স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত বোধ করছেন।

সাতভগ্নী-রাজ্যে ছাত্র রাজনীতির এই তুমুল কোলাহলের নেপথ্যে আরও এক সামাজিক ও অবস্থানগত কারণ আছে। এখানকার সব রাজ্যেই একটা উল্লেখ করার মত জনসংখ্যা হল উপজাতিদের সংখ্যা। যারা দীর্ঘকাল ছিল উপেক্ষিত। এখন তাদের ছেলেপুলেরা শিখছে—পড়ছে, তাই তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বাড়ছে। তারাই শিক্ষাজীবন শেষ করে নাম লেখাচ্ছে এসে রাজনৈতিক আঙিনায়। প্রতিষ্ঠিত দলে ঠাঁই না পেলে নিজেরা দল গড়ছে। এই ঘটনাপ্রবাহেরই প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে, পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন সুদৃঢ় করতে ছাত্রাবস্থা থেকেই তারা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের প্রেরণার কাজটি করছে আসামে ছাত্রদের মন্ত্রী হওয়া।

ছবি : সজল মুখার্জি, কল্যাণ চক্রবর্তি, সি এন এস

স্মাগলার এবং সন্ত্রাসবাদীদের আঁতাত নতুন কোন সংবাদ নয়। কিন্তু যখন এই আঁতাত–এ সরকারী আমলা কিংবা উচ্চস্তরীয় রাজনৈতিক মদত এসে জোটে, তখন তা নিঃসন্দেহে একটি খবর। সম্প্রতি এ রকমই চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনায় রাজধানী দিল্লি আলোড়িত। সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনারই নেপথ্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রতিবেদনটি পেশ করেছেন আমাদের প্রতিনিধি।

দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কি চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত?

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ ওয়াসন (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)

কেন্দ্রশাসিত দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ ওয়াসন সাম্প্রতিক কালে দেশের কয়েকটি বিতর্কিত মামলার রায় দান করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। কুখ্যাত অপরাধী চার্লস শোভরাজ, আন্তর্জাতিক ঠগ রাজেন্দ্র শেঠিয়া এবং দিল্লি ট্রানজিস্টার বোমা মামলার অভিযুক্তদের তিনিই সাজা শোনান। রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যার চেষ্টায় ধৃত সন্ত্রাসবাদী করমজিৎ সিং–কেও বিচারের জন্য শ্রী ওয়াসনের আদালতে পেশ করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য চোরাচালান চক্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।

দিল্লির রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স ডাইরেকটরেট বিগত দু'মাস ধরে সুভাষ ওয়াসনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার পর যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে বলা হয় : দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সুভাষ ওয়াসনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী কৃপাল মোহন বিরমানির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। ভারতীয় আইনজীবীদের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু শ্রী ওয়াসনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা কতদূর সত্য? তাঁর সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক স্মাগলারের সম্পর্ক রাখার কথা বলা হচ্ছে–এ সম্পর্কে তারই বা অভিমত কি?

এদিকে বৃটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিব পার্টি তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি মার্গারেট থ্যাচারের প্রিয়পাত্র এবং প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ-রক্ষাকারী 'এ্যাংলো-এশিয়ান কনজারভেটিব অ্যাসোসিয়েশান'–এর অধ্যক্ষ প্রোফেসর মহেন্দ্র পাল সিং–এর স্ত্রী শ্রীমতী কুলদীপ কৌর বর্তমানে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে দিল্লির তিহার জেলে বন্দী। 'পাওয়ার বলকের' কাছের মানুষ আর এক কোটিপতি স্মাগলারও বেশ কিছুদিন ধরে ফেরার। দিল্লি পুলিশ তাকে ধরার জন্য বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ২০,০০০ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে দিল্লির অভিজাত সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রভাবশালী কৃপাল মোহন বিরমানিকে হ্যাশিশ স্মাগলিং–এর অভিযোগে আটক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসন এবং সমাজের উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছু সন্ত্রাসবাদী, স্মাগলার এবং কুখ্যাত অপরাধীর যোগাযোগের ব্যাপারটিও গভীরভাবে অনুধাবন করার কাজ শুরু হয়ে যায়।

ইনটেলিজেন্স এজেন্সি আশা করছেন এর ফলে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও প্রবল। এ ব্যাপারে এমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নজর রাখা হচ্ছে যাদের একদিকে যেমন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে হাত রয়েছে, অন্যদিকে তারা অপরাধ-জগতের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দু'টি পৃথক গুপ্তচর সংস্থা থেকে প্রাপ্ত দু'টি তথ্য পাওয়ার পর পাঁচ মাসের তৎপরতার ফলে যে পরিণাম ও অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায় তাতে শুধু রাজধানী দিল্লিই নয়–গোটা ভারতবর্ষই স্তম্ভিত। কিন্তু এরই সঙ্গে কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তিও তৎপর হয়ে উঠেছেন–যাতে এই কেলেংকারীতে আরও কিছু 'প্রতিষ্ঠিত' ব্যক্তি জড়িয়ে না পড়েন।

১৯৮৬–র মাঝামাঝি ভারতের দু'টি গোয়েন্দা বিভাগ বিদেশ থেকে দু'টিপৃথক তথ্য পায়। প্রথমত, ইন্টারপোল (আন্তর্জাতিক পুলিশ) ভারতের রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস–কে কুখ্যাত একটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্র সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করে। তারা জানায়–হ্যাশিশ, হেরোইন এবং স্ম্যাক–এর চোরাচালানে লিপ্ত এই চক্রটির ঘাঁটি কলকাতা, দিল্লি এবং বোম্বাই।

দ্বিতীয়ত, লণ্ডন থেকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার সূত্র দিল্লিকে জানায়, বৃটেনে সক্রিয় কিছু খালিস্তানপন্থী শিখ, ক্ষমতাসীন কনজারভেটিব

পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট 'এ্যাংলো-এশিয়ান কনজারভেটিব অ্যাসোসিয়েশান'-এ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে লণ্ডনের এমন কিছু প্রভাবশালী শিখের কথাও উল্লেখ করা হয়, যারা ক্রমাগত ভারতের শিখ আতংকবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাদের সাহায্য করে চলেছে।

তথ্যগুলি পাওয়ার পরই গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে। বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর তাঁরা একের পর এক চমকপ্রদ তথ্য পেশ করতে শুরু করেন। প্রথম তথ্যটি পাওয়ার অব্যবহিত পরেই রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স এজেন্সি কলকাতার উপকণ্ঠে বড় বড় মেশিন এবং কলকব্জা ভর্তি একটি ট্রাক আটক করে। ট্রাকে বোঝাই মেশিনের লোহার চাদরের ভেতর থেকে প্রচুর পরিমাণে হ্যাশিশ উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ড্রাইভার যোগিন্দর সিং, শিবরাজ সিং এবং ক্লিনার রণজিৎ সিং-এর দেওয়া খবর অনুযায়ী গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা দিল্লির মেহরৌলিস্থিত একটি ফার্মহাউস থেকে আরও ১৪০০ কিলোগ্রাম হ্যাশিশ বাজেয়াপ্ত করেন। সেই সঙ্গে এই আন্তর্জাতিক স্মাগলিং চক্রের আধিপত্যও অনেকটা দমন করা সম্ভব হয়।

এর কিছুদিন পরই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো এবং কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা দপ্তর একযোগে 'ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শ্রীমতী কুলদীপ কৌর-কে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে 'এ্যাংলো-এশিয়ান কনজারভেটিব অ্যাসোসিয়েশান'-এর অধ্যক্ষ প্রফেসার মহেন্দ্র পাল সিং-এর স্ত্রী শ্রীমতী কুলদীপ কৌর-এর ভারতে শিখ সন্ত্রাসবাদী এবং লণ্ডনের খালিস্তান পন্থিদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করার খবরও ফাঁস হয়ে যায়। কুলদীপ কৌর-এর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তিনি ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে সরাসরি ভাবে সচেষ্ট।

ইনটেলিজেন্স এজেন্সির এই একের পর এক রহস্য উদঘাটনের মাঝে দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সুভাষ ওয়াসনের সাসপেণ্ড হওয়ার ঘটনা সব থেকে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করে।

স্মাগলিং সম্রাট কৃপাল মোহন বিরমানির সঙ্গে শ্রী ওয়াসনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংক্রান্ত রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স ডাইরেকটরেটের রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্বরাষ্ট্র এবং আইন মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে মন্ত্রণালয় আরও বিশদ খবরাখবর চেয়ে পাঠান। রেভিনিউ ইনটেলিজেন্সও এজন্য একরকম তৈরিই ছিল। তারা এক দীর্ঘ অভিযোগ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের একটি গোপনীয় ফাইল বিশেষ পত্রবাহকের মাধ্যমে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মি. জাসটিস টি.পি.এস. চাওলার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬ বিচারপতি চাওলার নেতৃত্বে দিল্লি হাইকোর্টে বিচারকদের এক জরুরীকালীন বৈঠক ডাকা হয়, প্রায় তিন ঘন্টা

অভিযুক্ত চোরাচালানের শিরোমণি কৃপালমোহন বিরমানি

রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর 'মেটেরিয়াল এভিডেন্স'-এর সাপেক্ষে বিচারপতিগণ শ্রী ওয়াসনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দিল্লির জেলা জজ এক নির্দেশনামায় বলেন: জেলা এবং সেসন জাজ পি.কে. তেওয়ারীকে এতদ্বারা জানান হচ্ছে যে, আগামী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দিল্লির অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জু গোয়েল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজকর্ম দেখাশুনা করবেন, কারণ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (বর্তমান) শ্রী সুভাষ ওয়াসনকে এখন থেকে সাসপেণ্ড করা হল। দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার উষা মেহরার হস্তাক্ষরিত এই আদেশনামা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হঠাৎ জারি করা এই আদেশে শুধু দিল্লির বিচারকমহলই নয় সাধারণ জনতার মধ্যেও বিস্ময় প্রকাশ পায়। স্বয়ং সুভাষ ওয়াসনও বুঝতে পারেন নি দু'মাস আগের একটি ঘটনার জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত এত বড় মূল্য দিতে হবে। অবশ্য শ্রী ওয়াসনের পরিচিত জনেরা জানান, তাঁকে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। রবিবার। বিকেলের দিকে শ্রী ওয়াসন যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন অন্যান্য দিনের মতই তাঁর সঙ্গে তাঁর দেহরক্ষীও ছিল। কয়েকটি বিতর্কিত মামলায় বেশ কিছু কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীকে শাস্তি দেওয়ার পর থেকে দিল্লি পুলিশ শ্রী ওয়াসনের নিরাপত্তার জন্য একজন সশস্ত্র দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করে। ৩, আনসারী রোডস্থিত নিজস্ব সরকারী বাসভবন থেকে বেরিয়ে শ্রী ওয়াসনের গাড়ি সোজা দিল্লির পাঁচ তারা হোটেল 'অ্যামবাসেডর'-এ এসে পৌঁছয়। সেখানে কুখ্যাত স্মাগলার কৃপাল মোহন বিরমানির ভাই কৃষ্ণ মোহন বিরমানি তাঁর এক ভাইপোর সঙ্গে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্রী ওয়াসন হোটেলের বাইরেই তাঁর দেহরক্ষীকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলেন এবং তারপর কৃষ্ণ মোহনের সাথে হোটেলের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যান। রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স অফিসাররা মনে করেন, সেসময় ফেরারী আসামী কৃপাল মোহনের মামলার নিস্পত্তি কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যই শ্রী ওয়াসন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণ মোহন বিরমানির সঙ্গে মিলিত হন।

কিন্তু ততক্ষণে এই গোপন বৈঠক সম্বন্ধে রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর অফিসারেরা খবর পেয়ে যান। তাঁরা খবর পান এরপর শ্রী ওয়াসন কৃষ্ণ মোহনের গাড়িতে কৃপাল মোহন বিরমানি যেখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে সেখানে যাবেন। হোটেল থেকে বিরমানির গাড়ি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একপাশে দাঁড়ান রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স-এর অফিসাররা গাড়িতে তাঁদের পিছু নেন। কিন্তু একটু পরেই বিরমানি বুঝতে পেরে যান যে, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি তীর বেগে গাড়ি চালাতে শুরু করেন। কিন্তু কনাট প্লেসের কাছে পৌঁছে আর বেশি জোর গাড়ি চালান সম্ভব হয় না, এর মধ্যে গাড়িটি রিগ্যাল সিনেমার কাছে একটু ধীরে হয় এবং একজন লোক ছুটে হলের ভীড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইনটেলিজেন্স অফিসাররাও গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু ধাওয়া করেন। তারা আশা করেছিলেন গাড়ি থেকে লাফিয়ে যে লোকটি পালানোর চেষ্টা করছে, সেও স্মাগলারদেরই কেউ।

রিগ্যাল সিনেমার সিঁড়ি টপকে অফিসারেরা শেষ পর্যন্ত পলায়নরত ব্যক্তিটিকে ছাদের কাছে সিঁড়িতে ধরে ফেলেন। কিন্তু ধৃত ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেওয়ার পর তাঁরা হতভম্ব হয়ে যান। যাকে তাঁরা চোরাচালান চক্রের সদস্য বলে মনে করেছিলেন তিনি আসলে দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সুভাষ ওয়াসন।

শ্রী ওয়াসনের পরিচয় পাওয়ার পর সেই মুহূর্তে ইনটেলিজেন্স অফিসাররা তাঁকে ছেড়ে দেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হতে থাকে। পরে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন শ্রী ওয়াসন একটি কথাই বারবার বলেন, তার সঙ্গে কৃপাল মোহন বিরমানির ভাই কৃষ্ণ মোহন বিরমানির বন্ধুত্ব খুবই অল্পদিনের। তিনি জানতেন না, কৃষ্ণ মোহনের ভাই কৃপাল মোহন কি করেন। তিনি আরও জানান, কৃপাল মোহনের চোরাচালান চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিও ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

কিন্তু এরই মধ্যে বিভিন্ন কারণে রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের সন্দেহ ঘনীভূত হতে শুরু করে। ২৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনার স্বপক্ষে শ্রী ওয়াসন যে যুক্তিগুলি দেখান তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। শ্রী ওয়াসনের মতে, হোটেল অ্যাম্বাসেডর-এ তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ মোহনের হঠাৎই দেখা হয়ে যায়। যেহেতু দু'জনের পরিচয় আগের থেকেই ছিল এবং কৃষ্ণ মোহন কনাট প্লেসের দিকেই যাচ্ছিলেন, তাই তিনি কৃষ্ণ মোহনের গাড়িতে চড়েন এবং রিগ্যাল সিনেমার কাছে নেমেও যান। কিন্তু শ্রী ওয়াসনের জবানবন্দী শোনার পর মনে হওয়াই স্বাভাবিক-যদি তিনি হোটেল অ্যাম্বাসেডর-এই এসেছিলেন তবে কেন তিনি হোটেলের বাইরে থেকেই তাঁর দেহরক্ষীকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। তিনি তো তাঁর নিজের গাড়িতেই হোটেলে

এসেছিলেন। তাহলে তা ছেড়ে দিয়ে দেহরক্ষী ছাড়াই কৃষ্ণ মোহনের গাড়িতে তিনি কেন কনাট প্লেসে যাচ্ছিলেন? পুলিশ কৃপাল মোহন বিরমানি-কে অনেকদিন ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। শুধু তাই নয় তাকে ধরার ব্যাপারে ২০,০০০ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। এই রকম বহু-চর্চিত একজন স্মাগলার-এর সম্পর্কে দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কিছুই জানতেন না-ইনটেলিজেন্স অফিসাররা তা মানতে রাজি নন।

ঘটনার পর দিন সুভাষ ওয়াসন অভিযোগ করেন যে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। আর একদিকে ততক্ষণে ইনটেলিজেন্স অফিসারেরা শ্রী ওয়াসনের সঙ্গে বিরমানির যোগাযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছেন। রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স-এর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, 'যেহেতু ব্যাপারটিতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর মত ব্যক্তি জড়িত-তাই সম্পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়ার আগে তাঁরা সে সম্বন্ধে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে চান। এই কারণেই ঘটনার ছ'সপ্তাহ পর সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে গোপনীয় রিপোর্টটি তারা দাখিল করতে সক্ষম হন। কিন্তু রিপোর্টটিতে আর কি কি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা জানাতে ডাইরেক্টরেটের অফিসাররা তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এদিকে সুভাষ ওয়াসনও চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুধু বলেন, 'যেহেতু আমি আইন বিষয়ক সেবার কার্যে নিযুক্ত, তাই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। আমার যা বলার তা আমি বিস্তৃত অভিযোগ পত্র পাওয়ার পর আমার উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদেরই জানাব।'

৪২ বছর বয়স্ক সুভাষ ওয়াসন ১৯৭২ সালের আগে দিল্লির তিস-হাজারী আদালতে ওকালতি করতেন। ১৯৭২ সালে তিনি 'ইণ্ডিয়ান লিগাল সার্ভিস'-এ যোগদান করেন এবং ১৯৮২-তে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা মনে করেন, বিরমানির সঙ্গে তাঁর কম করে হলেও ২০ বছরের জানা শোনা। কিন্তু এমন কোন ব্যক্তি, যার ভাই একজন স্মাগলার, তাকে জানা কি অপরাধের?

এ সম্পর্কে পাতিয়ালা হাউসের একজন ব্যবহারজীবীর যুক্তিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি জানান, কৃপাল মোহন বিরমানির ভাই-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার জন্যই যদি সুভাষ ওয়াসনকে সাসপেণ্ড করা হয়ে থাকে তাহলে স্মাগলার সর্দার হরনাম সিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য কেন রাষ্ট্রপতি জৈল সিং কিংবা বুটা সিং-এর বিরুদ্ধে সে রকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। কৃপাল মোহন বিরমানিকে তো এখন গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু সর্দার হরনাম সিং এখনও পর্যন্ত ফেরার।

রেভিনিউ ইনটেলিজেন্সের মতে এই চোরাচালান চক্রে দিল্লিতে তিনজন সদস্য ছিলেন-এস. পি. রাও ওরফে নির্মল (যার ফার্ম হাউস থেকে ১,৪০০ কে.জি. হ্যাশিশ বাজেয়াপ্ত করা হয়), 'নাইস গুড্স কেরিয়ার'-এর মালিক সর্দার হরনাম সিং (যিনি এখনও ফেরার) এবং কৃপাল মোহন বিরমানি। হরনাম সিং-এর এখনও পর্যন্ত ধরা না পড়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, রাজনৈতিক উচ্চস্তরে তাঁর হাত থাকার দরুনই এটা সম্ভব হচ্ছে।

কুলদীপ কৌরকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

এ মাসেই গোয়েন্দা বিভাগ দিল্লিতে এই দুটি ব্যাপারে বেশ তৎপরতা দেখায়। এই দু'টি ঘটনাকেই অবশ্য দিল্লির একাংশ গোয়েন্দা বিভাগের চ্যালেঞ্জিং মনোভাব এবং অত্যুৎসাহের কারণ হিসেবে দেখাতে চাইছেন। অপরদিকে আবার এই দু'টি ঘটনাতেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারটাও প্রকট হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন সর্দার হরনাম সিং-এর 'ফেরার' থাকার ঘটনার সঙ্গে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থাকার কথা বলা হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি ধৃত কুলদীপ কৌর বলছেন যে, তাঁর সঙ্গে ভারত সরকারের গৃহ-মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে শ্রীমতী কৌর আরও বলেন, বৃটেনের-কুখ্যাত ড্রাগ স্মাগলার অজিত সতওয়্যংকার-এর দেওয়া ভুল খবর অনুযায়ীই ইনটেলিজেন্স অফিসারেরা তাকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, তাঁর স্বামী 'এ্যাংলো এশিয়ান কনজারভেটিব অ্যাসোসিয়েশান'-এর নির্বাচনে ওই স্মাগলারের সমর্থিত প্রার্থী নরেন্দ্র স্বরূপ-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। সম্ভবত এই কারণেই সতওয়্যংকার ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগে ভুল খবর দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করান। শ্রীমতী কৌর আরও বলেন, কিছুদিন আগে গৃহমন্ত্রী বুটা সিং যখন তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি বেশ কয়েক দিন তাঁর এবং তার স্বামী প্রফেসর মহেন্দ্র পাল সিং-এর সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হন।

কিন্তু ইনটেলিজেন্স অফিসাররা কুলদীপ কৌর-এর এই সাফাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে অভিযুক্ত কুলদীপ কৌর-এর কার সঙ্গে জানাশোনা আছে, তার সঙ্গে ভারতে তাঁর উগ্রপন্থী কার্যকলাপে মদৎ দেওয়ার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর এবং দিল্লি পুলিশ এখন কাশ্মীরে গিয়ে সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে আসার অনুমতি চেয়েছেন, যাতে করে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে-শ্রীমতী কৌর শুধু মাত্র ভুল নাম নিয়ে এক হোটেলেই থাকেন নি, উপরন্তু জম্মুর এক জেলে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী হরদেব সিং-এর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগ জানান, তিনি এই সাক্ষাৎ জম্মুর এম.এল.এ. এ্যাডভোকেট ভীম সিং-এর সাহায্যে 'কুমারী মুক্তা' এই ছদ্মনামে করেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের মতে, ১ মে ১৯৮৬-তে জম্মুর সেই জেল-এর রেকর্ডে উক্ত সাক্ষাৎকার-এর জন্য যে অনুমতি পত্র দাখিল করা হয়েছিল, তা এখনও মজুদ আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এম.এল.এ. ভীম সিং-এর স্ত্রীই বর্তমানে দিল্লিতে শ্রীমতী কৌর-এর মামলা দেখাশোনা করছেন।

বর্তমানে কুলদীপ কৌর দিল্লির তিহার জেলে বন্দী, অপরদিকে দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী সুভাষ ওয়াসন সাসপেণ্ড হয়ে আছেন। এবং এও প্রকাশ যে দু'টি মামলারই প্রাপ্ত গোপন সূত্র সমূহ কোন না কোন ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, গোয়েন্দা বিভাগের হাতে ধরা পড়ার পর কিংবা তাঁদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যই অভিযুক্তরা নিজেদের সঙ্গে কোন না কোনও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জাহির করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের দাবির মধ্যে যদি যথার্থই কোন সত্য নিহিত থাকে তাহলে তা নিশ্চয়ই সমগ্র দেশের সামনে একটা গুরুতর সংকটের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলবে।

বর্তমানে এই দু'টি পৃথক মামলার বিভিন্ন দিক নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগ এখন অনুসন্ধানে তৎপর। এরই ফলশ্রুতিতে সন্ত্রাসবাদ, অপরাধ জগৎ এবং রাজনৈতিক উচ্চ মহলের মধ্যে যে ত্রিকোন যোগসূত্রের কথা শোনা যাচ্ছে তার পরবর্তী প্রকাশ কোন আশ্চর্য সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তার জন্য উৎসুক জনগণের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব

স্যুইস ব্যাঙ্কে কাদের এত কালো টাকা ?

স্বপ্নের দেশ স্যুইজারল্যাণ্ডে ব্যাংক-গুলি চিরকালই রহস্যময়। সেখানেই তাবৎ ধনী ব্যক্তি থেকে তাবড় বিশ্ব নেতাদের টাকা জমা থাকে। নিপুণ গোপনীয়তা কোনদিনই তাকে দিনের আলোয় আসতে দেয় না। তবু নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার জাল ছিঁড়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে অনেক অজানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। বেরিয়ে পড়েছে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি ও আমলাদের লুকোন টাকার খবর। কেন এক অভিনেতা ও সংসদ সদস্যের ভাই নিজেকে ওদেশের অনাবাসী ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করেছেন ? ভারতীয় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ আর আমলাদের টাকা কিভাবে ওখানে জমা পড়ে ? অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং কি তাঁদের ধরতে পারবেন ? ভারতে সর্ব-কালের সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনার দিকে আমাদের দুই বিশেষ সংবাদদাতা জয় দুবাসী ও বিজয় দত্তর আলোকপাত।

ব্যাঙ্কের গোপন লকার খোলা হচ্ছে

স্যুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে ভারতীয় অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সংখ্যা অজস্র। প্রায় পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার কোটি টাকা রয়েছে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে। এছাড়া ইকুয়াডর, হংকং, ব্রাসেল্স, মরিশাস, বাহামাতেও ভারতীয় অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কোটি কোটি টাকা জমা রয়েছে। এখানকার ব্যাঙকে জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং গত ১৪ নভেম্বর লোকসভায় জানিয়েছেন এইসব অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা বাস্তবিক "ভারত বিরোধী"। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই চাঞ্চল্যকর বিবৃতির পর শোরগোল উঠতে থাকে যে, এইসব দেশ বিরোধী অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা কারা ? কি তাঁদের পরিচয় ?

এর কিছু দিন আগেই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই.এম.এফ) একটি স্টাডি রিপোর্ট পেশ করে যে, স্যুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের প্রায় ১,৩৩২ কোটি টাকা জমা আছে। তবে গোপন বিভিন্ন উপায়ে এই অঙ্কের থেকে ঢের বেশি টাকা ওখানে আছে বলে আই.এম.এফ. নোট দেয়। এবং স্টাডি রিপোর্ট পেশের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা তোলপাড় শুরু হয়। কদিন পরেই লোকসভাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী ঘটনাটি স্বীকার করেন। বাণিজ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতির পর বিদেশী মুদ্রা আইনের প্রয়োগ শুরু হয়। বেরিয়ে পড়ে বহু অজানা তথ্য। বিষয়টি কিন্তু কোন অংশেই গুজব ছিল না। কারণ আই.এম.এফ তাদের তথ্যগুলি খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংগ্রহ করেছিল। তারা আরো জানায় যে ভারতীয়দের জমা অর্থের পরিমাণ প্রতিবছরই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এবং এটা ঘটেছে স্যুইস ব্যাঙ্কেই। এর সাথে আরেকটি তথ্য আবিষ্কৃত হয় যে, গত একবছর আগে প্রায় চারশো কোটি ওই ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর চালিয়ে আই.এম.এফ. জানতে পারে যে কিছু নামকরা ভারতীয় ওই টাকাটা তুলেছেন। এই তথ্যটির পাশাপাশি আরেকটি অভিযোগ ভেসে আসে, তা হল বিখ্যাত অভিনেতা ও সংসদ সদস্য অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভ বচ্চন গত বছরে স্যুইজারল্যাণ্ডে উড়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানকার স্যুইস ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজেকে অনাবাসী বলে দাবি করেন। ঠিক এই বিষয়টি থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত।

অজিতাভ কিন্তু নিজেই অমিতাভের ব্যবসাপত্তর দেখে থাকেন। সিনেমা এবং অন্যান্য ব্যবসাগুলির নজরদারি করাই হলো তাঁর প্রধান কাজ। অজিতাভ বিদেশ যাবার সময়ই কিন্তু একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় অমিতাভের খুব সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। অমিতাভ অসুস্থ ও রাজনীতির আসরে নেমে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাচ্ছেন। ঠিক সেসময়ই অজিতাভ সপরিবারে স্যুইজারল্যাণ্ডে উড়ে যান। ব্যাপারটা প্রথমে বোঝা যায়নি। পরে যখন অজিতাভের বাড়ির চাকর পাশের এক বাড়িতে গিয়ে কাজ চায়, তখনই তাদের মনে কিছুটা কৌতূহল জাগে। পরে খবর নিয়ে তারা জানতে পারেন যে, অজিতাভ সপরিবারে স্যুইজারল্যাণ্ডে চলে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে অমিতাভের ছেলেমেয়েরাও স্কুলে পড়ার জন্য সেখানে রওনা দিয়েছে। অজিতাভের স্ত্রী রোমিলার বাবা মা থাকেন লণ্ডনে। রোমিলা বিয়ের আগে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ছিলেন। এ কারণে রোমিলার বাবা-মার নাকি সায় ছিল যে, রোমিলা যেন ওই রকম পরিবেশেই থাকে, ফলে স্যুইজারল্যাণ্ড সবদিক
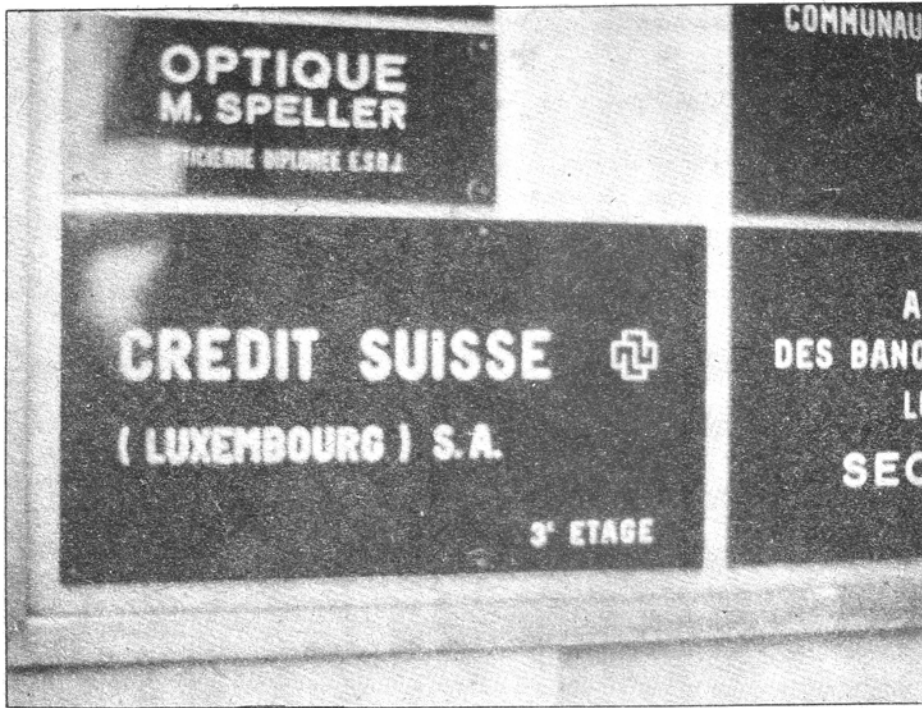
ব্যাঙ্কের একটি লকারের সংকেত

থেকেই ছিল আদর্শ। এছাড়া অজিতাভেরও ইচ্ছে ছিল সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি ওষুধের ব্যবসা করবেন। কারণ সে দেশে বড় বড় ওষুধের কোম্পানি আছে। ফলে সেখানে ব্যবসা করারও সুবিধে অনেক। এসব ভেবেই অজিতাভ সুইজারল্যাণ্ডে পাড়ি জমান।

কিন্তু এই ঘটনাটিই স্যুইস ব্যাঙ্ক-রহস্যের চাবি খুলতে শুরু করে। একজন কংগ্রেস আই সংসদ সদস্য অভিযোগ করেন যে, অজিতাভ বচ্চনের পরিবার স্যুইস সরকারের কাছে সি-ক্লাস স্যুইস নাগরিকত্বের আবেদন জানিয়েছে। সেই সঙ্গে ১২ কোটি টাকা দিয়ে লেক জেনেভার কাছাকাছি বেনামে একটা ভিলাও কিনেছে। ওই কংগ্রেস সংসদ সদস্য আরো জানালেন যে, স্যুইস সরকার তাঁদের নাগরিকত্বের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্যুইজারল্যাণ্ডে সম্পত্তির ব্যাপারেও তাঁরা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ভারতের একটি কাগজে এই সময়েই লেখা হয় যে, একজন প্রখ্যাত অভিনেতা এবং সংসদ সদস্যের ভাই-এর স্যুইজারল্যাণ্ডে বসবাসের বিষয়টি নিতান্তই কৌতূহলকর হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয় যে, যাঁর রোজগারের উৎস হল ভারত, তিনি কি করে নিজেকে অনাবাসী হিসেবে দাবি করেন? তাহলে কিভাবে সেই টাকা অজিতাভ রোজগার করলেন? তাঁর স্ত্রী রোমিলা ছিলেন একজন এয়ারহোস্টেস। একজন এয়ারহোস্টেসের পক্ষে এতটাকা রোজগার করা স্বাভাবিক নয়। সুতরাং ওই কোটি কোটি টাকা, যার পরিমাণ আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা, তা রোজগার করার জন্য অজিতাভকে অন্য রাস্তা বেছে নিতে হয়েছে। সাদা কথায় তা কালো রাস্তা। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক এই ব্যাপারে মন্ত্রী পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে বলে যে, অজিতাভের স্যুইজারল্যাণ্ডে অনাবাসী হবার ব্যাপারটি নিতান্তই রহস্যজনক।

এর পরে ভারতের অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং লোকসভায় জানালেন যে, স্যুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় অ্যাকাউন্ট হোলডারদের বিষয়টি তদন্ত করতে বেশ কিছু অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ভারতের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিষয়ে কাগজপত্র ও প্রমাণ যোগাড় করছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী কি অভিনেতা

(P) — Personal.
Alafor H A
Credit Suisse
Paradeplatz 8
8021 Zurich

Attn: Dr. Ralph Wirth
Ref 9-29

After confirming from Bank should give a ring to Mrs Fraikal at 493-2968.—
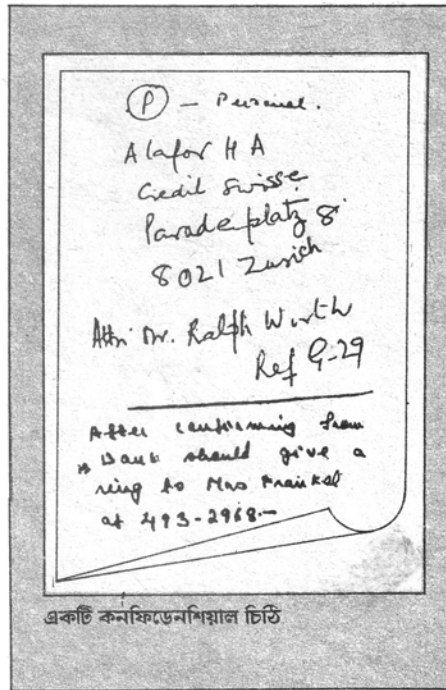
একটি কনফিডেনশিয়াল চিঠি

এবং সংসদ সদস্য অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভের বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন? এই ঘটনায় অমিতাভ বচ্চনের নাম জড়িয়ে পড়েছে, পরোক্ষভাবে যার অর্থ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাম জড়িয়ে পড়া।

অমিতাভ-অজিতাভ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ, সুতরাং কেউই বিশ্বাস করবেন না যে, অজিতাভ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্যুইজারল্যাণ্ডে অনাবাসী ভারতীয় হিসেবে বসবাস করতে যাবেন। বিষয়টি এত জটিল যে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যক্তি স্বীকার করেছেন যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ঘটনাটিতে কিছুটা হতচকিত। অজিতাভের বিষয়টি হয়তো রাজীব ক্ষমার চোখে দেখেছেন। কিন্তু যেহেতু বচ্চন পরিবার প্রধানমন্ত্রী রাজীবের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর উচিত এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। কারণ সত্য মিথ্যা যাই থাকুক না কেন, প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থাকবে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা প্রণব মুখার্জির স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জি আয়কর সংক্রান্ত স্বেচ্ছাঘোষণার আওতাভুক্ত প্রকল্পের একটি ঘোষণা পত্রে জানান যে, তাঁদের কাছে কর না দেওয়া ১৫ লাখ টাকা রয়েছে। এরপরে অবশ্য শুভ্রা দেবী কর মিটিয়ে দেন। একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পরিচালিকা শুভ্রা বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে মাঝেমাঝেই বিদেশে যান। প্রণব মুখার্জি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর একজন কংগ্রেস সদস্য অভিযোগ করেন যে, শুভ্রা দেবী প্রণববাবুর স্যুইস-ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখাশোনা করতে বিদেশ যান। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনঘন বিদেশ যাওয়ার ফলে কাজটা খুব সহজসাধ্য হয়।

জনতা আমলে যুদ্ধবিমান 'জাগুয়ার' কেনার ব্যাপারেও একটা হইচই উঠেছিল। বিভিন্ন ধরনের ফাইটার বিমানের প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তিরা প্রভাবশালী লবিকে খোসামোদ করার জন্য নানা দেশ থেকে উড়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, সুইডিশ উইগেন এয়ারক্র্যাফটের কর্তাব্যক্তিরাও বাদ যান নি। সে সময়ে জগজীবন রামের ছেলে সুরেশ রামের। মার্সেডিজ গাড়ি নিয়ে ও দারুণ বিতর্ক চলে। এমন কি জনতা আমলের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও বিতর্ক থেকে বাদ যান নি। দেশাইজীর ছেলে কান্তি দেশাই যখন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলেন, তখন খোদ জনতা পার্টির লোকেরাও প্রশ্ন তোলেন। কান্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও অস্ত্রনির্মাণকারী সংস্থার মালিকেরা তাঁকে নানাভাবে টোপ দিয়েছিল। এবং কান্তি সে টোপ গিলেও ছিলেন।

অস্ত্র কেনার বিষয়টি ভারতের আভ্যন্তরীণ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সেটা লোকসভায় কখনো তোলা হয় না। এমনকি সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে হিসেব নিকেশও চলে না। ফলে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা ইচ্ছে করলে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগ পান। সেইসব কোটি কোটি বে-আইনি টাকা জমা হয় বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে, ওই অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা অধিকাংশই ভারতীয় ব্যবসায়ী। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও সত্যি যে সুইস ব্যাঙ্কে যাঁরা টাকা রাখছেন তাদের অনেকেই এইসব রাজনৈতিক নেতা, ক্ষমতাবাজ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও আমলা বর্গ।

সম্প্রতি একটি ইওরোপীয় দেশের সঙ্গে ২,০০০ কোটি টাকার অস্ত্র সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কেনা-নিয়ে লেনদেন হয়, এই লেনদেনে যারা জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিষয়েও নানা কথা উঠতে থাকে। ফ্রান্স নাকি কম দামে ভালো অস্ত্র সরবরাহ করতে চেয়েছিল। বর্তমানে ওই একই রকম উন্নত মানের অস্ত্র আমেরিকা পাকিস্তানকে বিক্রি করেছে। সম্ভবতঃ কোন বড়সড় রাজনৈতিক চাপই ফ্রান্সের প্রস্তাবকে নাকচ করে। আবার এয়ারবাস কেনার সময় একজন দালালকে বলা হয় যে, তাঁর কমিশন ও বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা টাকার ভাগ দিতে হবে নচেৎ এই লেনদেন মঞ্জুর করা হবে না। ঘটনাটি সত্যি কি মিথ্যে এ ব্যাপারে অবশ্য কেউই নিশ্চিত নন। তবে এটা ঠিক যে, সে সময়কার এক কেন্দ্রীয়-মন্ত্রীর পুত্রকে একজন আন্তর্জাতিক দালাল বেশ কিছু মোটা টাকা দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

অবশ্য এই বে-আইনি কার্যকলাপ রোধ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়, কারণ এই ধরনের লেনদেন দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বেশ গোপনতার সঙ্গেই করা হয়। ফলে এসব ব্যাপার বাইরে ছড়াতে পারে না। তবে এ রকম ঘটনাগুলি রোধ করার জন্য প্রথমেই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের প্রতি কড়া নজর রাখা দরকার। তবে শুধু ব্যবসায়ীদের টার্গেট করলেই চলবে না, সেই-সঙ্গে বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের দিকেও নজর দিতে হবে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে লেনদেনের সময়ে টেবিলের তলায় টাকা দেওয়া-নেওয়ার থোক টাকাই নাকি বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। আবার সরকারি স্তরেও এরকম ঘটনা ঘটে। এ ধরনের কাজ আমলারাও করে থাকেন, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন রাজনীতিকরাই। তবে যত বড়ই রাজনীতিক হোন না কেন, কেউই তো আর আইনের বাইরে নন। প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর সম্বন্ধেও কথা উঠেছিল।

সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর গুজব ছড়ায় যে, তাঁর এক আত্মীয়া জার্মানীর সঙ্গে সাবমেরিন কেনাবেচায় মধ্যস্থতা করে প্রায় ১ লাখ টাকা পেয়েছিলেন। মহিলাটি সঞ্জয়ের বিমান-দুর্ঘটনার সময় বিদেশে ছিলেন। সেই সঙ্গে কথা ওঠে যে, পার্টি ফাণ্ডে টাকা রাখার পরেও ওই মহিলা আত্মীয়াটি নিজের নামে অগাধ টাকা বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। এই ব্যাপারটি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জানার পরে যথেষ্ট বিব্রত হন। সঞ্জয়ের ব্যবসায়ী বন্ধুদের বাড়িতে আয়কর বিভাগের মাঝে হানা দেবার খবর একসময় পাওয়া গিয়েছিল। এটা সঞ্জয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই ঘটে। নাইজেরিয়ার একটি কোম্পানীর সঙ্গে ভারত সরকারের ১০০ কোটি টাকার চুক্তি ব্যর্থ হবার জন্যই নাকি সেই সময় কমলাপতি ত্রিপাঠীকে মন্ত্রীত্ব
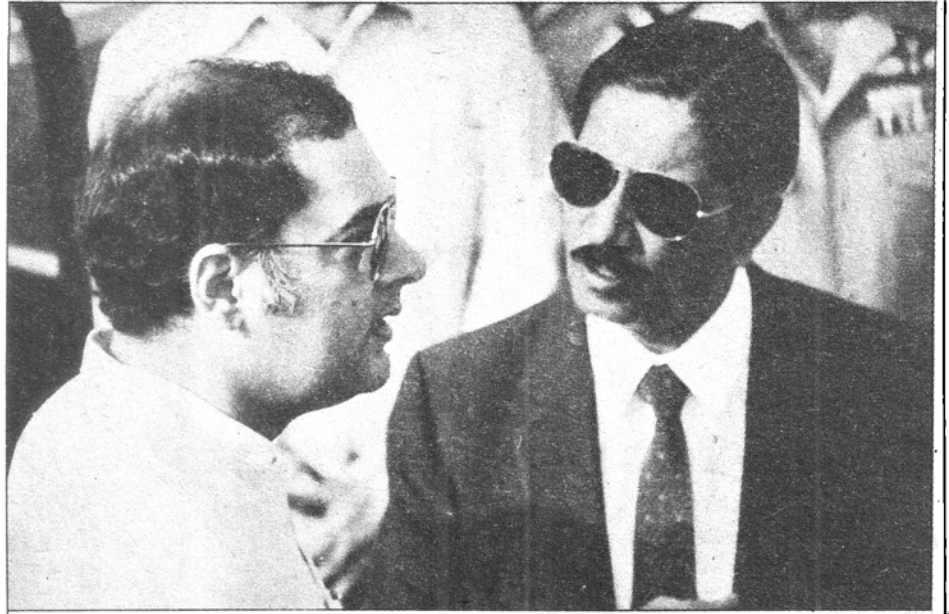
রাজীব গান্ধী কি সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় সঞ্চয় নিয়ে চিন্তিত?

থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই বহিষ্কার মূলতঃ সঞ্জয়ের মনোবাঞ্ছা পূরণ না হবার জন্য ঘটেছিল বলে কারো কারো অনুমান। তবে রাজীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগগুলি ফিকে হয়ে আসছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আই.এম.এফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, গোটা মন্ত্রীমহলেও-এর প্রভাব পড়ল গভীরভাবে।

তিনটি বৃহৎ শিল্প সংস্থার পদস্থ অফিসারেরা তাদের চেয়ারম্যানদের অর্থমন্ত্রীর এই নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান।

অর্থমন্ত্রী কালো টাকা বিদেশে গচ্ছিতকারী ব্যক্তি বা সংস্থাগুলিকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে বর্ণনা করেন।

বিদেশী ব্যাঙ্কের জমান ২৫,০০০ কোটি টাকা থেকে ৩০,০০০ কোটি টাকার মালিকদের সম্পর্কে আই এম এফ অভিযোগ করে যে, এই সব ব্যবসায়ীরা বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে যোগ-সাজশে নকল চালান ব্যবহার করে নিজের দেশীয় সরকারকে প্রতারণা করছে। কোটি কোটি টাকা ঝুঁটো ব্যবসায় লেনদেন হচ্ছে। আর সেসব টাকা জমা পড়ছে বিদেশী ব্যাঙ্কে। এই ব্যাপারে শুরু থেকেই ব্যবসায়ী-আমলা-রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত চক্র খুবই কার্যকর।

প্রাক্তন এক বাণিজ্যমন্ত্রীর বিশেষ আস্থাভাজন অনাবাসী ভারতীয় অফিসারের বিরুদ্ধে এক সময় অভিযোগ ওঠে, তিনি ৭৫ লাখ টাকা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অফিসার বিষয়টি তদন্ত করতে নামেন। তদন্ত শুরু হয় একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিটি লেখেন ওই অফিসার লণ্ডনে বসবাসকারিণী এক মহিলাকে। তাতে তিনি ওই মহিলাকে তাঁর ৭৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক সুইস ব্যাঙ্ক থেকে লণ্ডনের বার্‌কলেস ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওই চিঠিটির জেরক্স কপি ভারতের এক নামী ইংরেজি খবরের কাগজের হাতে চলে আসে। কোনও কারণে চিঠিটি আর প্রকাশ করা হয়নি। যখন লারকিনস-গুপ্তচর সংক্রান্ত ঘটনায় যশপাল গিল গ্রেফতার হন তখন তার বিরুদ্ধে বেশ বড় রকমের অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বেশ মোটা। ধরনের টাকা পয়সা পেতেন। সুইজারল্যাণ্ডের একটি সংস্থা এবং স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মধ্যে চিনি কেনা-বেচার কেলেঙ্কারির এই ঘটনা আরও অনেক কিছু ফাঁস করে দিল।

চিনি কেনাবেচার মধ্যস্থতায় ছিলেন সুইস-সংস্থা নোগার ইহুদি মালিক। তাঁর মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে ৭৫,০০০ মেট্রিক টন চিনি রপ্তানি করা হবে। সেই সঙ্গে তার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিও দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত সুইস সংস্থা নোগা তার কথা রাখতে পারেনি। ফলে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন নোগার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত করে। এর ঠিক অব্যবহিত পরেই নাকি নোগা সংস্থা টেলেক্স পাঠিয়ে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে সাড়ে চার মিলিয়ন ডলার (৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা) ফেরত দিতে বলেন। কিন্তু চেয়ারম্যান নাকি টেলেক্সটি নষ্ট করে ফেলেন। তবে সি বি আই অফিসাররা যশপাল গিলের সুন্দর নগরের বাড়িতে যখন হানা দেন, তখন ওই টেলেক্সটির একটি জেরক্স কপি সেখানে পাওয়া যায়।

সুইস সংস্থা নোগা কিন্তু ছেড়ে কথা বলেনি। তারা জুরিখ কোর্টে স্বরাজ পাল, মেসার্স প্রেণাল হ্যাণডেলসনসপালত ও আরেকজনের নামে মামলা দায়ের করে। তৃতীয় জনের নাম অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রেণাল নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে অভিযোগ আছে যে,এরা দুনিয়ার ভি আই পি-দের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত গোপন লেনদেন করে থাকে।
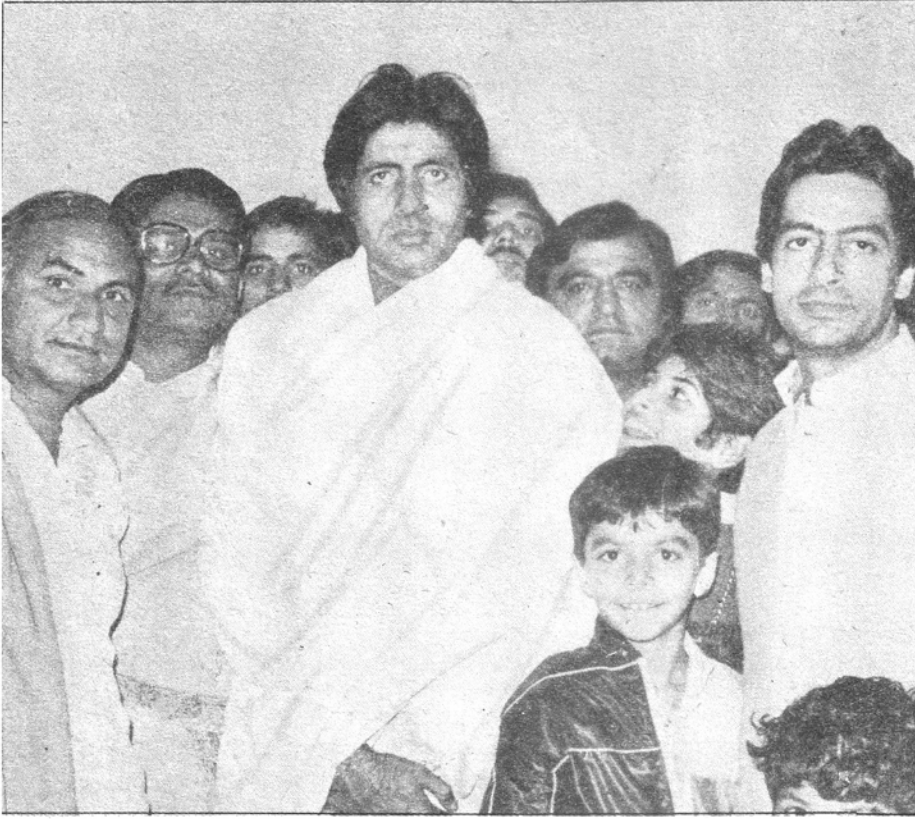
অমিতাভ বচ্চন, সঙ্গে ভাই অজিতাভ, স্যুইসব্যাঙ্কে গোপন সম্পদ ?

জনতা আমলে মোরারজি দেশাই সরকার এইসব বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ৩০ লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। বিষয়টির ভার ছিল এন.কে.সিং.-এর হাতে। এই সিং সাহেবের নেতৃত্বেই একটি দল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তবে ওই তদন্তের ফলে কোন সুরাহা ঘটেনি। ১৯৮১ সালে অবশ্য দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা দেখা দেয়। তবে ভি আই পি-দের সম্মান যেখানে জড়িত সেখানে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে সত্য আবিষ্কার করা খুবই কঠিন।

পরবর্তী পর্যায়ে চরত রামের বাড়িতে হানা দিলে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রমাণ যোগাড় করেন সি বি আই অফিসাররা। ঠিক একই রকম ভাবে ইরানের শাহ সরকারকে কার্পেট রপ্তানি করার সময় হিন্দুজারা সন্দেহের শিকার হন। বিশ্বস্ত সূত্র মোতাবেক, যে সমস্ত শিল্পসংস্থার বিদেশে ব্যবসা আছে কিংবা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে তারা মিলিত ভাবে ব্যবসা করছেন তারা বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমাবার সুযোগ পান। সেইসঙ্গে যাদের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা আছে তাদের পক্ষেও ব্যাপারটি খুবই সুবিধাজনক। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বিদেশে বেড়াতে গেলে বিদেশী মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কারচুপি লেগেই থাকে।

সাম্প্রতিক কালে এই ধরনের চক্রের বাইরেও বে-আইনি বিদেশী মুদ্রার কারবার চলছে। কেউ বড় সড় চোরাচালান করে, কেউ বা ওষুধ বা নেশাদ্রব্যের জালিয়াতি করে কোটি কোটি টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে জমাচ্ছে। এছাড়া জাল-ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে দেশের কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে বাইরে। হীরের লেনদেনও এর একটা বড় ধরনের সোর্স। গতবছর অর্থমন্ত্রীর লোকজনেরা যে তিনজন ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া ব্যবসায়ীকে ধরেছিলেন, তারা ছিলেন হীরের ডিলার। তাদের দৈনিক লেনদেন ছিল কম বেশি চার কোটি টাকা। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর এই কড়া মনোভাবে বহু কালো টাকার মালিক অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। এমন কি খোদ কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর ওপর চটে গিয়েছিলেন।

অনাবাসী শিল্পপতি স্বরাজ পাল সম্পর্কেও ইদানিং কংগ্রেস মহলে ক্ষোভের শেষ নেই। একসময় তিনি কংগ্রেসের তহবিল দেখাশোনা করতেন। তহবিলে জমা অর্থের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন রাজীব ক্ষমতায় আসেন তখন স্বরাজ পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তিনি প্রণব মুখার্জি এবং আর.কে ধাওয়ানের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছেন। এই কারণে রাজীব ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। এরপরে যখন স্বরাজ পাল, ভরতরাম ও এইচ পি নন্দার মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কিত মনোমালিন্য শুরু হয় তখন স্পষ্টতঃই কংগ্রেস দল দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, প্রণব মুখার্জি ও ধাওয়ানকে সাহায্য করার জন্য তিনি ভারতে ১৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এই টাকার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-আই-এর মধ্যেই বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়।

স্যুইসব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ভারতীয় বেআইনি টাকা রাখার বিষয়টি এখন যথেষ্ট কৌতূহলকর পর্যায়ে রয়েছে। অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নিয়োজিত তদন্তকারী দল ভারতীয় রাজনৈতিক ভি.আই.পি দের সম্পর্কে কি তথ্য আবিষ্কার করে, সেটা জানার জন্য গোটা ভারতবর্ষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে। তবে স্যুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম জানা খুবই দূরূহ। বিশেষ করে যদি কোন নামী ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থাকে, তবে তো কথাই নেই। এখনো পর্যন্ত নোগা সংস্থার মামলায় তৃতীয় ব্যক্তির নাম জানা সম্ভব হয়নি। তবে এ ব্যাপারে আমেরিকান সরকারই কার্যত সফল। তারা চাপ দিয়ে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম জেনে নিয়েছেন।

তবে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে স্যুইস ব্যাঙ্কের খ্যাতি সর্বজন বিদিত। এইসব ব্যাঙ্কগুলি এ ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কোন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের অ্যাকাউন্ট নম্বরের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। তবে এত গোপনীয়তার আঁটুনি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আই. এম. এফ. ভারতীয় অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য বের করতে পেরেছে।

স্যুইস ব্যাঙ্কে যারা কাজ করেন তাদের প্রতি নির্দেশই আছে যে তাঁরা ব্যাঙ্কের লেনদেন বিষয়ে যে সমস্ত কাজ করবেন তা কখনো বাইরে প্রকাশ করতে পারবেন না। ঠিক একই নিয়ম চালু আছে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ক্ষেত্রেও। তাঁরা যদি অস্থায়ীভাবে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হ'ন তাহলেও তাঁরা কখনো কিছু প্রকাশ করতে পারবেন না। পুরনো বা স্থায়ী অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বেলায়ও তাই। তারা স্যুইস কিংবা অন্য দেশের হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। মোদ্দা কথা, স্যুইস ব্যাঙ্কে যারাই আসুন না কেন, সবাইকেই এই গোপনীয়তা মানতেই হবে। প্রতিটি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এই গোপনীয়তা চিরকালই মেনে আসছেন। স্যুইস ব্যাঙ্কে অনেক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারই গোপনে অ্যাকাউন্ট রাখেন। তাঁকে হয়তো অনেক কর্মী চেনেন না। শুধু ব্যাঙ্কের কতিপয় উচ্চ পদস্থ কর্মীর কাছে তাদের নামধাম গোপনীয়তা ও সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত থাকে। অধিকাংশ কর্মী শুধু তাদের নম্বরটিই চেনে। বলা বাহুল্য, স্যুইস ব্যাঙ্ক এই ধরনের অপরিচিত ব্যক্তিদের ঝুঁকি বরাবরই বহন করে আসছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের এই কুলীশকঠোর গোপনীয়তা অবশ্য কিছু নতুন নয়। তবে স্যুইস ব্যাঙ্কের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ ব্যাপারে তাদের আইনও অন্যরকম। তাদের এই আইন, অপরাধ আইনের পর্যায়ভুক্ত। যদি কোন ব্যাঙ্কের মালিক তাদের নাম ফাঁস করে তাহলে তাঁকে ৫০,০০০ স্যুইস ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২ লাখ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অনাদায়ে ছ'মাসের সশ্রম

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি : বিতর্কিত ভূমিকা !

অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি : স্বরাজ পাল

কারাদণ্ড। ১৯৩৪ সাল থেকে এই আইন চলে আসছে।

সুইস ব্যাঙ্কের গোপনীয়তা কিন্তু সব সময় এর জন্য অবিকৃত থাকে নি। কয়েক বছর আগে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সুইস আইনসভায় ভোটাভুটিতে আইনটির পরিমার্জনা হয়। যদি কোন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার কোন অপরাধ করে ফেলে তবে সুইস ব্যাঙ্ক সেই ঘটনায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। অবশ্য এই আইনের জন্য সুইস ব্যাঙ্কের গোপনীয়তার সেই ঐতিহ্য কিন্তু নষ্ট হয়নি। কারণ কর ফাঁকি দেওয়া উপরোক্ত অপরাধ আইনের পর্যায়ে পড়ে না। ফলতঃ সে ব্যাপারে সুইস ব্যাঙ্ক কোন অবস্থাতেই কারো কাছে তাদের সম্পর্কে তথ্য জানাতে বাধ্য নয়।

এ ব্যাপারে আমেরিকা সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। ফিলিপাইনসের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মার্কোসের জমানো টাকা আটকে দেবার বিষয়ে সুইস ব্যাঙ্ক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমেরিকার চাপে তা প্রত্যাহার করতে হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কত মূলধন সুইস ব্যাঙ্কে আছে, তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। সুইস ব্যাঙ্কে মোট ১৭০,০০০ কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত জমা রয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রের খবর।

ভারতীয় সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থমন্ত্রীর এই অভিযান নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তবে তিনি সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের জমা টাকা এদেশে আনতে পারবেন কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারটিও সন্দেহান্বিত যে, তাঁর এই উদ্যোগ দেখে ভারতের শিল্পপতিরা তাদের টাকা আগামী দিনে ভারতের ব্যাঙ্কগুলিতে রাখার কথা ভাববেন। সেইসঙ্গে ভারতে অবাধ বাণিজ্যের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিতে চলেছেন তারও প্রসার ঘটবে।

Handelsgericht des Kantons Zürich

Oberrichter Dr. Bachmann, Präsident, ...

Verfügung vom 11. Oktober 1978

In Sachen

Compagnie ... d'Importation et d'Exportation SA, 1200 ...

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. H. Niederer,

...strasse 31, 8001 Zürich,

... 35 Portman Square, London ...

(England),

... Handelsanstalt, 9490 Vaduz FL,

...

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gerd Lanz,

...strasse 8008 Zürich,

betreffend Garantievertrag evtl. unerlaubte Handlung oder ungerechtfertigte Bereicherung

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Am 27. Dezember 1977 ging gegen die ... ten und einen Mitbeteiligten ...

Rechtsbegehren:

... Beklagten zu verpflichten, der Klägerin zu bezahlen:

Hauptantrag:

ব্যাঙ্কের একটি গোপন নথি

রাজনৈতিক নেতা-শিল্পপতিদের গোপন বোঝাপড়ার বিষয়টি কিন্তু একটি দেশের পক্ষে পরিণতির দিক থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ। যদি এই দুই শ্রেণীর গোপন সম্পর্কের বিষয়টি অর্থমন্ত্রী অনুসন্ধান করে জোরদার পদক্ষেপ নেন তাহলে হয়তো ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো জোরদার হতে পারে। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং যে ইতিমধ্যেই আই.এম.এফ. এবং 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টারিফ এ্যান্ড ট্রেড' (গ্যাট) এর লবির কাছে অপ্রিয়ভাজন—এটা এখন আর লুকোছাপা নেই। তবে যদি শ্রী সিং তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেন তবে হয়তো আয়কর ফাঁকি দেওয়া ভি আই পি দের আরাম ঘুম কিছুক্ষণের জন্য টুটে যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের একটা লড়াইয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং যদি সত্যিই নামতে চান তবে তাঁকে বেশ কঠিন পথ পেরোতে হবে। নানা প্রতিবন্ধকতা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তার নির্দেশিত 'দেশবিরোধী'-দের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদের ফলে কেঁচো খুঁড়তে প্রবলতম সাপেরা বেরিয়ে আসবেই। তাঁকে এ কারণে অনেক মূল্য হয়ত দিতে হবে। কিন্তু লড়াই জিতলে বহু নামী দামীদের মুখোশ খুলে আসল মুখটি বেরিয়ে আসবে। আর সাধারণ ভারতবাসীদের কাছে তিনি হবেন জনপ্রিয়তম অর্থমন্ত্রী। এটা সবদিক থেকে বিশ্বনাথের রিস্ক গেম। তিরিশ হাজার কোটি টাকার বিরুদ্ধে লড়াই, মুখের কথা কি ?

ছবি : রাজীব চাওলা

বৃদ্ধোঅপি তরুণায়তে

বৃদ্ধরাও তরুণ হয়। ব্যর্থ পৌরুষের অপমানে পুরুষ যখন হতাশ, শিথিলতার আক্রমণে পৌরুষ যখন পরাজিত, তখন হতাশা এবং শারীরিক অক্ষমতা, টেনশন-ক্লিষ্ট আজকের পুরুষদের আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান আশার বাণী শোনাতে পারে। বিখ্যাত চিকিৎসক কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত জানিয়েছেন সেই নবযৌবনদায়ী জীবনলাভের কলাকৌশল।

বছর তিনেক আগের কথা। শীতকাল। ডিসেম্বরের মিঠে রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। সকাল প্রায় দশটা। কিছুক্ষণ আগে হাতিবাগানে নিজের চেম্বারে এসে বসেছি। তখনো কোন রোগী নেই। একটি আয়ুর্বেদিক বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিলাম, এমন সময় আমার চেম্বারের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, মেরুন রঙের একটি চকচকে অ্যামবাস্যাডার মুখ তুলে চাইতেই দেখলাম, খাটো চেহারার এক ভদ্রলোক নেমে আসছেন গাড়ি থেকে। বেশ বলিষ্ঠ গড়নের শরীর। পরনে পাটভাঙা ধবধবে হাফ শার্ট। ট্রাউজারও একই রকম। বয়স আনুমানিক পঞ্চাশের নিচে।

ভদ্রলোক সরাসরি আমার চেম্বারেই উঠে এলেন। পরিচয়ে জানা গেল, তিনি একটি বড় কোম্পানির উঁচুদরের একজিকিউটিভ। কিন্তু ভদ্রলোক আমার হাত জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদে ফেললেন। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। স্ত্রী এখনো ভরা যুবতী। কিন্তু স্ত্রী তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মশাই, লোকের সামনে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠেছে। কেন-জানেন?'

যৌবন বলছে, 'যাই যাই...' প্রৌঢ়ত্ব দূর থেকে বলছে, 'আমি আসছি।' 'আমি আসছি।' এরই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চিরকালের দিশাহারা মানুষ বলছে—

'ভিষক। অতঃ কিম? ক দিশন্ত সরণিং ত্বয়া বিনা' (ভিষক। এখন কি হবে? তুমি ছাড়া কে পথ দেখাবে? এখনও আমি ভোগতৃপ্ত নই। আরও ভোগ, আরও বাসনা আমায় ব্যাকুল করছে।)

দীর্ঘ জীবন আর যৌবন নিয়ে সুস্থ হয়ে চিরকাল মানুষ বেঁচে থাকতে চেয়েছে—চাইছে—ভবিষ্যতেও চাইবে। তাই আদিকালের সেই গহন অরণ্যের মধ্যে থেকেও মানুষ চেয়েছে 'জরা' কে রুখবার সঞ্জীবনী ভেষজ। সেই অতৃপ্ত চাওয়া আজও শেষ হয়নি—পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্যাসোলিগেচার আর রিজুভিনেশন—এর পরশ পাথরের জন্য বৈজ্ঞানিকের দল হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে।

আয়ুর্বেদের রসায়ন কিন্তু কেমিস্ট্রির রসায়ন নয়। আয়ুর্বেদে জরানাশক, বয়ঃস্থাপক ও বাজীকরণের যে বিচিত্র পথ তাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন, সেই পথেরই অন্বেষণে এই লেখা। আর সে পথেই একজন বৃদ্ধও যৌবন ফিরে পায়।

চরক বললেন ভেষজ দু'রকমের। এক রকম হলো যেটা সুস্থ মানুষের বল—পুষ্টির দিকে নজর দেয়, আর একরকম হলো যেটা রোগীর অসুখ সারিয়ে তোলে। এই বলপুষ্টির দিকে নজর দেওয়া ভেষজ আবার দু'রকমের। একটা হলো রসায়ন, আর একটা হলো বৃষ্য বা বাজীকরণ। রসায়নের মাধ্যমে মানুষ পাবে দীর্ঘ আয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তারুণ্য, প্রভা, বর্ণ স্বরের পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের বল, বাকসিদ্ধি নম্রতা আর কান্তি। আর বাজীকরণের মধ্যে সে পাবে শুক্রের বৃদ্ধি, মনের উল্লাস—এক কথায় 'যৌবন মদে মত্তা' তুখোড় যুবাশক্তি। এমন কি জরাগ্রস্ত অবস্থাতেও যৌবনের মদিরতায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে—জীবনকে উপভোগ করতে পারবে।

কেতকীর গন্ধবিহ্বল মধু মাসের পূর্ণিমা রাত্রি। মধুর নূপুর বেজে উঠছে প্রতি পদক্ষেপে। যৌবন মদে মদির শর্য্যাতি-তনয়া সুকন্যার রাজপ্রাসাদ ভাল লাগছে না। সঙ্গী মৈরেয়ী ও মন্দাক্রান্তার সঙ্গে তাই তিনি বেরিয়েছেন রাজনন্দিনীর মিলন তৃষিতের আকাঙ্খা নিয়ে।

দূরে শিপ্রা নদীর তটপ্রান্তে এক ঋষির পল্লব গৃহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পর্ণকুটিরের পাশেই চম্পক বৃক্ষ লতারই পাদমূলে এক বল্মীক স্তূপ। চম্পক চুম্বিত শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে ওই বল্মীক স্তূপের উপর। রাজবালা এগিয়ে যান ওই দিকে। একটা মাদকতা, একটা শিহরণ সারা শরীরে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। ঐ স্তূপের ভিতর দুটি পদ্মরাগ মণি জ্বলে ওঠে। কি ওটা? নিজ কবরী থেকে তিনি তুলে নেন স্বর্ণমঞ্জিরা। বিদ্ধ করেন ওই পদ্মরাগ মণি।

'উঃ হা হতোস্মি'। এক বুকফাটা আর্তনাদ ঐ আরণ্যক অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে যেন ঝংকৃত করে তোলে। বল্মীক স্তূপ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। বেরিয়ে আসেন এক তপঃক্লিষ্ট যন্ত্রণাকাতর জরাজীর্ণ—শ্বেতশুভ্র শুশ্রুময় ঋষি চ্যবন। মৈরেয়ী ক্রন্দন করে ওঠে। 'এ কি করলে বালা'। বন্য বেতসের মত কাঁপতে থাকেন সুকন্যা। যন্ত্রণাকাতর ঋষি অভিশাপ দেন সুকন্যার পিতা শর্য্যাতিকে—'প্রজাকুল ব্যাধিক্লিষ্ট হয়ে উঠবে।' শর্য্যাতি জানতে পারেন সেই অভিশাপ। ঋষির পদপ্রান্তে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকেন।

যৌবনমদে মদির পীনোন্নত পয়োধর উর্বশী নিন্দিত রক্তিম কম্রতনুর দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকেন চ্যবন। সুকন্যার পাণি—গ্রহণ করতে চান ঋষি। শর্য্যাতির শ্বাস প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আসে। হায় ভগবান, এ যে বৃদ্ধ।

উদ্ভিন্ন যৌবনা তন্বী কন্যা সুকন্যার সাথে বিবাহ দিতে হবে বৃদ্ধ, জরাক্লিষ্ট চ্যবনের। সমগ্র দেহে কালনাগিনীর স্পর্শ অনুভব করেন শর্য্যাতি। এক অতলান্তিক অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যান যেন। জ্ঞান ফিরে এলে পিতৃসোহাগিনী সুকন্যা পিতাকে রাজি করান এই বিবাহে।

সুকন্যা জানেন—কোন না কোন প্রারব্ধের জন্যই যৌবন মদে মদির জীবনটা ব্যর্থ হল। নিরুত্তাপ, নিশ্চুপ,জরাজীর্ণ চ্যবনের বুকে শার্তনরী দিয়ে আঘাত করেন। চুম্বনে চুম্বনে বিহ্বল করে তোলেন ঋষি চ্যবনকে। কোন সাড়া নেই। হিমশীতল স্তব্ধতা। প্রাণহীন শবদেহ যেন। মিলন রাত্রির ব্যর্থতায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন সুকন্যা। যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠে যৌবন।

শর্য্যাতির আহ্বানে ঋষি দর্শনে আসেন অশ্বিনীদ্বয়। সুকন্যার তৃষ্ণার্ত তন্বী যৌবনের দিকে চেয়ে থাকেন তাঁরা। নিভৃত, বিশ্রব্ধ, মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে আকর্ষিত হন। বিবাহের প্রস্তাব দেন তাঁরা। প্রত্যাখ্যান করেন সুকন্যা।

পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাম—ছিঃ ছিঃ কানে ও শব্দ যেন না যায়। হোক জরাগ্রস্ত— হোক সে বৃদ্ধ-তবুও তিনি স্বামী—অগ্নিসাক্ষী করেই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—

'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব'

সন্তুষ্ট হন অশ্বিনীকুমার। চিকিৎসার সহায়তায় হৃতযৌবন চ্যবনের যৌবন ফিরিয়ে আনেন। সুকন্যার অতৃপ্ত যৌবন তৃপ্ত হয়।

ইতিহাস বলে, 'চ্যবনোহভুৎ পূর্ণযুবা' অর্থাৎ চ্যবন পূর্ণ যৌবন ফিরে পেয়েছিলেন। ওপরের কাহিনী আমরা পাই ঋকবেদে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' মহাভারতেও এর স্বীকৃতি মেলে।

এই জরা থেকে মুক্তির পথের সন্ধানই হল 'রসায়নে'র সাধনা। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে এই 'রসায়ন ব্যাপারটা কিন্তু সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। যেমন গরীব, অতিরিক্ত ভোগী, পাপী, এবং ঔষধ অপব্যবহারকারী। কারণ এদের অজ্ঞানতা, লোভ, অস্থিরচিত্ততা, দারিদ্র, অনায়ত্ততা, অধার্মিকতা ও

(৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাইরের মদতে উত্তরবঙ্গ এখন গৃহযুদ্ধের মুখে

সশস্ত্র গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে উৎসাহিত উত্তরখণ্ডী যুবনেতা গোকুল রায় রক্তাক্ত সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন, প্রবীণরাও বসে নেই। রঙ বদলেছে পতাকার। কেন আসামের মন্ত্রী কোচবিহার সফর করেন? উত্তরখণ্ডীদের সম্মেলনে লালডেঙা আসছেন? আসামের মুখ্যমন্ত্রী কেন উত্তরখণ্ডীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন? কাদের মদতে বাঙালির বিরুদ্ধে আর এক চক্রান্ত? সি.পি.এম. কি এদের রুখতে ক্যাডার নামিয়েছে? অশান্ত উত্তরবঙ্গের অশান্তির কারণ খুঁজে এনেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি।

১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে ৬টা। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ধানক্ষেত আর বাঁশঝাড়ে ঘেরা ভাঙারহাট গ্রাম। সেখানকার একমাত্র বর্ধিষ্ণু পরিবার মল্লিকদের টিনের চালাঘরে পাঁচশতাধিক মানুষের এক উত্তেজিত বৈঠক। অদূরে এই বাড়ি-মালিকের পঞ্চম শরীক পঞ্চানন মল্লিকের কাঠের বাড়িতে উত্তরখণ্ডী দলের সদর কার্যালয়। তবু সামনেকার মিটিং-এ পঞ্চানন মল্লিক নেই। সেই উত্তেজিত বৈঠকে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের জংগী

৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

হোপ '৮৬

রেখা

প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

ছিয়াশির শেষ লগ্নে কলকাতার বুকে নেমে এল আরব্য রজনীর এক রাত–হোপ '৮৬-এর রাত। বম্বের তারকাপুঞ্জের আলোয় উদ্ভাসিত হল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। বামফ্রন্টের ছত্রছায়ায়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর তত্ত্বাবধানে সমবেত ৭৫,০০০ পিপাসার্ত হৃদয়কে উদ্দাম, উদ্বেল, আবেশ-বিহ্বল করে গেল বম্বের তারকাকুল। কখনও কিন্নরকণ্ঠী লতা, সদাকিশোর কিশোর, মোহময়ী আশা, সুরদেব রাহুল দেবের গান। আবার কখনো চিরতরুণী রেখা,

অনুষ্ঠানের দুই উদ্যোক্তা মিঠুন চক্রবর্তী ও শত্রুঘ্ন সিন্‌হা

গান গাইছেন লতা ও কিশোর
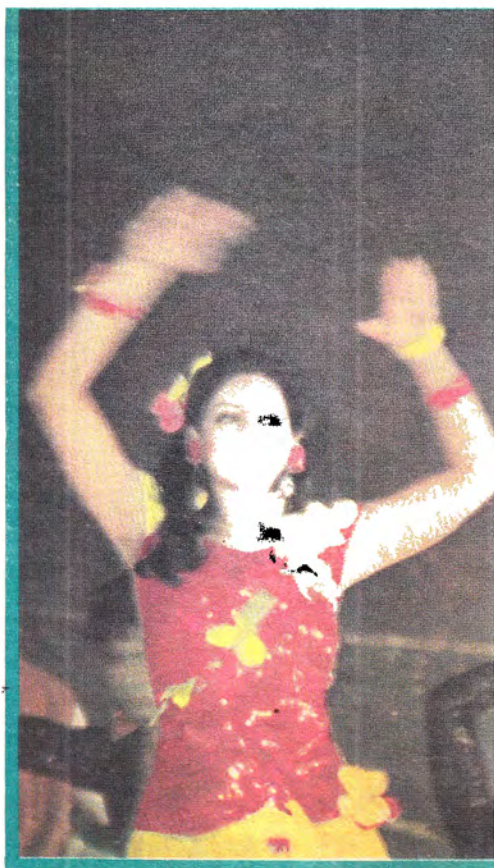
নৃত্যভঙ্গিমায় শ্রীদেবী

আশা ভোঁস্‌লে

লাস্যময়ী প্রথমা শ্রীদেবীর অপ্সরী নৃত্য। রাজেশ, রাজ বব্বর, দিলীপ কুমার, আমজাদ, পদ্মিনী, মীনাক্ষী— একে একে টুপটাপ খসে পড়তে লাগল বম্বের তারকা সাম্রাজ্য। তৎসহ ধুতি-পাঞ্জাবীর খাঁটি বাঙালিবাবু মিঠুনের নাচ ও গান। বাংলার বন্যার্ত, সর্বস্বান্ত মানুষকে করল চমকিত, বাক্‌রহিত ও ধন্য। ধন্য, ধন্য! হে আকাশের তারকাকুল। তোমাদের পদধুলিতে বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল, কৃতার্থ হল।
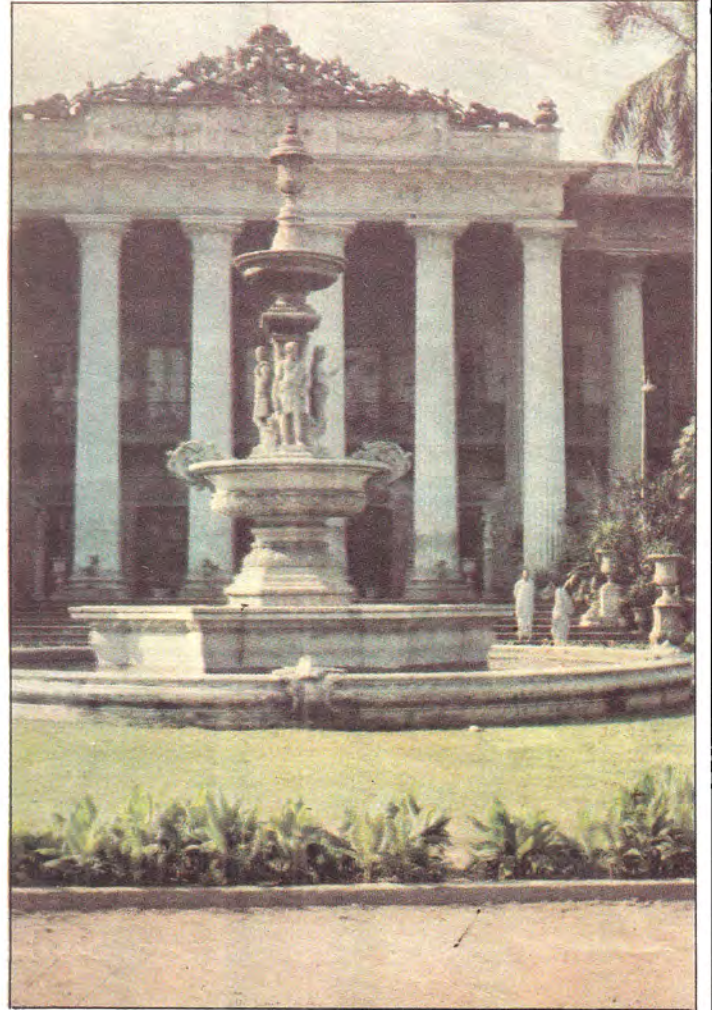
শ্বেতপাথরের দীর্ঘশ্বাস : মল্লিক পরিবার

বাবু কলকাতার সে টমটম নেই, নেই ঝাড়বাতির রঙীন চমক। তবু কলকাতায় শ্বেতপাথরের মার্বেল প্যালেস এখনও মল্লিক-বাবুদের সংস্কৃতির মহাফেজখানা হয়ে বসে আছে। সেই মহাফেজ-খানার আশপাশে এখন-তখনের সময়কে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন রমাপ্রসাদ ঘোষাল। সহায়তা করেছেন বিকাশ চক্রবর্তী।

মহাজাতি সদন ছেড়ে উত্তরদিকে সামান্য এগো-লেই একটি গলি রাস্তা বেরিয়ে গেছে চিত্ত-রঞ্জন অ্যাভেন্যুর পাশ কাটিয়ে। লোকে বলে 'চোরবাগান', কিন্তু আসল নাম মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। পাতাল রেলের খানাখন্দ ভরা বাঁ-দিকের সে পথে নাকে রুমাল দিয়ে হাঁটলেও গা গুলিয়ে ওঠে। দুর্গন্ধ নোংরা জল নর্মদা ছাপিয়ে চলে এসেছে রাস্তায়। তিলোত্তমার গালে দুষ্ট ব্রণের মত সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে কলার খোসা, ছেঁড়া ঠোঙা, ডাবের খোলা, চায়ের ভাঁড়–কী নয়! গরু থেকে কুকুর-বেড়াল সব ইতর প্রাণীরই অবাধ চারণভূমি উত্তর কলকাতার এই টিপিক্যাল রাস্তা।

এই হতশ্রী পরিবেশেই দাঁড়িয়ে আছে সেকালের কলকাতার এক বিশাল ইমারত–'মার্বেল প্যালেস'। ৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে শ্বেত পাথরে মর্মরিত প্রাসাদ এই 'মার্বেল প্যালেস'। লোকে বলে মল্লিক বাড়ি। এ যেন মরুভূমিতে মরুদ্যান–মরুদ্যানের অলকাপুরী।

১৯১০ সালের ২৬ মার্চ শনিবার। লর্ড মিন্টো সপরিবারে এসেছিলেন এই প্রাসাদ দেখতে। তখনও এটি 'মার্বেল প্যালেস' নয়–'মল্লিক বাড়ি'। ইতা-লিয়ান মার্বেলের সুচারু সমাবেশে সেদিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন লর্ড মিন্টো। মন্ত্রমুগ্ধের মতই হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল–'দিস গুড বি কলড্ অ্যাজ মার্বল প্যালেস।' ব্যস, সেই থেকে মল্লিক বাড়ি হয়ে গেল 'মার্বেল প্যালেস'। বিশাল লোহার গেটে প্রাগৈতিহাসিক চেহারার সতর্ক প্রহরী এখনও দাঁড়িয়ে আছে বল্লম উঁচিয়ে। পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলে তবেই এ বাড়ির গেট খোলে। খুলে যায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক নির্মিত এই বিচিত্র মর্মর প্রাসাদের সিংহদুয়ার। ঢুকেই ডান দিকে রাজা বাহাদুরের বিরাট আবক্ষ মূর্তি, ভেতরে আর্ট মিউজিয়াম। একটু পিছনে জগন্নাথ

দেবের ঠাকুর বাড়ি—যাঁর নামের ট্রাস্টে আজও চলে এ বাড়ির সব কিছুই।

১৮৩৫ থেকে ১৮৪০, পাঁচ বছর ধরে চলেছিল মার্বেল প্যালেসের নির্মাণ পর্ব। ছত্রিশ বিঘে জমির ওপর পাঁচশ কর্মীর এক হাজার হাত দিন রাত ব্যস্ত ছিল প্যালেসের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। তখনকার দিনে ইতালিয়ান মার্বেল আসত জাহাজের খোলে ওয়েট দেবার জন্য। তাছাড়া বড় বড় স্ল্যাব, ফিগারস্, পেইনটিং, স্কালপচার প্রভৃতিও আসত বিক্রির উদ্দেশ্যে। চাহিদার তুলনায় আমদানি খুবই কম। তাই রাজা বাহাদুর মাইনে দিয়ে জাহাজ ঘাটে এজেন্ট রেখেছিলেন। কোন জাহাজে মাল এলেই তারা খবর দিত রাজা বাহাদুরের কাছে। তাছাড়া ওয়ারটিয়ো, করিনথিয়ান, আয়োনি, গথিক, ডরিক ইত্যাদি ক্যাটলগ দেখে নিজেও অর্ডার পাঠাতেন বিখ্যাত সব আর্কিটেকচারাল প্যাটার্নের জন্য। এভাবেই ইতালিয়ান মার্বেল, ফিগার, বাতি-ঝাড়, ব্রোঞ্জের মূর্তি, হথন, মান্দারিন, টাং, সুন ইত্যাদির সমাহারে তিলে তিলে সৃষ্টি হয়েছিল প্যালেসের সৌন্দর্য। মোট নব্বই রকমের মার্বেল দিয়ে এই প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু সে তো সাতাত্তর বছর আগেকার কথা। আজ সে রামও নেই, নেই সেই অযোধ্যাপুরী। 'আগে আমাদের পরিবারের ছেলেরা কাজকর্ম খুব একটা করত না। করতে হত না আর কি। কিন্তু দিন বদলেছে, বদল হয়েছে প্রয়োজনের। এখন এই যে মল্লিক এস্টেট দেখাশোনা করি, তার জন্য তো আলাদা কোন পারিশ্রমিক পাই না। তাই সংসার খরচ চালানোর জন্য কিছু না কিছু করতেই হয়। তাই এস্টেটের কাজকর্ম ছাড়াও আমার বাবার কিছু নিজস্ব সম্পত্তির দেখাশোনা করি। আমার এক ছেলের একটা ডেয়ারী ফার্ম আছে, আর অন্যজন তো ডাক্তারি নিয়েই ব্যস্ত।'

মল্লিক পরিবারের আজকের পুরুষ পূর্ণেন্দু মল্লিক এই কথাগুলি বলতে বলতে ভাবালু চোখে এক নিমেষেই যেন অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যান।

'মার্বেল প্যালেস' নামটি যেমন বিদেশী লর্ডের দেওয়া, তেমনি 'রাজা' বা 'মল্লিক' উপাধি দুটিও জন্মগত নয়। 'মল্লিক' এসেছে পারসি 'মালিক' শব্দ থেকে, যার ভাবগত অর্থ ভূস্বামী বা মহদ্বংশজাত। মল্লিকদের আগের পদবি ছিল শীল। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ যাদব শীলকে 'মল্লিক' উপাধি দিয়ে আপ্যায়িত করেন। পরে উপাধিই পদবি হয়ে যায়। তারপর ইংরেজ আমলের খেতাব 'রায় বাহাদুর' এবং 'রাজা'।

মল্লিক থেকে রায় বাহাদুর, রায় বাহাদুর থেকে রাজা—মাঝখানে অনেক ইতিহাস। সে ইতিহাস চাপা পড়ে আছে পুরনো দলিল দস্তাবেজ, বিভিন্ন কাগজপত্রের পাতায়।

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাই 'সুবর্ণ বণিক' আখ্যা পায় ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। মল্লিকরা ছিলেন এই সম্প্রদায়ের নেতা। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে
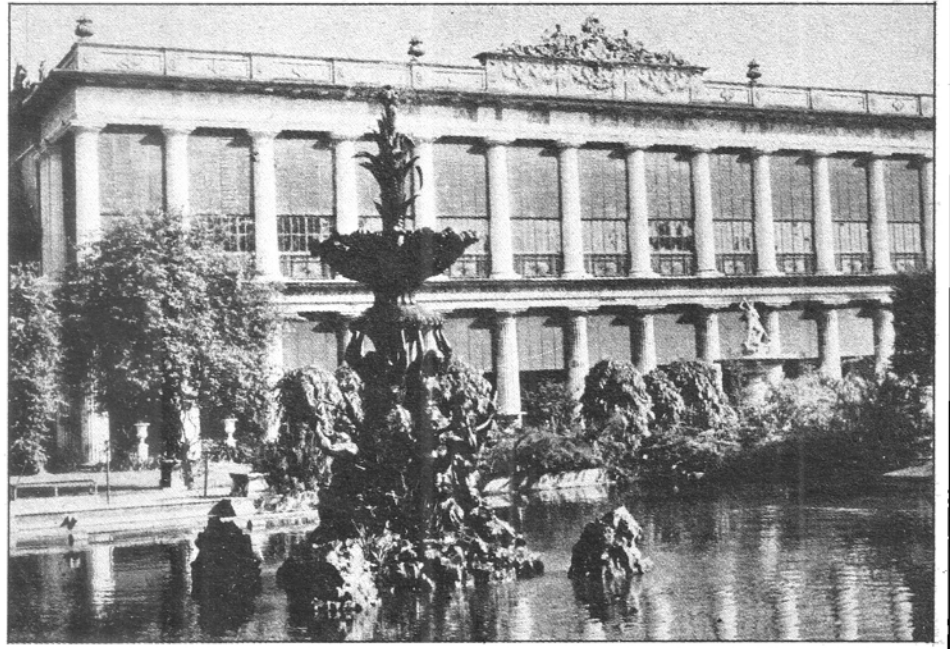
মল্লিক প্যালেস : সৌন্দর্য্যসৌধ

বাংলার সিংহাসনে বসেন বল্লাল সেন। রাজা মানে সমাজের মাথা। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। সুবর্ণ বণিকদের ঐশ্বর্য ছিল রাজার কাছেও ঈর্ষার বিষয়।

বল্লাল সেন একবার ঘোষণা করেন, তিনি মণিপুর জয় করবেন। সে কথা শুনে অমাত্যরা বলল, আগে কয়েকবার পরাজয়ের ধাক্কায় রাজকোষ তো শূন্য হয়ে গেছে। আবার যুদ্ধ বাধালে রাষ্ট্রের হাল একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়বে। তাই যদি অন্য কোনভাবে টাকা যোগাড় করা যায় তাহলে সব দিক থেকেই মঙ্গল। বল্লাল সেন মাথা চুলকে বললেন—'যুদ্ধের খরচ তো বিশাল। এত টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে ?' রাজার কথায় অমাত্যদের পুঞ্জীভূত ঈর্ষা যেন প্রকাশের পথ খুঁজে পেল।

একজন প্রবীণ অমাত্য বললেন, 'মহারাজ, এই মহাভার বহনের ক্ষমতা এ রাজ্যে একজনেরই আছে। তিনি হলেন, সংককোট দুর্গনিবাসী বল্লভানন্দ আঢ্য। তিনি ঋণ দিতে রাজি হলে আর কোন সমস্যাই থাকে না।' বল্লাল সেন একটু চাপা হাসলেন। 'কথাটা খুব মন্দ বলনি হে।'

দূত গেল বল্লভানন্দের কাছে। মহারাজ বল্লাল সেন তাঁর কাছে দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চান। কিন্তু বল্লভানন্দ পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি আগেও একবার এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ দিয়েছিলেন। ফেরত পাননি এখনও। বারবার পরাজয়ের ফলে সবটাই খরচ হয়ে যায়। বল্লভানন্দ এবার সহজে ঋণ দিতে রাজি হলেন না। দূতকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজা যদি হরিকেলীয় পত্তনটি আমার কাছে বন্ধক রাখেন এবং তার সমস্ত রাজস্ব থেকে আমার ঋণ শোধ হবে—এরকম শর্ত করেন, তা হলেই আমি আবার দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ দিতে পারি।'

বল্লভের কথায় বল্লাল অপমানিত বোধ করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'দাম্ভিক সুবর্ণ বণিকদের যদি শূদ্রত্বে পরিণত না করি তো আমার নাম বল্লাল সেনই নয়। আর দুরাত্মা বল্লভানন্দের দণ্ডবিধান না করলে গো, ব্রাহ্মণ হত্যার যে পাপ হয় আমারও সে পাপ হবে।' বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথার মূল্যে নাকি এই ঘটনা।

বল্লাল সেনের নিগ্রহে সুবর্ণ বণিকরা এরপর সত্যি সত্যিই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে শূদ্রভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শুধু আভ্যন্তরীণ আচার অনুষ্টানেই তাঁদের বৈশ্য ভাবটুকু কোনক্রমে বজায় ছিল। তাই বলে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পরই মল্লিকরা সোনার পৈতা পরে বল্লাল সেনকে দেখিয়ে দিলেন হেরে যাবার পাত্র তারা নন।

মল্লিকদের এক পূর্বপুরুষ বসতি গড়েছিলেন সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। কাছেই ছিল ইংরেজ ও পর্তুগিজদের বাণিজ্য কেন্দ্র। নৌকায় পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। কিন্তু নদীর গতি ক্রমশ দিক বদল করায় সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রকেও পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হয় অন্য জায়গায়। মল্লিকদের পূর্ব পুরুষ শীলরা এরপর বসবাস শুরু করেন প্রাচীন বাণিজ্য নগরী সপ্তগ্রামে। সেই পৌরাণিক যুগ থেকেই হুগলীর এই অঞ্চল ছিল বাংলাদেশের অদ্বিতীয় বাণিজ্য কেন্দ্র। সরস্বতী নদীর তীরে অগ্নিধ্র, রমনক, ভপিসন্ত, স্বরবানন, বরা, সবন ও দ্যুতিমন্ত নামে সাতটি গ্রাম নিয়েই সেদিনের এই 'সপ্তগ্রাম' বা 'সাতগাঁ'। পরে সেটি তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বারবার চলেছে ভাঙা গড়ার খেলা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্রোতস্বিনী সরস্বতীও মজে যেতে শুরু করে। ফলে পর্তুগিজ বেনিয়ারা গঙ্গা নদীর অববাহিকায় নতুন-

পরিবারের সংগ্রহে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ভাস্কর্য
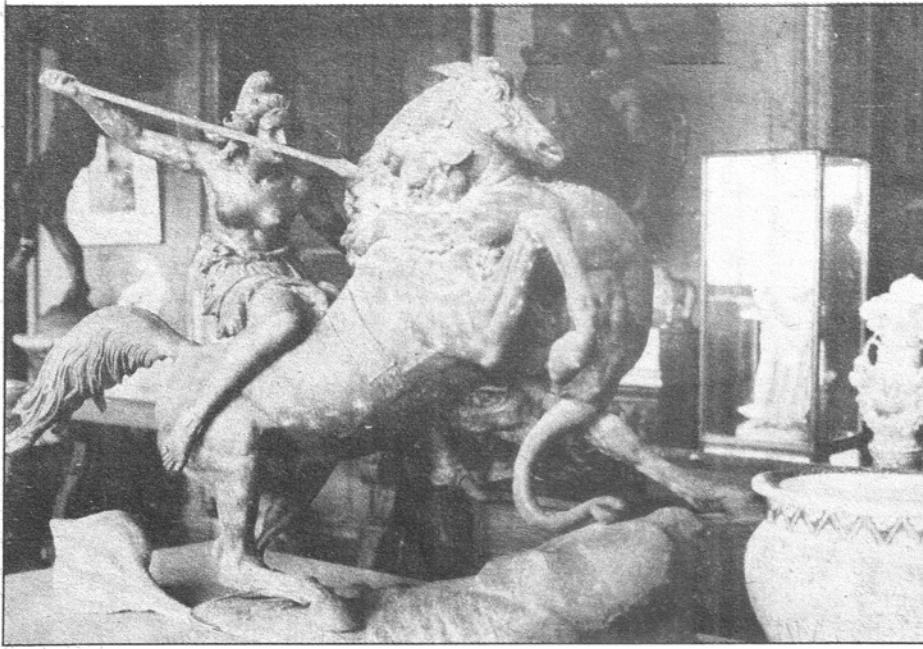
ভাবে পত্তন করে হুগলি নগরীর। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দেই এই নগরী রাজকীয় কৌলীন্য অর্জন করে ব্যবসা বাণিজ্যে। নতুন আলো দেখতে পেয়ে মল্লিকদের পূর্বপুরুষরাও পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসেন হুগলিতে। এভাবেই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সপ্ত গ্রাম থেকে চুঁচুড়া, চুঁচুড়া থেকে কলকাতায়।

মল্লিক বংশেরই পঞ্চদশ পুরুষ জয়রাম মল্লিক কলকাতার গোবিন্দপুরে এসে বাস করেছিলেন জেলেদের সঙ্গে। ইংরেজরাও তখনও কলকাতার মাটিতে পা দেয়নি। বর্গীদের হামলায় অতিষ্ঠ হয়েই জয়রাম এই ধীবর পল্লীতে উঠে আসেন। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সেখানেই ছিল জয়রামের আদি বসত জমি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেখানে কেল্লা তৈরির পরিকল্পনা করে। বিনিময়ে জয়রামকে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় জায়গা দেওয়া হয় বাড়ি তৈরির জন্য। একই সময় ঠাকুর পরিবারও উঠে এসেছিলেন পাথুরিয়াঘাটায়। এভাবে মল্লিক পরিবার কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠে।

এক ইতিহাস থেকে আরেক ইতিহাস। চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় আসার সময় মল্লিক পরিবারে একটি ঘটনা ঘটে। বাঁধাছাঁদা যখন প্রায় শেষ, সেদিন রাতেই গৃহকর্ত্রীকে স্বপ্ন দিলেন জগন্নাথ, মল্লিকদের গৃহদেবতা জগন্নাথ দেব। তাঁর রুদ্রমূর্তি স্বপ্নে আদেশ দিল—'আমাকে যদি গঙ্গা পার করাও তাহলে হবে নির্বংশ।' সে কথা কানে যেতেই গৃহকর্তা পড়লেন মহাফাঁপরে—এখন কি করা যায়! ভিটে ত্যাগ করে চলে যাওয়া হবে, অথচ গৃহদেবতা সঙ্গে যাবেন না, তা কি করে সম্ভব? শুরু হল ভাবনা-চিন্তা। শেষে নিজেই একটি উপায় ঠাওরালেন পণ্ডিতদের সাথে পরামর্শ করে। চুঁচুড়ার আরেক সুবর্ণ বণিক পরিবার ধরদের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল মল্লিকদের এক মেয়ের। সেই মেয়ের হাতেই জগন্নাথ দেবের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দায়িত্ব তুলে দিয়ে মল্লিকরা চলে এলেন কলকাতায়। শুধু সঙ্গে আনলেন রাধাকান্ত জীউ আর লক্ষ্মীনারায়ণকে। দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের ৫ নম্বরে এখনও তাঁর পুজো হয় খুব ঘটা করে।

সুবর্ণ বনিক বা সোনার বেনে পরিবারের সার্থক উত্তরাধিকারী রথীন্দ্র মল্লিক এখনও ব্যবসায়ের পথ ছেড়ে চাকরির মোহে পা বাড়াননি। তবে সময়ের প্রয়োজনে তা খানিক বদলে গেছে, এই মাত্র। রথীন্দ্রবাবু জমি কেনাবেচার ব্যবসা করেন।

কিন্তু এটুকুই তো শুধু রথীন্দ্রবাবুর পুরো পরিচয় নয়। পরিবারের প্রাচীন প্রথা বজায় রেখে এখনও তিনি প্রতিদিন দুপুর থেকে প্রায় বিকেল পর্যন্ত দরিদ্রনারায়ণ সেবা সম্পন্ন করে নিজে জলস্পর্শ করেন।

দরিদ্র নারায়ণ সেবা মল্লিকবাবুদের বরাবরের প্রথা। আজ সেই অর্থকৌলীন্যের রমরমা ভাব না থাকলেও আজও সেই গরীব মানুষকে শ্রদ্ধা ভরে খাওয়ানোর পবিত্র প্রথাটি বন্ধ হয়নি। এখনও দুপুরে অসংখ্য কাঙালীজন মল্লিকবাড়ির সেবায় দুমুঠো খেতে পায়। আশীর্বাদ করে যায় প্রাণ ভরে। রথীন্দ্রবাবুর ভাষায় 'প্রতিদিন এই দুশো আড়াইশো জন দরিদ্র-নারায়ণ সেবা পেয়ে আশীর্বাদ করেন আমাদের। এদের আশীর্বাদ না পেলে আমরা কি এত বড় হতে পারতাম?'

শীল থেকে মল্লিক, আর মল্লিক থেকে যেমন রায় বাহাদুর বা রাজা—তেমনই হুগলি থেকে কলকাতা, গোবিন্দপুর থেকে পাথুরিয়াঘাটায় এসে থিতু হয় মল্লিক পরিবার।

কলকাতার গোড়া পত্তনের যুগ থেকেই মল্লিকরা এখানে আছেন। কলকাতায় মল্লিক পরিবারের বনিয়াদ শক্ত করেছিলেন জয়রামের চতুর্থ পুত্র পদ্মলোচন। ব্যবসা, জীবনযাপন সবদিক দিয়েই পদ্মলোচন মল্লিক ছিলেন সেকালের কলকাতার একজন অভিজাত পুরুষ। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর মল্লিক। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাটি শ্যামসুন্দরের ক্ষেত্রে বোধহয় ষোল আনাই খাঁটি। তাঁর বাণিজ্য শুধু কলকাতা বা বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর কারবার ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। 'হুড়ি' নামের নিজের বাণিজ্য-তরীতে বিভিন্ন মূল্যবান পসরা আসত চীন, ব্রহ্মদেশ, আরব, ইরান ইত্যাদি বাইরের দেশগুলি থেকে।

শ্যামসুন্দরের দুই ছেলে—রামকৃষ্ণ আর গঙ্গাবিষ্ণু। তাঁরাও ধন-সম্পত্তি বাড়ান প্রভূত পরিমাণেই। ধনী লোকদের সেকালে শুধু অর্থোপার্জনেই মন ভরত না, সমাজসেবারও সখ হত। পুণ্য অর্জনের লোভ। শ্যামসুন্দরের ছেলেরা তাই ধর্মশালা করে দিয়েছিলেন, যেখানে আগন্তুকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তো ছিলই, প্রয়োজনবোধে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যেত। এঁদের সময়ই ঘটে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার কংকালসার মানুষ 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে ঘুরে বেড়াত কলকাতার রাস্তায়। প্রতিদিনই শয়ে শয়ে লোক মারা যেত। সেই দু:সময়ে রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু শহরের আট জায়গায় অন্নসত্র খুলে খাদ্য-বস্ত্র বিলিয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণরক্ষা করেছিলেন।
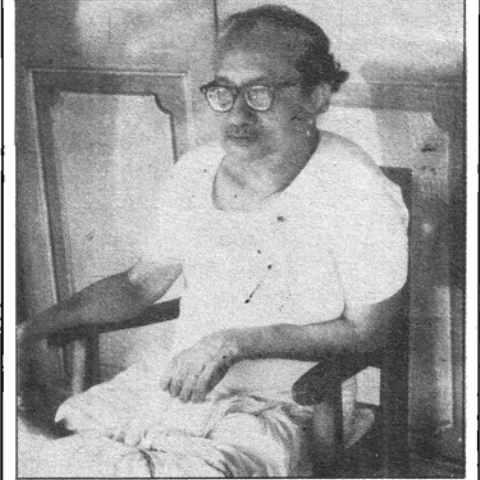
উত্তরপুরুষ পূর্ণেন্দু মল্লিক

রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণুর মূল কারবার ছিল মহাজনী। বাংলাদেশ বা যুক্তপ্রদেশ ছাড়াও সুদূর চীন, সিঙ্গাপুর এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতেও তাঁদের কারবার ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি গঙ্গাবিষ্ণু মারা যান পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতেই। মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র নীলমণি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর নীলমণির জন্ম। খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে তিনি পাথুরিয়াঘাটাতেই বসবাস করতেন। গোটা পরিবারের পরিচালন ভার ছিল নীলমণি আর রামকৃষ্ণের পুত্র বৈষ্ণবদাসের হাতে। গৃহদেবতা জগন্নাথ-

দেবকে মল্লিকরা কলকাতায় আনতে পারেন নি। রেখে এসেছিলেন চুঁচুড়ার ধর পরিবারে। নীলমণি মল্লিকই তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনেন। চোর-বাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ি তাঁরই তৈরি। শোনা যায় দিদিমার কাছ থেকেই তিনি জগন্নাথ-দেবকে ফিরে পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির গায়েই একটি অতিথিশালাও তৈরি করেন নীলমণি। আজও সেখানে প্রতিদিন কাঙালী ভোজন চলছে। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে জাঁকজমক ছিল সেকালের কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ। বণিক সমাজের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত লোকদের ঠাকুর-বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নীলমণি ভুরি ভোজনেরও ব্যবস্থা করতেন।

তখন দেউলিয়া আসামীদের পক্ষে কোন আইন ছিল না। ঋণের দায়ে তাদের কারারুদ্ধ করা হত। নীলমণি এসব হতভাগ্যদের মুক্ত করে আনতেন গাঁটের পয়সা খরচ করে। এখন যেখানে পোস্তা বাজার, আগে সেখানেই ছিল গঙ্গার ঘাট। সাধু সন্ন্যাসী বা দরিদ্র লোকদের আশ্রয়ের জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটে একটি বিশ্রামাগারও তৈরি করে দিয়েছিলেন।

নীলমণি শুধু বড়লোকই ছিলেন না, মনটিও ছিল খুবই বড়। দান ধ্যানের এমনই খ্যাতি ছিল যে, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত তাঁর নাম নিলেই দিন ভাল যাবে। একবার নীলমণি ও তাঁর স্ত্রী হীরামণি দাসী দরিদ্র নারায়ণ সেবার পর স্বপাকে রান্না করে খেতে বসেছেন। বেলা তখন প্রায় চারটে। এমন সময় বাড়ির দাসী এসে জানাল, 'একজন দুঃখী এসে খেতে চাইছে। কি করব, খাবার দাবার তো সব ফুরিয়ে গেছে?' নীলমণি কোন দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'যাও যাও, তাকে এখনই ডেকে আন।' লোকটি এলে নিজেদের বরাদ্দ খাবারটুকু নীলমণি তার পাতে তুলে দিলেন এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলেন লোকটির পাশে। আর স্ত্রী হীরামণি পাখার বাতাস করে গেলেন সারাক্ষণই।

ঐশ্বর্য এবং দান ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে নীলমণির সাংস্কৃতিক চেতনাও ছিল খুব সমৃদ্ধ। তার সঙ্গীত প্রীতি ছিল অসাধারণ। তখনকার দিনে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অভ্যাস মতই তিনি ভাল ভাল কালোয়াত ও বাঈজী রেখেছিলেন। প্রতি বছর শ্রীপঞ্চমীর দিন বসত বিশেষ মহফিল। নানা প্রদেশ থেকে নামজাদ গায়ক ও বাদকরা সেখানে হাজির হতেন নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে। যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক বিতরণেরও ব্যবস্থা ছিল। নীলমণি গানের সংস্কারও করেছিলেন। ঐকতান সহযোগে 'ফুল আখড়াই' গানের প্রবর্তন তিনিই করেন।

নীলমণির কোন সন্তান ছিল না। তাই দত্তক নিয়েছিলেন কলকাতারই আরেক ধনী বাবু দয়া-লচাঁদ আঢ্যের ভাগনে রাজেন্দ্রকে। এদিকে রাম-কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র সনাতনও ছিলেন অপুত্রক। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই বৈষ্ণবদাস ছিলেন চার চারটি পুত্রের গর্বিত পিতা। সে কারণেই বোধহয় সনাতন ও বৈষ্ণবদাস রাজেন্দ্রকে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই রাজেন্দ্রর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক পরিবারে শুরু হল চাপা অসন্তোষ। রাজেন্দ্র-কে দত্তক নেবার কিছুদিন পর নীলমণি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে এ সময় সনাতন ও বৈষ্ণবদাস হাজির হন নীলমণির রোগ শয্যায়।

> তখন দেউলিয়া আসামীদের পক্ষে কোন আইন ছিল না। ঋণের দায়ে তাদের কারারুদ্ধ করা হত। নীলমণি এসব হতভাগ্যদের মুক্ত করে আনতেন গাঁটের পয়সা খরচ করে। এখন যেখানে পোস্তা বাজার, আগে সেখানেই ছিল গঙ্গার ঘাট। সাধু সন্ন্যাসী বা দরিদ্র লোক-দের আশ্রয়ের জন্য তিনি গঙ্গার ঘাটে একটি বিশ্রামাগারও তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বৈষ্ণবদাস নকল বিনয় দেখিয়ে নীলমণিকে বল-লেন, 'বড়দা, আমাদের সম্পত্তির বহর তো নেহাত কম নয়, এদিকে দাদার কোন ছেলেপুলে হল না, আর তোমারও তো কেউ নেই ...।'

ভাইয়ের কথায় মৌন সমর্থন জানিয়ে সনাতন মুচকি হাসলেন। নীলমণি খানিকটা অবাক হয়েই বললেন, 'ছেলে হল না তো কি হয়েছে? রাজেনকে যে দত্তক নিয়েছি!' বৈষ্ণবদাস বললেন, 'হ্যাঁ, দত্তক নিয়েছ বটে, কিন্তু সে তো পরের বাড়ির ছেলে। বড় হয়ে আদব-কায়দা কেমন হবে বলা যায় না!'

নীলমণি ভাইদের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে-ছিলেন সহজেই। কিন্তু কলহ করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই কোন ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'তা তোমরা কি করতে বল?' সঙ্গে সঙ্গে দাদার মুখের কথা লুফে নিয়ে বৈষ্ণবদাস বলে উঠলেন, 'এ ব্যাপারে আমার মাথায় যে বুদ্ধি এসেছে সেটা অনেকেরই খারাপ মনে হতে পারে। কিন্তু দাদা, তুমি তো তোমার ভাইকে চেনো। আমি শুধু বংশের মান-মর্যাদার কথাই ভাবছি। তাই বলছিলাম কি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি যদি সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিই তাহলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। রাজেনও এক তৃতীয়াংশ পাবে। বড় হয়ে সে যদি উচ্ছন্নেও যায় তাহলেও বংশের খুব একটা ক্ষতি হবে না।'

এরপর নীলমণি আর কোন কথা বলেন নি! শুধু ভাইদের মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে। দাদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বৈষ্ণবদাস বললেন, 'দাদা, তোমার চিন্তার কিছুই নেই। রাজেন যাতে ভাল শিক্ষাদীক্ষা পায় সেটা দেখাও তো আমাদেরই কর্তব্য।'

সনাতন নিজে কিছু বলছিলেন না। শুধু ভাইকে সমর্থন করছিলেন মৌনভাবে। স্বভাব উদারতায় নীলমণি ভাইদের কথাতেই সায় দিলেন। তাঁদের কথামতই কিছুদিন পর উইল সম্পাদিত হল।

নীলমণির মৃত্যু নিয়েও গল্প শোনা যায়। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে নিয়ে আসা হয় চোরবাগানের ঠাকুর-বাড়িতে। পাথুরিয়াঘাটা থেকে এক বিরাট মৌন শোভাযাত্রা সেদিন চোরবাগানে হাজির হয়েছিল। সেখানে গৃহদেবতার সামনে বসে জপ করছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী নীলমণি মল্লিক। তারপর তারই কথামত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গাতীরে। সঙ্গে ছিল টাকা ভর্তি দুটি থলি। যাত্রাপথে সমবেত দুঃখীদের তা বিলিয়েছিলেন স্বহস্তেই। তারপর গঙ্গাস্তব করতে করতে সজ্ঞানেই দেহত্যাগ করেন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে। তার আগে মার্জনা চেয়ে নেন সমবেত আত্মীয় বন্ধু সকলের কাছেই।

নীলমণির মৃত্যুর পরই মল্লিক পরিবারে ভাঙন ধরে। তাঁর খুড়তুতো ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিকের সঙ্গে নীলমণির বিধবা স্ত্রী হীরামণির মামলা শুরু হয় সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে হীরামণি রাজেন্দ্রকে নিয়ে উঠে আসেন চোরবাগানের ঠাকুরবাড়িতে। তখন থেকেই মল্লিক পরিবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়—পাথুরিয়াঘাটা আর চোরবাগানে।

রাজেন্দ্রর জন্ম হয় ২৪ জুন ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে। সোনার চামচ মুখে নিয়েই তাঁর জন্ম। তাঁর 'কর্ণবেধ' অনুষ্ঠান এতই জাঁক-জমক করে হয়েছিল যে তা সংবাদপত্রের বিষয় হয়ে ওঠে। ১৮২৩ খ্রীস্টা-ব্দের ১৫ মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় ওই অনুষ্ঠানকে তুলনা করা হয়েছিল স্বর্গের নন্দন কাননের সঙ্গে।

নীলমণির মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। তাই নাবালক রাজেন্দ্রর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুপ্রীম কোর্ট স্যর জেমস্ উইয়ার হগ নামে একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করে। এই হগ সাহেবই পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির চেয়ারম্যান হন। তিনি ছিলেন খুবই সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর উৎসাহেই মাত্র ষোল বছর বয়সে রাজেন্দ্র 'মার্বেল প্যালেস' তৈরির কাজে হাত দেন। আর এই বিশাল প্রাসাদের নির্মাণ কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার পিছনেও ছিল হগ সাহেবের ঐকান্তিক সহযোগিতা।

রাজেন্দ্র মল্লিকের বিয়ে হয় কলকাতার অন্য-তম ধনী রূপলাল মল্লিকের মেয়ের সঙ্গে। দুই ধনী পরিবারের রাজসূয় যজ্ঞে গোটা কলকাতায় সেদিন মহা ধূমধাম পড়ে গেছিল। দিনটি ছিল ১১ ডিসেম্বর ১৮৩০। ব্যাণ্ড পার্টি, পালকি, টমটম, সঙ আর নিমন্ত্রিত ও রবাহূতের ভিড়ে চোরবাগানের মল্লিক বাড়ি সেদিন গমগমিয়ে উঠেছিল। কোন পক্ষই টাকা খরচের খেলায় হেরে যেতে রাজি ছিলেন না।

দান-ধ্যানের ব্যাপারে রাজেন্দ্র মল্লিক নাকি তাঁর পিতার চেয়েও সরেস ছিলেন। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দের মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিদিন

প্রাসাদের ঝাড়বাতি

পাঁচ-ছ' হাজার কাঙালীর পাত পড়ত তাঁর অতিথিশালায়। তাঁর জাঁকজমক এবং দান-ধ্যানের দিকে সরকারেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক অচিরেই উন্নীত হন রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মল্লিকে। তাঁর দরিদ্রনারায়ণ সেবার বর্ণনা দিয়ে ১৮৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ একটি বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেটির শিরোনাম ছিল 'দ্য মিউনিফিসেনস্ অব রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক'। অবশ্য রাজেন্দ্র মল্লিক তখনো রাজা হননি। জনহিতকর কাজের জন্য তৎকালীন বড় লাট লর্ড লিটন্ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সময় আরও দুজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন কলকাতায়। তাঁরা হলেন মতিলাল শীল ও সাগরলাল দত্ত। তিনজনের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্যও ছিল। তিন ধনীতে একবার বৈঠক বসে কিভাবে দুঃস্থ মানুষদের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানো যায় তা নিয়ে আলোচনার জন্য। রাজেন্দ্র মল্লিক সেখানে বলেছিলেন, 'ওদের খাওয়ার ব্যাপারটা তো এতদিন ধরে আমার বাড়িতেই চলছে। আর নিজেই এসবের তদারকি করি বলে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তাই এটা বন্ধ করে বা চলাতে চালাতে আবার নতুন কিছু শুরু করা আমার পক্ষে অসুবিধা।' ফ্রি এডুকেশনের ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই মতিলালের মাথায় ঘুরছিল। তিনি বললেন, 'তা রাজেন ওদের খাওয়া পরার ব্যাপারটা দেখুক। কিন্তু শুধু পেট ভরলেই তো চলবে না, মাথার দিকটাও ভাবতে হবে। আমি তাহলে ওদের শিক্ষার ব্যাপারটা দেখি।' এরপর একটি জিনিসই বাকি থাকে, সেটি হল চিকিৎসা। সাগরলালের নিজের আগ্রহ ওই দিকেই বেশি। সুতরাং তিন দিকেরই হিল্লে হয়ে গেল অনায়াসেই।

আইনগত অভিভাবক স্যর জেমস্ হগ কিশোর রাজেন্দ্রকে কয়েকটি বিদেশী পাখি উপহার দিয়েছিলেন। সেই থেকেই বোধহয় তাঁর দারুণ আকর্ষণ জন্মায় পশু পাখির প্রতি। বড় হবার পর আকর্ষণ পরিণত হয় নেশাতে। নিজের বাড়িতে তিনিই কলকাতার প্রথম চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন। আলিপুর চিড়িয়াখানার অস্তিত্ব তখনো ছিল না। বস্তুত আলিপুর চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছিল তাঁরই দান করা বহুমূল্য জীবজন্তু দিয়ে। এ ব্যাপারে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিককে সারা ভারতবর্ষেরই অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। সে সময় অবশ্য আরও একজনের নিজস্ব চিড়িয়াখানা ছিল। তিনি হলেন রাজেন্দ্র মল্লিকেরই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল রাজেন্দ্র মল্লিকের। সেগুলির সঙ্গে তিনি নানা রকম জীবজন্তু বিনিময় করতেন। মাঝে মাঝে আদান প্রদান চলত শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবেও। এভাবেই হিমালয়ের ফেজ্যান্ট পাখি উপহার পাওয়ায় লণ্ডনের প্রাণীবিদ্যা সমিতি তাঁকে সম্মানিত সদস্য করেছিলেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরের রয়্যাল জুলজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পশু পাখি বিনিময় করে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজেন্দ্র মল্লিককে। কি ছিল না রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানায়! অস্ট্রিচ থেকে এমু, চীনের মান্দারিন হাঁস, বার্ড অব প্যারাডাইস—সবই ছিল তাঁর বাগানে। কাশ্মীরের যেসব ভেড়ার লোমে বিখ্যাত শাল তৈরি হয়, রাজেন্দ্রর বাগানে সেই ভেড়াও ছিল। তবে পাহাড় ছেড়ে অন্যত্র নিয়ে গেলে এ জাতীয় ভেড়াগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ে, মারা যায়। তাই রাজেন্দ্র মল্লিকের দুশ ভেড়ার মধ্যে মাত্র পাঁচটিই শুধু জীবিত ছিল। আর্ল অব ডারবি তাঁকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাখি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

চিত্রকলার প্রতিও ছিল রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অসীম অনুরাগ। মার্বেল প্যালেসের অভ্যন্তরেই তার পরিচয় ছড়ানো আছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তদানীন্তন বড়লাট তাঁকে ভারতীয় চিত্রশালার অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করেন।

রাজেন্দ্র মল্লিক বিয়ে করেছিলেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর। শুনলে অবাকই লাগে রাজেন্দ্রর বয়স তখন মাত্র এগার বছর পাঁচ মাস সতের দিন। সুতরাং পাত্রীর বয়স সহজেই অনুমেয়। এই পত্নীর গর্ভেই যথাক্রমে 'দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও মণীন্দ্র' রাজেন্দ্র মল্লিকের ছ' পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রটি ছাড়া বাকি সকলেই মারা যায় অকালে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বড় সাধ ছিল পঞ্চমপুত্র যোগেন্দ্রর বিবাহ বাসর বসিয়ে 'মার্বেল হল'—এর উদ্বোধন করবেন। মল্লিক পরিবারের ছেলের বিয়েতে জাঁকজমকের ব্যবস্থাও হবে বিরাট আকারে। কিন্তু যোগেন্দ্রর বিয়ের অল্পদিন আগেই রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সবচেয়ে আদরের দুই
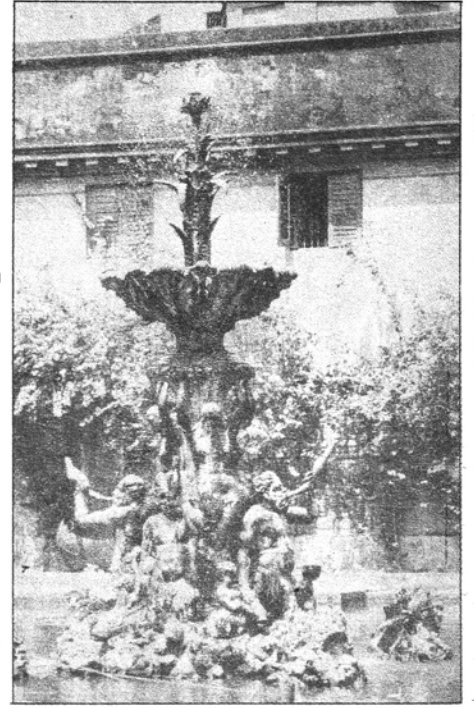
ইতালীয় ভাস্কর্যমণ্ডিত ফোয়ারা

পুত্র গিরীন্দ্র ও সুরেন্দ্রর মৃত্যু হয়। শেষপর্যন্ত যোগেন্দ্রর বিয়ে অবশ্য নির্দিষ্ট দিনেই হয়েছিল। কিন্তু শোক ও কুসংস্কারের বশে সেদিন একই সাথে মার্বেল হলের উদ্বোধন করা যায় নি। ১৮৮৭ সালের ২৪ এপ্রিল কলকাতার মল্লিক পরিবারের মধ্যমণি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর।

প্রাক্তন পুরুষ হীরেন্দ্র মল্লিক এখনও সেই বিশাল পরিবারের বিনয় অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন। আমাদের প্রতিনিধি বিকাশ চক্রবর্তী তাঁর কাছে গেলে অল্প হেসে তিনি বললেন, 'আমাদের নিয়ে লেখার তো কিছুই নেই ভাই। লিখতে হলে ছয় পুরুষ আগেকার মানুষজনকে নিয়ে লিখুন। এখন তো হারানোর পর্ব। আজ যা দেখছেন, তা তো সেই সুদিনের প্রচ্ছায়া মাত্র। আসল কথা তাঁদের নিয়ে, আমাদের প্রোজ্জ্বল পূর্বপুরুষ দানের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিককে নিয়ে। আমরা তাদের উত্তরসাধক। তাদের শুরু করা কাজ শুধু চালিয়েই যাচ্ছি মাত্র। দরিদ্র নারায়ণ সেবা, দাতব্য চিকিৎসালয় কোন কিছুই ছেঁটে ফেলিনি।'

তখনকার দিন আর এখনকার দিন। মাঝখানে মহাকালের বিরাট ব্যবধান। যোগসূত্র হিসাবে রয়ে গেছে টুকরো টুকরো স্মৃতির মালা আর ওই 'মার্বেল প্যালেস', যার মর্মর পাথরে অমর হয়ে আছে বাবু—কলকাতার অন্যতম নায়ক রাজা, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মল্লিকের স্বপ্ন ও সাধনা।

আলোকচিত্র : বিকাশ চক্রবর্তী, কুশল গঙ্গোপাধ্যায় ও অর্দ্ধেন্দু রায়

ভ্রম সংশোধন : গত সংখ্যায় মিঠুন স্টোরির দুটি ছবি গোপাল দেবনাথের তোলা

অলৌকিক শক্তি দিয়ে চিকিৎসা

অদৃশ্য প্রভাবলয় দেখে রোগ নির্ণয় করছেন এল্যানোর কায়ে

রোগীর চেহারা দেখেই তিনি রোগ নির্ণয় করতে পারতেন, হাত দেখে রোগের প্রতিকারের উপায় বলে দিতেন। তাঁর ছিল না কোন ডাক্তারি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা, তাঁর ক্লিনিকে কোন আধুনিক যন্ত্রপাতিও রাখা থাকতো না। এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী এই মহিলা-চিকিৎসকের বিচিত্র কর্মধারার বৈচিত্র্যসন্ধান এই লেখায়।

তাঁর কোন ডাক্তারি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ছিল না। তাঁর ক্লিনিকে ছিল না কোন এক্স-রে মেশিন, অজ্ঞান করবার জন্য ওষুধ, রোগ পরীক্ষা করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি। তিনি রোগীর চেহারা দেখেই রোগ এবং তার প্রতিকারের উপায় বলে দিতে পারতেন।

এল্যানোর কায়ে নামের এই মহিলার বয়স তখন ৬১। লম্বাটে চেহারা। মাথার চুল সব সাদা। কায়ে বলতেন, প্রতিটি জীবিত বস্তুর মধ্যে একটা জ্যোতির্মণ্ডল থাকে। সবার তা দৃষ্টিগোচর হয় না। কায়ে'র বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি মানুষের মাথার চারদিকে ছড়ানো ঐ প্রভাবলয় লক্ষ্য করে তার আকার, বিভিন্ন রঙের সমাবেশ দেখে অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন।

জন্মের সময় কায়ে-র চোখ দু'টি ছিল দৃষ্টি-হীন। সকলেই তাঁকে হতভাগিনী ভেবে সমবেদনা অনুভব করত। কিন্তু প্রত্যেককে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিয়ে ১৮ মাস বয়সে কায়ে'র চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। এবং তাঁর চোখ দু'টিতে এরপর বাস্তবিকই এক অসাধারণ দীপ্তি ফুটে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই কায়ে বলতেন, তিনি সকলের মাথার চারপাশে একটা জ্যোতিপুঞ্জ লক্ষ্য করছেন, কিন্তু তখন তাঁর সে কথা কেউ বিশ্বাস করত না। তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনা। একদিন তাঁর কাকীমা'র মাথার চারপাশের এই অদৃশ্য দীপ্তি লক্ষ্য করে কায়ে ভীষণ ভীত হয়ে পড়লেন। কাকীমা জিগ্যেস করায়, কায়ে জানান, 'কাকীমা তুমি খুব শীগ্‌গিরই মারা যাবে।' কাকীমা হেসে ব্যাপারটা উড়িয়েই দিলেন। কিন্তু কায়ে বললেন, ঐ দীপ্তিটা নীল থেকে কমলা রঙের আকৃতি নিয়েছে, এটা মৃত্যুরই লক্ষণ। কিন্তু কায়ে'র এ কথায় কেউই গুরুত্ব দিল না। ভাবল শিশুসুলভ প্রলাপ, বাবা তো বরং বকাবকিই করলেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই কয়েক সপ্তাহ পরই কায়ে'র কাকীমা মারা গেলেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়ে কায়ে'র পিঠের হাড় ভেঙে যায়। সে সময় তাঁকে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে কাটাতে হয়। এক গভীর রাত্রে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কায়ে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মধ্যে একটা অলৌকিক

উপলব্ধির ক্ষমতা কাজ করছে। কিন্তু তখনও তাঁর এসব বিষয়কে কেউ গুরুত্ব দিত না। লোকে বলত তাঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এক সময় ক্ষোভে দুঃখে কায়ে আত্মহত্যা করবার কথাও ভেবেছিলেন।

হাসপাতালে বহুদিন কাটিয়েও কায়ে'র পিঠের হাড় ঠিক মত জোড়া লাগল না। ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন, মেয়েটি আর সেরে উঠবে না। হতাশ হয়ে তাঁর মা শেষ চেষ্টা করলেন। এক নামকরা হোমিওপ্যাথের কাছে নিয়ে গেলেন মেয়েকে। এখানে একটা বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটল।

ঐ চিকিৎসক ভদ্রলোকের কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তিনি কায়ে'র মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, এই ধরনের ব্যক্তিরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। ইতিপূর্বে তিনি মাত্র দু'জন ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন, ভ্যাটিকানের পোপ জন পল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন ব্রিটেনের ক্যাথলিক চার্চের প্রধান কার্ডিনাল বেসিল হিউম। এই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটির প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক চিকিৎসার ফলে কায়ে সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন। তারপর কায়ে'র বিশেষ আগ্রহে তিনি তাঁকে বছর তিনেক ধরে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা পদ্ধতি শেখালেন। কায়ে'র অস্বাভাবিক ক্ষমতা, চিকিৎসক ভদ্রলোকের সহানুভূতিপূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়ার দরুন কায়ের নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এল। তিনি ঠিক করলেন এরপর থেকে নিজের ক্ষমতাকে অন্যের ভালর জন্য প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন।

ওয়ারউইকশায়ারের কভেন্ট্রি এলাকায় প্রথমদিকে একটি মাত্র ছোট ঘর নিয়ে কায়ে তাঁর কাজ শুরু করলেন, এরপর ধীরে ধীরে নিজের বাসস্থানেই গড়ে তুললেন ছোটখাট একটি হাসপাতাল। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, দামী ওষুধপত্র কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই সেখানে। রোগীর চেহারা এবং জ্যোতির্বলয় দেখেই তিনি অসুখ ধরে ফেলতেন সঠিকভাবে। সামান্য কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধপত্র বিক্রি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। কায়ে তাঁর রোগীদের পরীক্ষা করার পর হাত দু'খানি অবশ্যই খুঁটিয়ে দেখতে ভুলতেন না। কেননা, হস্তরেখা পর্যবেক্ষণ তাঁকে রোগের প্রতিকার করার পক্ষে সাহায্য করত।

কায়ে গভীর ভাবে কিরো-র জ্যোতিষতত্ত্ব অধ্যয়ন করে সে সবও ব্যবহার করতেন চিকিৎসার কাজে। কায়ে সাধারণত এক একজন রোগীর পেছনে এক ঘন্টা সময় ব্যয় করতেন। প্রথমে একটা তীক্ষ্ণ আলপিন রোগী কিংবা রোগিনীর শরীরের বিভিন্ন অংশে আলতো করে ফোটাতেন। এতে রোগীর সংবেদশীল জায়গাগুলি তাঁর জানা হয়ে যেত। এবং একইসঙ্গে ঐ আঘাতের প্রতিক্রিয়াও তিনি বুঝতে সক্ষম হতেন, এতে তাঁর চিকিৎসার সুবিধে হত। তারপর সারা শরীর স্পর্শ করতেন, মালিশ করতেন এবং দেহের সংবেদনশীল বিভিন্ন অংশে চাপ দিয়ে দিয়ে দেখতেন, এভাবে রোগীকে পরীক্ষা করার এইই ছিল তাঁর পদ্ধতি। চোখ দু'টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর কায়ে রোগীর কানের লতি থেকে সামান্য রক্ত নিতেন। যেহেতু অনুমোদিত ডাক্তার ছিলেন না, সেজন্য এক্ষেত্রে কায়ে রোগীর লিখিত অনুমতি নিয়ে রাখতেন। ফলে কোন আইনগত ঝামেলায় তাঁকে পড়তে হয়নি।

সবশেষে তিনি দেখতেন রোগীর হাতের রেখাগুলি। কাগজের উপর হাতের ছাপ দেখেই কায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিতে পারতেন। ৫,০০০-এরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে কায়ে চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি এইসব পরীক্ষা করার জন্য কোন টাকাপয়সা নিতেন না, শুধু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দামটাই নিতেন।

হাত দেখার ব্যাপারে তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত তত্ত্ব ছিল। যেমন, কড়ে আঙুলের অগ্রভাগ দেখে তিনি বলে দিতে পারতেন, কোন ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কি না। মধ্যম আঙুলটি বিশেষ ধরনের ঝুঁকে থাকলে তিনি ধরে নিতেন, লোকটি উদরসংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে। আঙুলের উপর 'এস' আকৃতি থাকলে বোঝা যেত যে, সেই ব্যক্তি
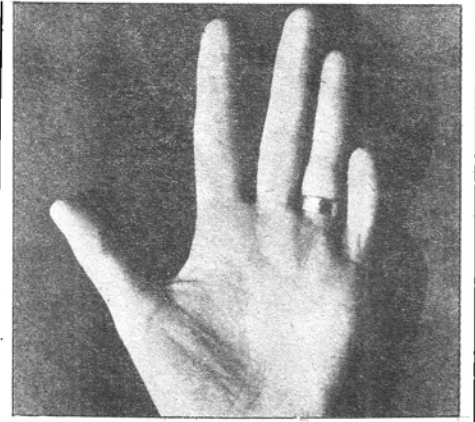
হস্তরেখা রোগ প্রতিকারে সাহায্যকারী : কায়ে
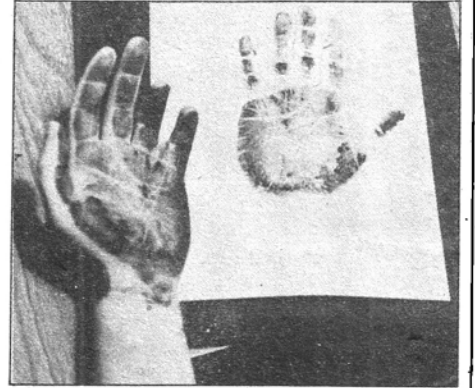
কাগজে হাতের ছাপ দেখে রোগ নির্ণয়

খুব শীঘ্রই বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হবেন। এ ছাড়া মানুষের বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় মাথার চার পাশের প্রভাবলয়ের রঙও নানা রকম রঙ ধারণ করে। সেগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করে কায়ে নানা রকম সিদ্ধান্ত নিতেন। গোলাপী-নীল প্রভাযুক্ত যে মহিলারা আসতেন, তাঁরা স্পষ্টতই গর্ভবতী, এবং পুরোপুরি গোলাপী আভাযুক্ত মহিলারা হতেন সদ্যসন্তানবতী।

'মৃত কিংবা অচেতন নারী-পুরুষের প্রভাবলয় নষ্ট হয়ে যায়, সেসময় তাদের মাথার চারপাশে কোন জ্যোতি বলয় দেখা যায় না', কায়ে বলতেন।

কায়েকে লোকেরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতো তাঁর অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও রোগীর প্রতি তাঁর অসীম মমতার জন্য। কায়ে যখন স্বামীর সঙ্গে বাজারে কিংবা অন্য কোথাও যেতেন, খুব মুস্কিলে পড়তেন। অজস্র লোকের মাথার চারপাশে জ্যোতির্বলয় লক্ষ্য করে তিনি অনায়াসে বুঝতে পারতেন কোন লোকটি কি অসুখে ভুগছেন। কতজনকে আর ধরে ধরে তার অসুখের কথা জানানো যায়। অথচ জেনেশুনে চুপ করে স্থানত্যাগ করাটাও কায়ে'র বিবেকে বাধত।

এই অসুবিধের ফলেই শেষ বয়সে স্বামীকে হারানোর পর কায়ে ভীষণ নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কারুর সঙ্গ পছন্দ করতেন না। কেন না, কেউ সামনে এলেই তাঁর চোখে ফুটে উঠত আগত ব্যক্তিটির প্রভাবলয়। এক প্রচণ্ড মানসিক অস্বস্তি এবং কষ্টের মধ্যে কায়ে'কে শেষ জীবনটা কাটাতে হয়েছিল নিঃসীম একাকীত্বের সঙ্গে
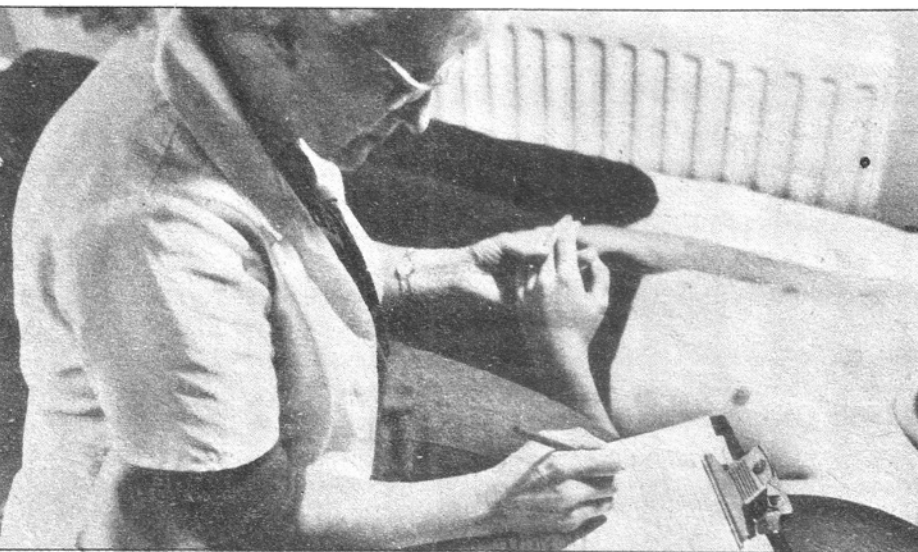
রোগীর আঙুলগুলি খুঁটিয়ে দেখা, কায়ে-র রোগ নির্ণয়ের আর এক পদ্ধতি

২৫ পৃষ্ঠার পর
যুবনেতা গোকুল রায় বললেন : '১৯৬৯ সাল থেকে ওই সব প্রবীণ নেতা শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদন করে চলেছেন। অথচ ৬ মাসের মধ্যে সুভাষ ঘিসিং সারা দেশের নজর কেড়েছে। অস্ত্র হাতে না তুলে নিলে সহজে কারো নজর পড়ে না। আমরাও এবার তাই নেব। সেজন্যই লালডেঙার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এবং ফলাফলও উৎসাহব্যঞ্জক—প্রয়োজনে আসন্ন নতুন বছরেই কামতাপুরকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করা হবে।'

অপয়া তের তারিখের এই আরও অপয়া খবরটিকে পাকা করতেই যেন ময়নাগুড়িতে ১৫ নভেম্বর পতপত করে উড়তে শুরু করল উত্তরখণ্ড দলের পরিবর্তিত পতাকা : কাপড়ের বিশাল লাল ত্রিকোণ, মাঝখানে গাঢ় কালো রঙ-এর চক্র। আগে এই পতাকার রঙ ছিল গৈরিক, তার এক কোণে থাকত সূর্য। যুবনেতা গোকুল রায় আরও বললেন : 'প্রবীণ নেতাদের কথা বাদ দিন। আবেদন নিবেদনে কিছু হয় না। দলের পতাকা এখন আমাদের হাতে। আমরা সুভাষ ঘিসিং-এর আন্দোলনের সমর্থক। সেরকমই পোস্টার দিয়েছি। কামতাপুর সম্মেলনে লালডেঙাকে আমরাই আনছি। দলের পতাকা আমরাই পাল্টে দিয়েছি। কারণ আমরা জানি ভিক্ষা চাইলে কেউ তা দেয় না, গায়ের জোরে দাবি আদায় করে নিতে হয়।'

উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা নিয়ে কামতাপুর রাজ্যের দাবিদার উত্তরখণ্ডী আন্দোলন এখন অনেক কিছুই বদলে ফেলেছে। বদলেছে বক্তব্যও। ওরা বলছেন, 'স্বাধীন কামতাপুর রাজ্য আগেও ছিল। এমন কি পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা যখন বৃটিশ বেনিয়ার পদানত হল, তখনও। কামতাপুরের জনগণ ক্ষত্রিয়,রাজবংশী, কোচ, মেচ এবং বোরো জাতির। তারা কখনই বাঙালি ছিল না। আজও নেই। বরং বাইরে থেকে আসা বিদেশী বাঙালিরাই কামতাপুরীদের জমিজিরেৎ কেড়ে নিয়েছে। আমরা আমাদের জমিজিরেৎ, নিজস্ব অধিকার ফেরৎ চাই, এবং তা যে কোন মূল্যে।'

উত্তরবঙ্গের মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিঙ নিয়ে প্রস্তাবিত কামতাপুর এলাকায় সন্ধ্যের পর এখন আশ্চর্য রাজনৈতিক তৎপরতা। গত ২৬ অক্টোবর জলপাইগুড়ির রাখালদেবীতে পৃথক রাজ্যের দাবিতেও উত্তরখণ্ডী দলের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য গিরীশ দেবসিংহ, হরিমোহন বর্মন, জনরঞ্জন রায়, ডাঃ মোজাম্মেল হক প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশের শেষে সমর্থকরা গীতা এবং কোরাণ ছুঁয়ে শপথ নিলেন কামতাপুর আদায়ের। অন্যদিকে ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, বুড়িরহাট, ভাঙারহাট, মধুপুর প্রভৃতি এলাকায় যুবনেতা গোকুল রায় ও শচিন অধিকারীর নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের শপথ নিচ্ছেন। সমস্ত অস্ত্রই আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। পঞ্চানন মল্লিক, রুক্মিণী রায় ইত্যাদি নেতারা যোগাযোগ করছেন অসম গণপরিষদের সঙ্গে, অন্যদিকে যুবনেতারা কথাবার্তা চালাচ্ছেন মিজো এম. এন. এফ. নেতা লালডেঙা এবং তনলুইয়ার সঙ্গে। অগ্নিগর্ভ অবস্থায় উত্তরবঙ্গ এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা হওয়ার পথ খুঁজছে। বাঙালির বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে বাঙালি। অস্বীকার করছে নিজেদের বাঙালিত্ব। প্রতিরোধে নেমে পড়ছেন সি পি আই (এম) কর্মীরা। তাহলে কি উত্তরবঙ্গ এখন গৃহযুদ্ধের মুখে? আর এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য দায়ীই বা কারা'?

জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী : উত্তরখণ্ডী দলের প্রেরণা?

উত্তরবঙ্গের মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং নিয়ে প্রস্তাবিত কামতাপুর এলাকায় সন্ধ্যের পর এখন আশ্চর্য রাজনৈতিক তৎপরতা।

প্রফুল্ল মহন্ত কি উত্তরখণ্ডী দলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক?

উপরিউক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে ১৯৮৬ সালের গোপন রাজনৈতিক বৈঠকগুলির দিকে নজর রাখতে হবে। গত ১৪ জুন উত্তরখণ্ডী দলের সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক এবং সম্পাদক রুক্মিণী রায় আসামের রাজধানী দিসপুরে অসম গণ পরিষদ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তর সঙ্গে বৈঠক চান। এবং প্রাক্তন এম.পি. এবং কোচরাজবংশী ক্ষত্রিয় মহাসভার সভাপতি অগপ ঘনিষ্ট ডঃ পূর্ণনারায়ণ সিনহার তৎপরতায় অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে রুক্মিণী রায় প্রফুল্ল মহন্তকে কথা দেন কামতাপুরীরা কখনই আসাম-এর গোয়ালপাড়া জেলার বোরো এলাকা চাইবে না। বিনিময়ে কামতাপুর আদায়ের আন্দোলনে অগপ-র সাহায্য চাই। এরপরই ৭ জুলাই আসামের ত্রাণমন্ত্রী অনিরুদ্ধ সিংহচৌধুরী কোচবিহার জেলা সফর করেন। খবরে প্রকাশ, সেসময় শ্রী সিংহচৌধুরী মধুপুর ধামের শংকরদেব মন্দিরে প্রথম সারির উত্তরখণ্ডী নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়ি জেলার বুড়িহাটে গঠিত কোচরাজবংশী ইন্টারন্যাশনল-এর সভাপতি হয়েছেন অসম গণপরিষদের নেতা প্রাক্তন এম.পি. ডঃ পূর্ণনারায়ণ সিনহা। বাড়ি, দরং জেলার তেজপুরে। উত্তরখণ্ডী দলের সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক প্রকাশ্যে বলেছেন 'অসম গণপরিষদ আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। এবং আমাদের মাথায় রয়েছে জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবীর আশীর্বাদ।'

১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে কামতাপুরীর দাবিতে যে সম্মেলন ডাকা হয়েছে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, সেখানে আসামের অনুকরণে দলের নাম রাখা হবে 'উত্তরবঙ্গ গণপরিষদ'। অনেকগুলি দলের সংমিশ্রণে গঠিত অসম গণপরিষদের মত উত্তরবঙ্গ গণপরিষদেও উত্তরখণ্ডী দল, সারা ভারত কামতাপুরী ভাষা সমিতি, চিনা রায় ট্রাস্ট এবং কোচরাজবংশী ইন্টারন্যাশনালকে সম্মিলিত দলে পরিণত করা হবে।

এদিকে উত্তরবঙ্গে পৃথক দুই রাজ্য গোর্খাল্যাণ্ড ও কামতাপুরের দুই দাবিদার গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং উত্তরখণ্ডীদলের মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে অস্তিত্বহীন দুই রাজ্যের সীমানা নিয়ে। জি.এন.এল. এফের দাবি অনুসারে গোর্খাল্যাণ্ডের প্রস্তাবিত সীমানা ভারত নেপাল সীমান্তের মেচি নদী বরাবর দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল সহ তরাই এবং ডুয়ার্স নিয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত। অন্যদিকে উত্তরখণ্ডীদের দাবি উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে কামতাপুর রাজ্যগঠন। ভারতীয় সংবিধানে এক-রাজ্য থেকে একাধিক রাজ্য গঠনের সুযোগ থাকায় উত্তরখণ্ডী দল কামতাপুরীর দাবিদার আর নেপালীরা গোর্খাল্যাণ্ডের।

১৯৭৭ সালের ২৭ নভেম্বর দার্জিলিং-এ চকবাজারে গোর্খালীগ ও উত্তরখণ্ড দলের মধ্যে এক স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল উভয়দলই মোর্চা গঠন করে একযোগে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে কাজ করবে। গোর্খালীগের পক্ষে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক দেওপ্রকাশ রাই এবং প্রাক্তন বিধায়ক রেনুলীনা সুব্বা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, আর উত্তরখণ্ডী দলের স্বাক্ষর করেছিলেন দলের পক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হবে আসন্ন কনভেনশনে। আমাদের কামতাপুরীর দাবি কেন্দ্রের কাছে, রাজ্য সি.পি. এম এ বিষয়ে নাক গলাতে গেলে প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতেও আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেন্দ্রের বি.এস. এফ., সি. আর. পি. এফ. এবং রাজ্য পুলিশে উত্তরখণ্ডের অনেক মানুষই রয়েছেন যারা আমাদের পক্ষে অস্ত্র ধরবেন, যদি আমরা বলি।'

উত্তরখণ্ডী দল ও আসামের অগপ সরকারের আঁতাত হয়েছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত-র নির্দেশে অগপ সংসদ সদস্যরা নাকি আগামী লোকসভার অধিবেশনে এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে কামতাপুরী রাজ্য গঠনের প্রসঙ্গ তুলবেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য গোর্খাল্যাণ্ডকে সশস্ত্র আন্দোলন বলে যে গুরুত্ব দিয়েছেন কামতাপুরীর দাবিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। অথচ কামতাপুরীর দাবি গোর্খাল্যাণ্ডের অনেক আগে।

উত্তরখণ্ড আন্দোলনের জংগী-নেতা গোকুল রায়

উত্তরখণ্ডী দলের সম্পাদক রুক্মিণী রায়

সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক ও সাধারণ সম্পাদক সম্পৎ রায়। এই চুক্তিপত্রে গোর্খালীগ শুধুমাত্র দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চল দাবি করেছিল। ন্যূনতম সমঝোতার জন্য সম্পত রায় ও গোর্খাল্যাণ্ড নেতাদের সাম্প্রতিক গোপন বৈঠকের পরও কামতাপুর এবং গোর্খাল্যাণ্ডের প্রস্তাবিত দুই সীমানা নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে। এই বিরোধ লড়াই-এ পরিণত হলে মুশকিল। কেননা উভয়পক্ষেই অস্ত্র মজুত।

ময়নাগুড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে এক জলঢাকা নদীর ধারে এক গোপন আস্তানায় উত্তরখণ্ডীদলের চেয়ারম্যান অব দ্য প্রেসিডিয়াম পঞ্চানন মল্লিক বললেন—আমরা সংবিধানসম্মত আন্দোলনে বিশ্বাসী। কোন সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু রাজ্য সি.পি. এম চাইছে আমাদের সশস্ত্র সংঘর্ষে নামাতে। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে শ্লোগান তুলে অন্য সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দিচ্ছে। শুরু হচ্ছে জাত-পাতের লড়াই। অন্যদিকে দলীয় ক্যাডার দিয়ে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে আমাদের কর্মীদের উপর। প্রয়োজনে সশস্ত্র মোকাবিলায় নামার সিদ্ধান্ত নিতে আমরা তাই বাধ্য হয়েছি। এই মুহূর্তে অনেক বিদেশী রাষ্ট্র অস্ত্র দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে চাইছে। এ পর্যন্ত আমরা অস্ত্র না নিলেও প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নেব। এ দেশের আঞ্চলিক দলগুলি শুধু আমাদের সমর্থনই করেননি অনেকেই সশস্ত্র আন্দোলনে নামতে পরামর্শ দিয়েছেন। এইসব আঞ্চলিক দলকে উত্তরখণ্ডের

উত্তরখণ্ডী দলের অন্যতম সংগঠক রুক্মিণী রায় বলেন ২৬ অক্টোবর সাপটিমারিতে আমাদের দুই কর্মীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায় সি.পি.এম.। অভিযোগের পরেও ময়নাগুড়ি থানা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এখন আমরা বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সশস্ত্র আন্দোলনে নামার। হিংসার পথ আমাদের ধরতেই হবে। আবেদন নিবেদন নীতিতে থাকলে পর্যুদস্ত হতে হবে।

তাই কামতাপুরীর সমর্থকরা বাইরের মদতে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবছেন।

উত্তরখণ্ডী দলের অন্যতম সংগঠক রুক্মিণী রায় বলেন ২৬ অক্টোবর সাপটিমারিতে আমাদের দুই কর্মীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায় সি.পি. এম। অভিযোগের পরেও ময়নাগুড়ি থানা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এখন আমরা বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সশস্ত্র আন্দোলনে নামার। হিংসার পথ আমাদের ধরতেই হবে। আবেদন নিবেদন নীতিতে থাকলে আমাদের পর্যুদস্ত হতে হবে।

অগপ সরকারের সঙ্গে গোপন—আঁতাত, এম. এন.এফ-এর জঙ্গী নেতা লালডেঙ্গা ও তনলুইয়ার সাথে বৈঠক, বিদেশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অস্ত্রচুক্তি, গোর্খাল্যাণ্ড এবং আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা সব মিলিয়ে কামতাপুরী রাজ্যের দাবিতে উত্তরবঙ্গে এখন যুদ্ধের দামামা। রাজ্য সি.পি. এম—এর সঙ্গে বিরোধ এখন তুঙ্গে। এবং সেই সূত্রে বাঙালি ও উপজাতিদের সঙ্গে তথাকথিত উত্তরখণ্ডীদের বিরোধ। এই বিরোধ ক্রমশই রক্তক্ষয়ী লড়াই-এর রূপ নিচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য এবং বিদেশী মদতে কামতাপুরী রাজ্য তৈরিতে অস্বাভাবিক তৎপরতা।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার অধিবাসীরা ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায় তারই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা এখন।

ছবি : মধুরিতা ঘোষ

লাখামন্ডলের তরুণীরা
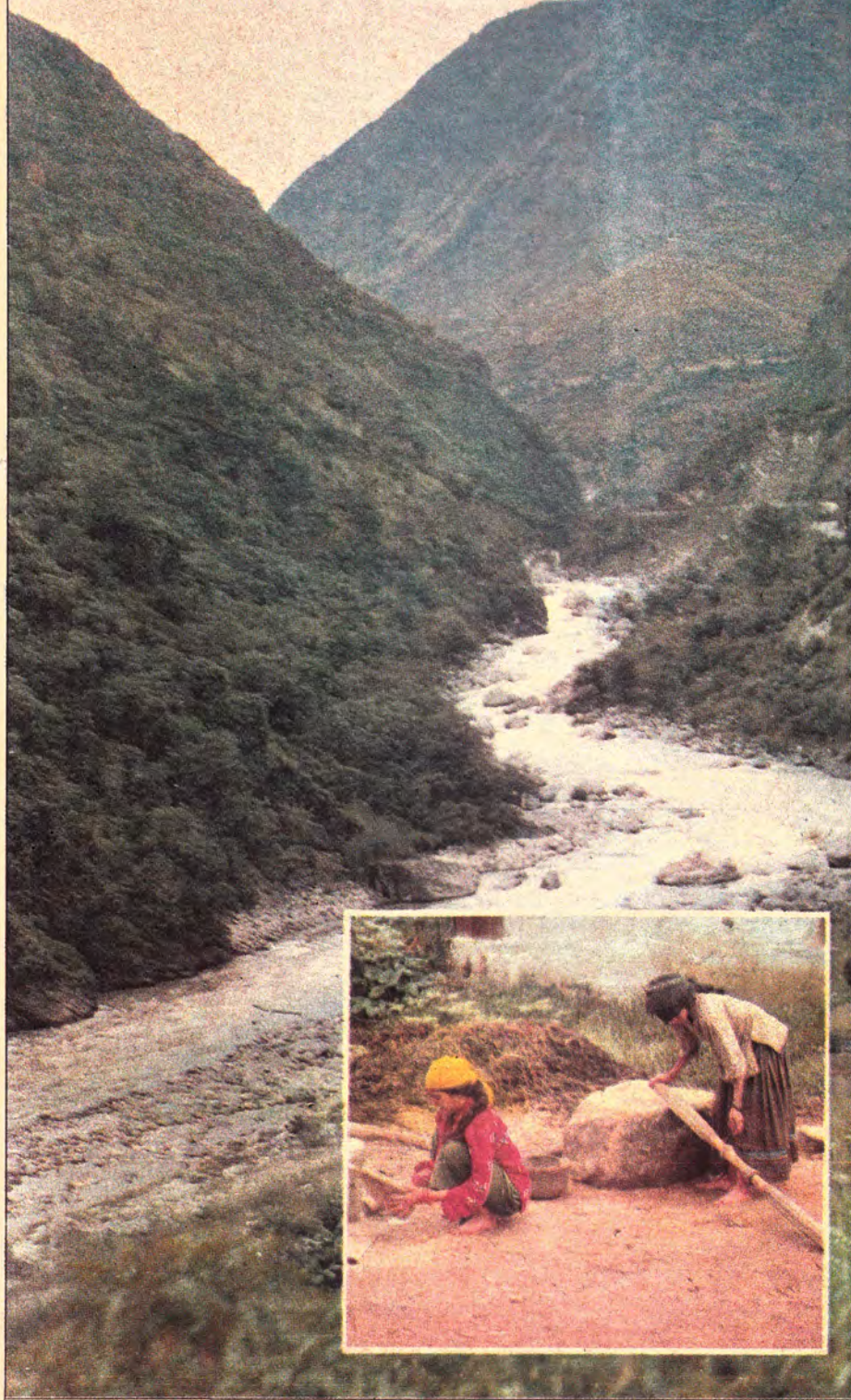
পার্বত্য এলাকার গিরিসংকুল তটভূমিতেও চলে জীবন–মৃত্যুর ভয়াবহ বিভীষিকা। উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন, উত্তরকাশী, গাড়োয়ালের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত হরিজন-অধ্যুষিত 'লাখামণ্ডল'। এখানের পাহাড়ী সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশে আছে মৃগনয়নী তন্বী পর্বতবালার নিটোল দেহসৌষ্ঠব। সারল্যের সুযোগে কেন তাদের পৌঁছে দেওয়া হয় রাজধানী দিল্লির জি.বি. রোড, কলকাতার সোনাগাছি সহ দেশীয় গণিকালয়গুলিতে? কে বা কারা লোলুপ কামনার জাল বিছিয়ে নিয়মিত শিকার করে চলে নিরীহ পর্বতবালা বাসন্তী, ছীপা ও বিসুলা-দের? ঘুণ ধরা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অবহেলায় মহাজনদের যাতা–পেষণে কতদিন দাসত্ব করবে হরিজন, 'কোলটা' সম্প্রদায়? সরজমিন অনুসন্ধান শেষে পুষ্কর পুষ্পের আলোকপাত।

প্রকৃতির রহস্যময় পর্বতমালার উত্তুঙ্গ শিখরের সন্নিহিত সংকীর্ণ তটভূমিতেও চলে জীবন মৃত্যুর লুকোচুরি খেলা। সর্পিল আঁকাবাঁকা রাস্তায় যখন গাড়িগুলি মুসৌরির পর্ব্বতসংকুল পথকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, তখন প্রকৃতির রহস্যময়তা ক্ষণিক আভার মত চলমান ছবি হয়ে হারিয়ে যেতে থাকে দু'পাশে। দেরাদুন থেকে মুসৌরির ১৪০ কিলোমিটার পথের শেষে প্রথম জন-অধ্যুষিত এলাকা-ডামটা। প্রকৃতির সুরম্য কোলে যমুনোত্রীর মোটর পথের প্রথম 'ডেরা'। ডামটাতে তিনটি হোটেল, সাত-আটটি দোকান নিয়েই বিক্ষিপ্ত লোকালয়। এখানে বাস থামে আধ ঘন্টার জন্য, যাত্রীরা তাদের বিশ্রাম ও পানভোজন করেন।

ডামটা থেকে ১৮ কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই বার্ণিগড়। এই বার্ণিগড়ের সংকীর্ণ অঞ্চল যমুনার কল্লোলিত ঢেউকে প্রতিরোধ করার জন্য বড় বড়

৫২ পৃষ্ঠায় দেখুন

কলকাতা পুলিশ: এশিয়ার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

বৃহত্তর কলকাতার প্রায় এক কোটি মানুষের সামনেকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্থিরতার রক্ষণ-দায়িত্ব যে সংস্থার হাতে, তার নাম কলকাতা পুলিশ। মিছিল, মিটিং, জ্যাম, দাঙ্গা, লড়াই, মস্তানী, ভি আই পি-র ধাক্কা সামাল দিতে শ্বেতশুভ্র পোশাকের এই বিশাল বাহিনীকে আমরা সকাল সন্ধ্যা রাত্তিরে সব সময়ই দেখি। কিন্তু ওরা কাজ করেন কিভাবে? কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ওদের জন্ম? কেমন করে ওদের অপারেশন চলে? আমাদের নিত্য দেখার বাইরে প্রতিনিয়ত কলকাতা পুলিশকে যেভাবে রুদ্ধশ্বাস ঘটনার মোকাবিলা করতে হয়, তার উৎস কি? কলকাতা পুলিশকে কেন এই বিশাল মহাদেশের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলছি? পুলিশ কমিশনার কি বলেন? প্রথম শ্রেণীর অফিসার-দেরই বা বক্তব্য কি? ভাড়াটে খুনী, পকেট কাটার কুইন, ছবি এঁকে মহিলা অপরাধী সনাক্তকরণ, ডগ-স্কোয়াডের রানী সোমার কাজ, ধর্মীয় ছায়া থেকে খুনীকে গ্রেপ্তার, বিশ্বজোড়া জালিয়াতির কিনারা, ভি আই পি সেজে থাকা অপরাধী পাকড়াও—এমন কি পুলিশ অপরাধী-কে গ্রেপ্তার করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে কলকাতা পুলিশের চাঞ্চল্যকর কেস হিস্ট্রির পরি-প্রেক্ষিতে সুরক্ষার এক অজানা অধ্যায়ের দিকে মণিশংকর দেবনাথ ও গুরুপ্রসাদ মহান্তির আলোকপাত। এর সঙ্গে সংযোজিত আছে কলকাতা পুলিশের পাবলিক রিলেশান অফিসার তারকনাথ চৌধুরীর একটি আমন্ত্রিত রচনা।

২৯ এপ্রিল, ১৯৮৬। বেলা এগারোটা। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার ব্যস্ততায় জমজমাট হয়ে উঠেছে। এনকোয়ারি, রিসেপশনে ভিজিটরদের ভিড়। ঘন ঘন বাজছে ফোন। হেড-কোয়ার্টারের ঘরগুলোতে ব্যস্ততার শেষ নেই।

ঠিক সেই সময়েই গোয়েন্দা পুলিশের দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনারের ঘরে ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার গৌতম চক্রবর্তী। রিসি-ভার কানে তুলতেই ওপ্রান্ত থেকে একজনের গলা ভেসে আসে। লোকটি যোধপুর পার্কে থাকেন। ওখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন। গৌতমবাবু জানতে চাইলেন ভদ্রলোকের নাম কি, কোথায় চাকরি করেন?

লালবাজার, এশিয়ার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

উত্তর শুনে রীতিমত চমকে উঠলেন তিনি। ভদ্র-লোক প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের জয়েন্ট সেক্রে-টারি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ! কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। তারপর এক সময় টেলিফোনের লাইনও গেল কেটে।
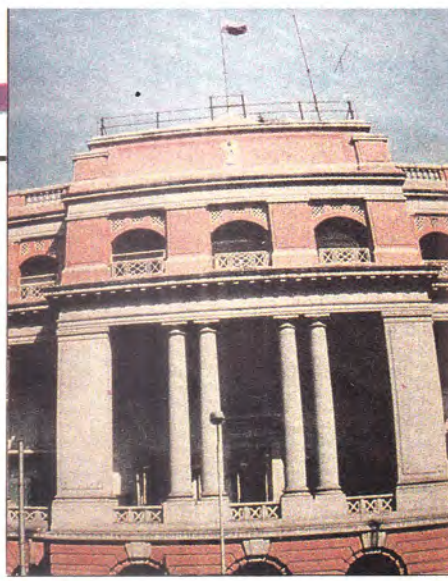
এর ঠিক আধঘন্টা পরেই বেয়ারা একটি স্লিপ নিয়ে এল। বেয়ারা তাঁকে জানাল জনৈক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। গৌতমবাবুর নির্দেশ পাওয়ার মিনিট দু'য়েক পরে দরজা খুলে ঢুকলেন বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক। নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসেই বলে উঠলেন, 'স্যার। আমি আপনাকে কয়েকটা ইনফরমেশন দিতে চাই। খুব সম্ভবত কেউ আপনাকে ফোন করেছিল। গৌতমবাবু বলে উঠলেন, 'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কী ব্যাপার বলুন?'

–'যোধপুর পার্কের এক ভদ্রলোক সম্পর্কে আমাদের মনে খুব কনফিউশন হচ্ছে।'

ভদ্রলোক এবার সমস্ত ঘটনা জানালেন। যোধপুর পার্কে 'প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের যুগ্ম সচিব' সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মনে নানা প্রশ্ন জেগে উঠেছে। ভদ্রলোক বিভিন্ন লোককে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কাউকে বলছেন ছেলের চাকরি দেবেন, কাউকে দিচ্ছেন বাচ্চাকে নামী স্কুলে ভর্তি করাবার প্রতিশ্রুতি। এ রকম আরও অনেক ঘটনার কথা তিনি জানালেন। এলাকার লোকজন ওই প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফ-তরের যুগ্ম সচিবের আচার আচরণে সন্দেহ-প্রবণ হয়ে উঠেছেন।

কলকাতা পুলিশ : কর্মদক্ষতার অভিজ্ঞান

লোকটি চলে যাবার পর টেলিফোনটি সক্রিয় করলেন গৌতমবাবু। উদ্দেশ্য, ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। কলকাতার নানা জায়গায় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ছড়ানো রয়েছে। তাদেরকে জানালেন যে, যোধপুর পার্কে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের যুগ্ম সচিব সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে।

লোকজনেরা আস্তানা গাড়ল যোধপুর পার্কের সেই বাড়িটির পাশে। একজন ভিখিরি সেজে বসে রইল মুখোমুখি একটা দোতলা বাড়ির নিচে। দুটি সজাগ চোখ লক্ষ্য করতে লাগল গতিবিধি।

সকাল নটার সময় দেখা গেল কেন্দ্রিয় উর্ধতন অফিসারদের একটি গাড়ি বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে। গাড়িটির মাথায় লাল আলো জ্বালানো।

ভেতরে দুজন সিকিউরিটি। গাড়ির ভেতর পাইপ মুখে খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত একজন। ইনিই সেই ব্যক্তি, 'প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের যুগ্ম-সচিব' উমাশংকর গান্ধী কল।

গোয়েন্দাদের দল ছুটে এলেন লালবাজারে। গৌতমবাবুকে তাঁরা জানালেন, তাঁদের খবর অনুযায়ী, ওই ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের যুগ্মসচিব উমাশংকর গান্ধী কল। আপাতত তাঁর চলাফেরায় কোন সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু কয়েকদিন পরে গৌতমবাবুর ঘরের টেলিফোনটা ফের বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলতে যোধপুর পার্ক থেকে একজন ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল। তাঁর নাম শান্তা মজুমদার। তিনি জানতে চাইলেন তাঁদের এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ দফতরের যুগ্ম সচিব সম্পর্কে যেসব গুজব শোনা যাচ্ছে, সেটা কি আদৌ সত্য? কারণ এই ভদ্রলোক পরশুদিন তাদের জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ছেলে অভিষেককে বিদেশ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁর বেশ সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

এরকম বহু অভিযোগ পাবার পর গৌতমবাবু বিষয়টি নিয়ে ফের ভাবতে শুরু করলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এত সন্দেহ দেখা দিচ্ছে কেন? কে এই উমাশংকর গান্ধী কল? ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁরা ভাবতে লাগলেন ভদ্রলোক যদি সত্যিই অত বড় মাপের ভি আই পি হন, তবে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে বিব্রত করা চলবে না। এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ দরকার।

এবার আসরে নামলেন স্বয়ং গৌতমবাবু। নিজেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন যোধপুর পার্কে। গোটা এলাকা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। তারপর সেখান থেকে সোজা হাজির হলেন লালবাজারে। ইতিমধ্যে দুজন আই.বি. অফিসার তাঁর ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। গৌতমবাবু চেয়ারে বসতেই তাঁরা জানালেন, উমাশংকর গান্ধী কল সম্পর্কে তাঁরা কিছু তথ্য পেয়েছেন। তিনি যে গাড়ি ব্যবহার করেন সেই গাড়ির মালিককে এখনও পর্যন্ত একটি পয়সাও দেন নি। কিন্তু মাঝে মাঝেই গাড়ির ফিটিংস-এর জন্য চাপ দিচ্ছেন উমাশংকর।

সেদিন বিকেলেই আই.বি-র লোকেরা গাড়ির মালিককে হাজির করল গৌতমবাবুর ঘরে। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে তাঁর মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। এতদিন এরকমই একটা মওকা খুঁজছিলেন তিনি। দুজন লোককে তখুনি খবর দিলেন যে, গাড়ির মালিককে নিয়ে যোধপুর পার্কের বাড়িতে উমাশংকরের মুখোমুখি হতে।

এদিকে গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। তারা খবর নিয়ে যা জানতে পারল, তা শুনে গোয়েন্দা বিভাগের মাথায় হাত। উমাশংকর কলের নামে-বেনামে দশটি বিয়ে। যোধপুর পার্কে তাঁর দশ নম্বর স্ত্রী থাকেন। এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল গোয়েন্দা বিভাগের ঝানু অফিসারেরা।

ইতিমধ্যে গাড়ির মালিকের সঙ্গে উমাশংকরবাবুর দেখা হয়ে গেল। দু'জন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার
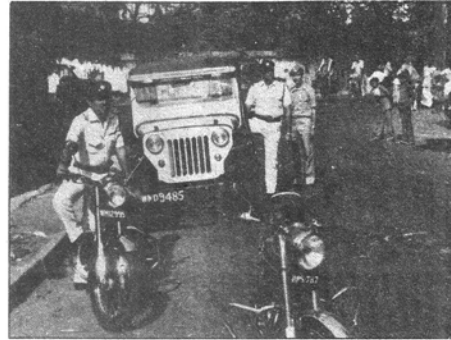
সামনে মালিকটি তাঁর গাড়ির টাকা চাইলেন। যদি টাকা দিতে না পারেন, তবে তিনি গাড়ি ফেরত নিয়ে যাবেন। উমাশংকরবাবু তখন তাঁকে বারবার ধমক দিতে লাগলেন যে, এ বিষয়ে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন তবে তিনি সরকারি স্তরে ব্যবস্থা নেবেন।

এত কিছু জানার পরেও কিন্তু গৌতমবাবু চট করে কিছু করতে পারছিলেন না। উমাশংকর গান্ধী কল নাকি মন্ত্রী শীলা কলের আত্মীয়। ওদিকে শীলা কল আবার নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। একদিকে যখন নানা খবর তাঁর কাছে আসতে লাগল, অন্যদিকে তখন এই খবরটি তাঁকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। যদি তিনি সত্যিই মন্ত্রীর আত্মীয় হন, তো নিশ্চিত না হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নামা হঠকারিতা।

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চলতে থাকে। আরেকটি খবর ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এসে পৌঁছে যায়। বড়বাজারের দুজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী একদিন হঠাৎই গৌতমবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁদের কথা শুনে তো গৌতমবাবুর মাথায় হাত। এই উমাশংকরবাবু তাঁদের প্রস্তাব দিয়েছেন যে, তাঁরা যদি ২ লাখ করে টাকা দেন তবে তিনি তাঁদের রাজ্যসভার এম পি করে দেবেন। এই প্রস্তাব তাঁদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাঁরা তাই ছুটে এসেছেন।

এরপরই ঘটনা নাটকীয় মোড় নেয়। বিশেষ-সূত্র থেকে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পারে, উমাশংকরবাবু আরেকটি বিয়ে করতে চলেছেন। আগামীকাল তাঁর বিয়ে। আয়োজনও প্রস্তুত।

এদিকে গোয়েন্দা বিভাগ তাদের তদন্ত শেষ করে আনে। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন গৌতমবাবু। তিনি টেলেক্স পাঠালেন কেন্দ্রিয় সরকারের বিদেশ দফতরে। তাঁরা জানালেন উমাশংকর গান্ধী কল বলে কেন্দ্রের বিদেশ দফতরে কেউ নেই। এই নামে কেউ কখনও ওই দফতরে ছিলেন না।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা গোয়েন্দা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল যোধপুর পার্কে। একটু আগেই লোড-শেডিং হয়ে গেছে। অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে গোটা এলাকা। উমাশংকরবাবুর বাড়ির আশপাশে জাল পাতা হল। ইতিমধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে যায়, আজ রাত দশটাতেই তিনি এ তল্লাট ছেড়ে পাড়ি দেবেন ভিন রাজ্যে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ অন্ধকার ভেদ করে দু'-জোড়া তীব্র আলো দেখা গেল। ধীরে ধীরে অ্যাম্বাস্যাডরটি এসে ঢোকে বাড়ির রাস্তায়। পুলিশবাহিনী তৈরিই ছিল, তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হল বিদেশ দফতরের জাল জয়েন্ট সেক্রেটারি উমাশংকর গান্ধী কলকে।

গ্রেফতারের পর তাঁর একতলার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু জাল প্যাড। নিখুঁত করে ছাপানো বিদেশ দফতরের জাল প্যাডে তিনি নিজেকে ভারতের কেন্দ্রিয় বিদেশ দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পাওয়া গেল জাল রাবার স্ট্যাম্প ও সরকারি কাগজপত্র। গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত চালিয়ে জানতে পারে যে, লোকটির আসল বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙা জেলায়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী উমাশংকরের অতীত রীতি-মত চাঞ্চল্যকর। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বহু প্রতারণার নায়ক তিনি। নিজেকে তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বলে বরাবরই পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। তাঁর দুই দেহরক্ষীর বাড়িও দ্বারভাঙায়। তাদের কাছে যে দুটি পিস্তল ছিল, সে দুটি টয় পিস্তল। এছাড়া আরও জানা গেল, খোদ কলকাতার বুকেই

উমাশংকর বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা টাকা আদায় করছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের মতে, বিগত বিশ বছরে এ ধরনের রিস্কি হোয়াইট কালার ক্রাইম হয় নি। উমাশংকরের বিরুদ্ধে পুলিশ একাধিক মামলা দায়ের করে। বর্তমানে তিনি বিচারাধীন।

১৯৮৩ সালের জুন মাস। খাঁখাঁ করছে রোদ্দুর। বাইরের কলকাতা তৃষ্ণায় ফাটছে। দুপুর একটা নাগাদ ফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল। নিজের ঘরে বসেছিলেন বর্তমান পার্ক স্ট্রীট থানার অফিসার ইন চার্জ বিনয় মুখার্জি। ফোন কানে তুলে খবর পেলেন যে একটা দল গোটা কলকাতা জুড়ে নতুন ধরনের জালিয়াতি শুরু করেছে। এরা ইংলণ্ডে ডাক্তারি পড়ার জন্য জাল অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে থাকে। অ্যাপ্লিকেশন পাঠানোর পর যখন তাদের কাছে পারমিট এসে পৌঁছয়, তখন তারা গ্রীণ্ডলেজ বাংকের মাধ্যমে দেড় হাজার থেকে দু'হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। বছরে এভাবে তারা অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন পাঠায় এবং মোটা টাকা রোজগার করে।

এই খবরটা পাবার পরই প্রতারণা বিভাগের অফিসার ইন চার্জ অর্দ্ধেন্দু সরকার বিনয়বাবুকে ডেকে পাঠান।

মিস্টার মুখার্জি, ব্যাপারটা খুবই জটিল মনে হচ্ছে। বছরে কিভাবে এত পারমিট আসছে, এ ব্যাপারে আপনি খোঁজ খবর নিন।

বিনয়বাবু ব্যাপারটা তদন্ত শুরু করলেন। কেন্দ্রিয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা বিভাগে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, প্রায় দু'কোটি টাকা ইতিমধ্যেই আত্মসাৎ করা হয়েছে। এভাবে যদি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হতে শুরু করে তবে দেশের সমূহ ক্ষতি।

ক'দিন পরেই একজন ডাক্তার এসে হাজির হলেন লালবাজারে। নাম,এল এন রায়। থাকেন মুদিয়ালির কাছে শ্রীমোহন লেনে। ভদ্রলোকের হাতে একটি খাম।

—আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিছুক্ষণ পরেই এল এন রায় এসে ঢুকলেন বিনয়বাবুর ঘরে।

বলুন আপনার কি বলবার আছে? বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

কোনও কথা না বলে তিনি একটি খাম বিনয়বাবুর হাতে দিলেন। তারপর জানালেন, এই খামটি তার হাতে পৌঁছেছে গতকাল। খামের ভেতর একটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। তাঁর বক্তব্য তিনি বিলেত যাওয়ার জন্য কখনও অ্যাপ্লিকেশন করেন নি। চিঠি এবং অ্যাপ্লিকেশনে ভুল ঠিকানা দেওয়া ছিল। তবে যার হাতে পড়েছিল তিনি তাঁর চেনা লোক। তিনিই তাঁকে অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে যান।

ওই অ্যাপ্লিকেশনটিই বহু রহস্যের জট খুলে দিতে থাকে। ডাক্তারবাবু বিদায় নিয়ে চলে যান। বিনয়বাবু এবার ঝাঁপিয়ে পড়েন তদন্তে। তদন্তে জানা যায়, একদল ব্যাংক কর্মীর সহায়তায় পাঁচজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এই কাজ চালাচ্ছে। এই ব্যবসায়ীরা এছাড়াও যা করে থাকে, তা হ'ল
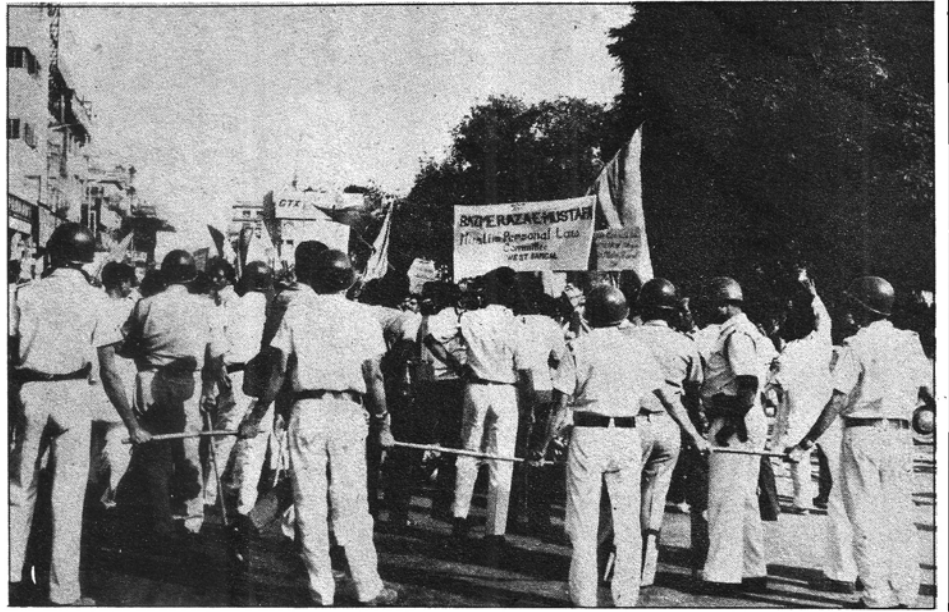
বিক্ষোভ প্রশমনে কলকাতা পুলিশ

স্মাগলিং।

এর কয়েকদিন পরেই বিনয়বাবুর লোকজনেরা বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আনে যে, এই চক্রটির আস্তানা মধ্য কলকাতায়। বিনয়বাবু বাহিনী নিয়ে ছুটে যান সেখানে। পাকড়াও করা হল তাদের। উদ্ধার করা হল বহু জাল অ্যাপ্লিকেশন, রবার স্ট্যাম্প, নানা কাগজপত্র।

তদন্তের কাজ চালাতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে যে, এই চক্রটির সঙ্গে গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংকও রিজার্ভ ব্যাংকের বেশ কিছু কর্মীর যোগসাজস আছে। গ্রেফতার করা হয় গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংকের ম্যানেজার মিঃ ম্যাক-গ্রেগরকে।

তদন্ত চলাকালীন কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষ থেকে এলেন বি ডি পাণ্ডে। সে সময় কমিশনার ছিলেন পি কে সেন। আর গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জুনিয়ার পি কে সেন। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন শ্রী পাণ্ডে। তিনি জানালেন ভারত সরকার এ ব্যাপারটা তদন্ত করতে দুজন অফিসারকে লণ্ডন পাঠাতে চান।

কেন্দ্রিয় সরকারের উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলেন প্রতারণা বিভাগের ও.সি. অর্দ্ধেন্দু সরকার এবং শ্রী বিনয় মুখার্জি। ইংলণ্ডে পৌঁছে তাঁদের প্রথম কাজ হ'ল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা। স্কটল্যাণ্ড পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর আরও অনেক তথ্য জানা গেল। বিনয়বাবুরা জানতে পারলেন এই চক্রের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের গ্রীণ্ডলেজ ব্যাংকের কিছু কর্মীও জড়িত। ফলে বেশ কিছু কর্মীর চাকরিও গেল সে সময়।

অপরাধীদের ধরতে এবার লণ্ডন ছেড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পাড়ি দেন তাঁরা। কিন্তু মূল অপরাধীদের আর ধরা সম্ভব হয় নি। যাদের শুধু কলকাতাতে ধরা সম্ভব হয়েছে, তাদের ছাড়া দেশের ও বাইরের ব্যাংক কর্মীদেরই শুধু ধরতে পেরেছিল পুলিশ। এরপর তাঁরা জানতে পারেন আরও কয়েকজন আন্তর্জাতিক অপরাধী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাদের খোঁজে হংকং পর্যন্ত গিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু সেখানেও তাদের ধরা সম্ভব হয় নি। তবে সব থেকে বড় চাঁইকে বিনয়বাবুরা গ্রেফতার করেন কলকাতার এলিয়ট রোড থেকে।

এরপরই কেন্দ্রিয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি বদলান হয়। সেইসঙ্গে ডাক্তারদের পারমিটের ব্যাপারেও শুরু হল কড়াকড়ি। গোটা মামলাটি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে রীতিমত চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা।

ধীরে ধীরে একটা প্রবাদপ্রতীম ধারণা তৈরি হয়ে গেছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পরেই কলকাতা পুলিশ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বলতে যেমন বোঝায় বিলেতের প্রধান পুলিশ দপ্তরকে। তেমনই কলকাতা পুলিশ বলতেই মনে আসে লালবাজার। শোনা যায় দক্ষতায় একসময় স্কটল্যাণ্ডকে টেক্কা দিত লালবাজার। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এর খ্যাতি।

বৃটিশ আমলের দুঁদে নাম চার্লস টেগার্ট। তখনকার দিনে অপরাধীদের হৃদকম্প জাগাত এই নাম। তবে এই নাম ছিল কুখ্যাত। বৃটিশ সরকারের জ্বলন্ত মুখপাত্র টেগার্ট ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রধান টার্গেট।

কলকাতা পুলিশের এই সুনিপুণ দক্ষতা একদিনে অর্জিত হয়নি। অনেক প্রতিকূলতা ও সমস্যার কাঁটাতার পেরোতে হয়েছে তাঁদের। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য দিতে হয়েছে অনেক অগ্নিপরীক্ষা।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। ইংরেজ বণিক জব চার্ণক হুগলি নদীর পূর্বতীরে সুতানুটির অদূরে নোঙর ফেলেএদেশের মাটিতে প্রথম যেখানে নামলেন, সেটা ছিল একটি গ্রাম। নাম কলকাতা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পরবর্তী পর্যায়ে এখানে ঘাঁটি বানায়। ২৬ হাজার বর্গ মাইলের

পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ

কলকাতার তখন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার।

কলকাতার পত্তনের পর বাংলার তৎকালিন 'জমিনদারি পুলিশ'–এর অনুকরণে 'কলকাতা পুলিশ' নামে একটি পৃথক পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই কলকাতা পুলিশের ইতিহাসের সঙ্গে বৃটিশ ইতিহাসের এক গভীর সম্পর্ক আছে।

১৭২০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খৃস্টাব্দের পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত গোটা কলকাতার শাসনভার, বিচার ও পুলিশ বাহিনী গঠনের ভার ছিল বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের ওপর। ইংরেজরা 'জমিন-দার' হওয়ার পর আরও ৩৬টি গ্রাম দেওয়ান গোবিন্দরামের হাতে আসে। বৃটিশ ভারতের পুলিশ যেমন স্বাধীন ভারতের পুলিশে রূপান্তরিত হয়, তেমনই জমিনদার পুলিশের কিছু অংশ পরিবর্তিত হয় কলকাতা পুলিশে। এককথায় বলা যায়, বাবু গোবিন্দরাম মিত্রই কলকাতা পুলিশের সৃষ্টিকর্তা। কলকাতা পুলিশের জন্মলগ্নে মাত্র ১৪০ জন পাইক ছিল গোবিন্দরামের পুঁজি। কলকাতা পুলিশের তখন দুজন দারোগা, সমগ্র শহর ও শহরতলিকে তিনি চারজন দারোগার অধীনে বিভক্ত করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের বলা হত থানাদার। সে সময়ে সর্বোচ্চ পদের বেতন ছিল দু হাজার টাকা। আর পাইকদের বেতন ছিল মাত্র দু' টাকা।

কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার সৃষ্টির পেছনেও জব চার্ণকের অনুপ্রেরণা রয়েছে। আসলে, লালবাজারের ইতিহাস হল প্রকারান্তরে কলকাতারই ইতিহাস। প্রথমদিকে বর্তমান ডাল-হৌসির এই প্রাণচঞ্চল কেন্দ্রটি ছিল একটি কাছা-রিবাড়ি। এই কাছারির প্রথম কর্তা বা জমিদারই ছিলেন কার্যত বৃটিশ ভারতের সর্বপ্রথম কালেক-টর ও ম্যাজিস্ট্রেট। এই লালবাজারই ছিল কল-কাতার আদি বিচারালয়।

লালবাজার নামের উৎপত্তির বিষয়ে কারো কারো মত যে, লালদীঘিতে পুরনো ফোর্ট উই-লিয়াম দুর্গের লাল প্রতিবিম্ব পড়ত, সেজন্যই এর নাম লালবাজার। আবার কেউ কেউ বলেন, তখন লাল মুখো গোরাদের আধিপত্য ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা এই আদি বিচারালয়ের নামকরণ করেন 'লালবাজার'। নামকরণের উৎস যাই হোক না কেন, লালবাজারের চতুর্দিকেই তখন ছিল লালের আধিপত্য। ওপাশে লালদিঘি, এপাশে লাল গীর্জা, মাঝখানে বসন্তের হোলিতে আবিরে লাল হয়ে যাওয়া লালদীঘি। এছাড়া গিজগিজ করত লালবর্ণ গোরারা।

১৭২০ খৃস্টাব্দে এদেশে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের জন্য লালবাজারে জমিদারী কাছারি গড়ে ওঠে। নর্টন বিল্ডিং–এর পূর্বদিকে ছিল এই কাছারি বাড়ি। কাছারির কর্তা ছিলেন প্রবল প্রভাবশালী। শুধু অর্থনৈতিক ও পৌর বিষয়েই তাঁর ক্ষমতা ছিল না, জেল, জরিমানা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তি-দানের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁর সহকারীও ছিলেন। তিনি কর্তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে যখন মারাঠারা কলকাতা আক্রমণ করে তখন লালবাজারের গুরুত্ব ছিল অসীম। তখন এখানে একটি সামরিক চৌকি ছিল। প্রতিরক্ষার দিক থেকে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ জায়-গার মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। সিরাজউদদৌল্লার সঙ্গে ইংরেজবাহিনীর লড়াই এই লালবাজারের আশেপাশেই সংঘটিত হয়। লড়াইয়ে সিরাদের দখলে আসে চৌকিটি।

প্রথমদিকে পুলিশকে ঔপনিবেশিক শাসন-ক্ষমতা বজায় রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল, সেই-সঙ্গে রাজস্ব আদায়। ১৮৬১ সালে কলকাতা পুলিশের আইন প্রবর্তিত হবার ফলে অপরাধ নিবারণ ও অপরাধ নির্ণয়ের কাজে পুলিশকে প্রাথমিকভাবে নিযুক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের কল-কাতা পুলিশের মধ্যে পার্থক্য বিশদভাবে চোখে পড়বে। ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও স্বাধীন ভারত সরকারের পুলিশ–এ দুইয়ে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। নিয়মকানুনের অনেক প্রকার রদবদল ঘটান হয়।

কলকাতার প্রথম পুলিশ কমিশনার ছিলেন সি জে ককবার্ন। ১৮৫০ সালে তিনি ওই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে কলকাতার প্রথম পুলিশ কমিশনার ছিলেন এস এন চ্যাটার্জি। শেষ বৃটিশ পুলিশ কমিশনার ছিলেন ডি আর হারডিক।

পুরনো দিনের কথা তুলতে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পি কে সেন মৃদু হাসলেন। পার্ক স্ট্রিটের কুইন্‌স ম্যানসনে তাঁর ফ্ল্যাট। লম্বা সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমে বসে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, 'আমার জীবনে অসংখ্য, অজস্র ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি মুহূর্তই ছিল উত্তেজনায় ভরা। মনে পড়ে কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার কথা। হিংসা আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। লালবাজার বারবার ঝাঁকুনি খাচ্ছে। খবর আসছে, অমুক জায়গার ৫০ জন খুন হয়েছে। অমুক জায়গায় খুনোখুনি চলছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে আমাদের জীবনপণ করতে হয়েছে। শ্রীসেন বলেন, 'এরপর এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর জন্য সারা কলকাতা জ্বলে ওঠে মুহূর্তে...।'

এরকম বহু ঘটনার নায়ক প্রাক্তন কমিশনার যখন তাঁর স্মৃতির শহরে হাঁটতে থাকেন, তখন দুচোখ ভরে আসে স্মৃতিময় উজ্জ্বলতায়। অনন্ত সিংহের মামলায় তিনি সর্বশক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। সেসব দিনের কথা ভাবলে এই বয়সেও শরীরে শিহরণ জাগে।

কলকাতা পুলিশ এমনই সব নানা ঘটনার সাক্ষী। নানা ধরনের সমস্যাকে তাঁরা সুদক্ষ পরি-চালনায় সামলেছেন। দিকপাল সব ব্যক্তিত্ব এসে-ছেন। এই পুলিশের নানা পদে এসে বসেছেন বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিরা।

২০ তম পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মেলনে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে যখন এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ফিঙ্গারপ্রিন্টের আবিষ্কর্তা হিসেবে হেমচন্দ্র বোস ও আজিজুল হকের নাম করেন তখন সারা হলঘর করতালিতে ফেটে যায়।

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল, এমনই একজন নামী ব্যক্তিত্ব। শ্রী ঘোষাল পুলিশের চাকরিতে এসে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। 'অপরাধ-বিজ্ঞান' তাঁরই লেখা। এছাড়া তিনি একজন সুলে-খকও বটেন। বেশ কিছু থ্রিলার তিনি লিখেছেন। এক সময়ে এইসব বই দারুণ আলোড়ন তুলেছিল।

এমনই আরেক ব্যক্তিত্ব রণজিৎ কুমার গুপ্ত। নকশাল আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে রাশ টানার দায়িত্ব আসে তাঁর হাতে। নকশাল আন্দোল-নের উগ্র রোষ দূর হয়ে যায় রণজিৎবাবুর দক্ষ মোকাবিলায়। এরপরেই আসেন আর এন চ্যা-টার্জি। নকশাল আন্দোলন তখনও ফুঁসছে। চার-দিকে শুধু খুন জখম আর সন্ত্রাস। অবশেষে নক-শাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নেয়।

কলকাতা পুলিশের আর একজনের নাম করতেই হয়। তিনি হলেন দেবী রায়। বহু জটিল

জট খুলে শ্রী রায় এখন কিংবদন্তী হয়ে গেছেন। দেবী রায় সেসময় অপরাধী মহলে 'টেরর' বলেই চিহ্নিত ছিলেন। তাঁরই অপারেশনে কলকাতা পুলিশ বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ও অভূতপূর্ব ঘটনার রহস্য উন্মোচন করে।

এক রোববারের সকালে ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছি-ল পঞ্চম। হঠাৎই দরজায় বেল বেজে উঠল। পঞ্চম বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্ত্রীকে বলল, দেখ কে এসেছে। দরজা খুলে স্ত্রী বলে উঠে, আরে! কে এসেছে দেখ।

পঞ্চম উঠে পড়ে দেখ'ল তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। তাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

বন্ধু তাড়া দিলেন, চল তো, একটা কাজ আছে। এক্ষুণি।

চা–ও খেল না। দুজনেই উর্দ্ধশ্বাসে চলে যায়।

পঞ্চম সারাদিন ফিরল না। রাত বারোটাতেও পঞ্চম যখন ফিরল না তখন পঞ্চমের স্ত্রী গিয়ে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করেন। ডায়েরি করার এক সপ্তাহ পরেও পঞ্চমের খোঁজ পাওয়া গেল না।

অবশেষে পঞ্চমের স্ত্রী থাকতে না পেরে ছুটে এলেন লালবাজারে। গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার দেবী রায়কে সমস্ত ঘটনা জানানো হল। দেবী রায় জানতে চাইলেন, আচ্ছা ওর বন্ধুটি কি আপনার কাছে এরপরেও এসেছিলেন ?

পঞ্চমের স্ত্রী মাথা নেড়ে জানান, না। আর আসেন নি।

বন্ধুটির ঠিকানা জেনে নিলেন দেবীবাবু। তারপর পঞ্চমের স্ত্রীকে জানালেন, চিন্তা করার কিছু নেই। পঞ্চমের খোঁজ পাওয়া যাবে। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন তাঁর স্ত্রী। এরপরেই দেবীবাবু কমিশনার পি কে সেন (জুনিয়ার)–এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেন। তারপর শুরু হল তদন্তের কাজ।

বন্ধুর বাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ যখন হানা দিল, বাড়ি থেকে জানান হল, তিনি বাড়িতে নেই। গোয়েন্দা পুলিশ এবার ছুটে গেল সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে। অবশেষে তাঁকে ধরা হল মধ্য কলকাতার একটি অফিস থেকে। তিনি কিন্তু সরাসরি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানিয়ে দিলেন। গোয়েন্দা পুলিশরা তাঁকে সোজা নিয়ে গেল লালবাজারের ক্রিমিনাল সেকশানে।

ক্রিমিনাল সেকশানের হিট ট্রিটমেন্ট এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। তীব্র আলো ফেলা হল মুখে। তাতেও যখন মুখ খুলল না তখন পুলিশের জেরারত অফি-সাররা (ইলেকট্রিক) শ্যাক থেরাপির প্রয়োগ কর-লেন। তারপরই রহস্যের জট খুলতে লাগল। ক্রমাগত চাপের মুখে অপরাধ স্বীকৃত হ'ল। ব্যব-সায়িক দ্বন্দ্বের কারণেই পঞ্চমকে খুন করে মাথা আর দেহ বিচ্ছিন্ন করে তাকে তারাতলার ঝিলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এরপরই দেবীবাবু তাঁর দল নিয়ে সোজা হাজির হলেন সেই তারাতলার ঝিলে। সারাদিন তল্লাসি চালিয়ে দেহ আর মাথা তোলা হল। সেই সঙ্গে একটি পানের ডিবে। পঞ্চমের স্ত্রী ডিবেটি দেখে জানালেন সেটি তাঁর স্বামীর ব্যবহৃত পানের ডিবে।
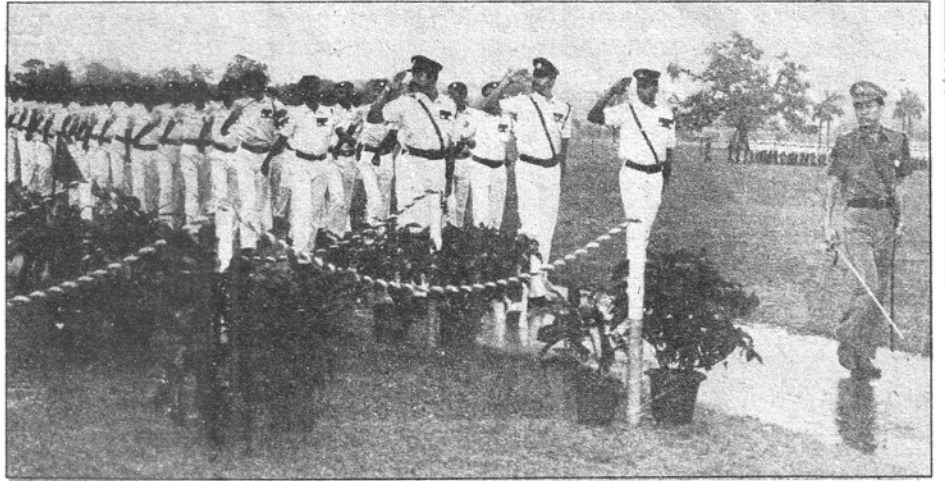
বার্ষিক কুচকাওয়াজের একটি দৃশ্য
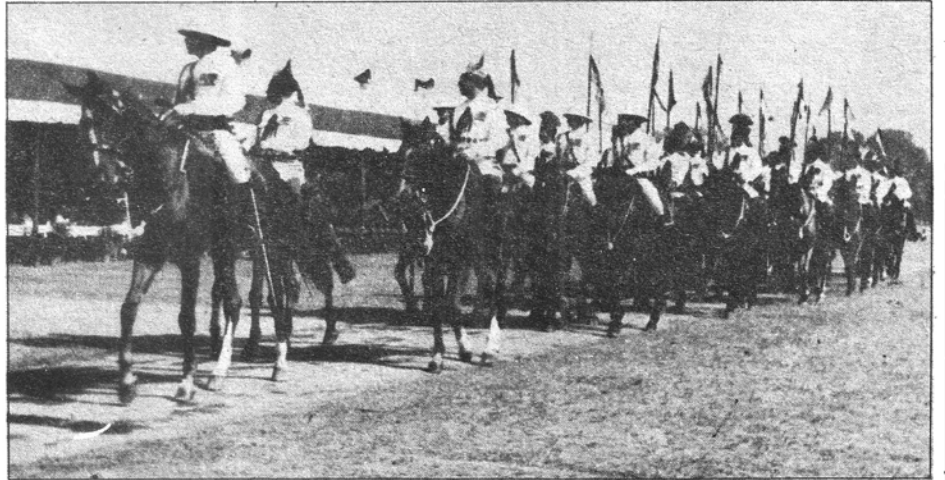
কলকাতা পুলিশের অশ্বারোহী বাহিনী
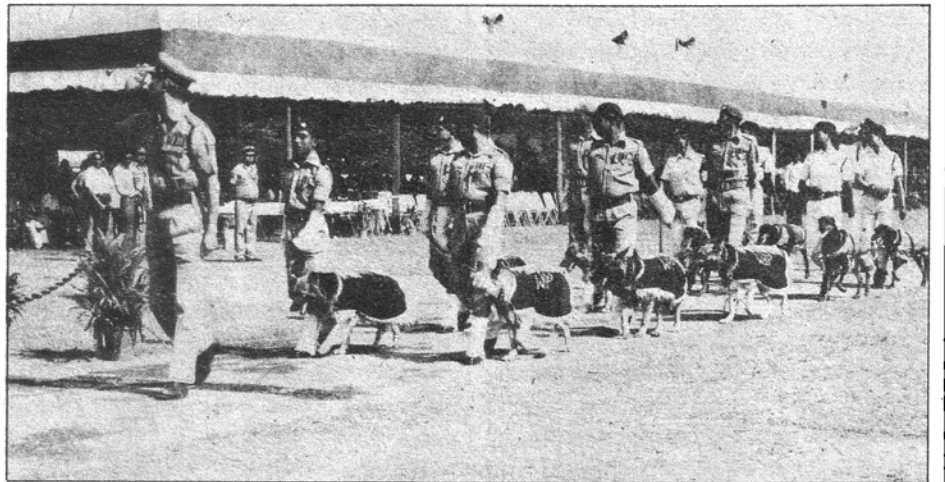
ডগ স্কোয়াড : পুলিশের অতন্দ্র সহযোগী

কিন্তু শুধু ডিবে সনাক্ত করলেই হবে না। কংকাল ও করোটি দেখে কিছুতেই বোঝা গেল না এটি কার কংকাল। মাংস গলে ঝরে গিয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে।

এই করোটি ও কংকালের রহস্য ভেদ করার জন্য প্রথমেই এগিয়ে এলেন কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর পি কে বসু। তিনি দেবীবাবুকে জানা-লেন, এ ব্যাপারে পিছিয়ে গেলে চলবে না। যেভাবেই হোক, এ রহস্যের সমাধান করতে হবে।

ব্যাপারটি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হল। কমিশনার পি কে সেন (জুনিয়র) জানালেন, এই তদন্তে কলকাতা পুলিশ সব রকমের প্রয়াস চালাবে।

এরপর ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে করোটিটি পাঠানো হল পরীক্ষার জন্য।

ফরেনসিক ল্যাবরেটরির বন্ধ ঘরে চলল পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রথমে করোটিটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হল। তারপর তার মডেল তৈরি করা হ'ল। অবশেষে তোলা হল ছবি। ইতিমধ্যে পঞ্চমের পাশপোর্ট ছবি এনলার্জ করে করোটির মডেলের ছবির সঙ্গে মেলানো হল। ক্রমাগত সুপার ইমপোজের পর দেখা গেল করোটির সঙ্গে পঞ্চমের মুখের আদল মিলে গেছে।

ব্যাপারটি অভূতপূর্ব। ঘটনাটি সারা ভারত কেন, সারা এশিয়াতে প্রথম। এই আবিষ্কারে চাঞ্চল্য শুরু হয়। লণ্ডনের বাক্সটন মামলাকেও এই অভূতপূর্ব ঘটনা টেক্কা দিয়ে দেয়। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এই আবিষ্কার-ঘটনাটি। দেবীবাবু মন্তব্য করেন, এই ঘটনা কলকাতা পুলিশকে একবারেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমান করে তুলেছে। বলা বাহুল্য এরপর সেই গৌরব কখনো থেমে থাকে নি।

বিচারে পঞ্চম শুক্লার হত্যাকারী বন্ধুকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। তবে ওই সুপার ইমপোজিশন পদ্ধতিকে সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানান হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, প্রমাণ হিসেবে ওই সুপার ইমপোজিশন সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। শেষ পর্যন্ত শাস্তি হয় পঞ্চমের বন্ধুর।

এরপর অনেক সময় কেটে গিয়েছে। ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে কলকাতা পুলিশে অনেক রকম পরিবর্তন ঘটেছে। ২০তম পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসে বর্তমান পুলিশ কমিশনার বিকাশকলি বসুর বক্তব্য ছিল, 'পুলিশকে এখন বিজ্ঞানসম্মত পথে চলতে হবে। অপরাধী ধরতে আরও বিজ্ঞাননির্ভর হওয়া প্রয়োজন।' সেদিন সবাই কথাটা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন।

কলকাতা পুলিশ দপ্তর যেন নানা স্মরণীয় কাহিনীর এক অনিঃশেষ ভাণ্ডার। সর্বত্রই রোমাঞ্চকর কাহিনী। হেড কোয়ার্টার্স থেকে এপাশের বিল্ডিং—এ এলে নানা চাঞ্চল্যকর কাহিনীর গন্ধ পাওয়া যায়। ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার রুনু গুহ নিয়োগী বললেন, 'আমাদের প্রতি মুহূর্তই রোমাঞ্চকর গল্প। শুনলে ফুরোবে না।'

এই অঢেল ভাণ্ডার থেকেই একটি কাহিনী আমাদের শোনালেন গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এইচ এ সফি সাহেব।

ঘটনার নায়িকা এক মহিলা, নাম মীরা চ্যাটার্জি। মহিলাটির একটি সঞ্চয় সংস্থা আছে। সঞ্চয় সংস্থাটির নাম 'নারায়ণী ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড'। মীরার আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদে। সেখানে সে শাহাদাত নামে এক যুবককে তাঁর কোম্পানির মাধ্যমে লরি কেনবার টোপ দেয়। এরপর তার কাছ থেকে ৪৫ হাজার টাকা নেয়। লরি কিনিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি কিন্তু কার্যকরী হল না। একদিন শাহাদাত দেখল, ওদের ওখান থেকে মীরা পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছে। চলে এসেছে কলকাতায়।

এদিকে আরও একজনকে শিকার করে মীরা। তিনি শশীপুরের এক স্কুলের শিক্ষক অবনী রায়।

পুলিশ কমিশনার বিকাশকলি বসু
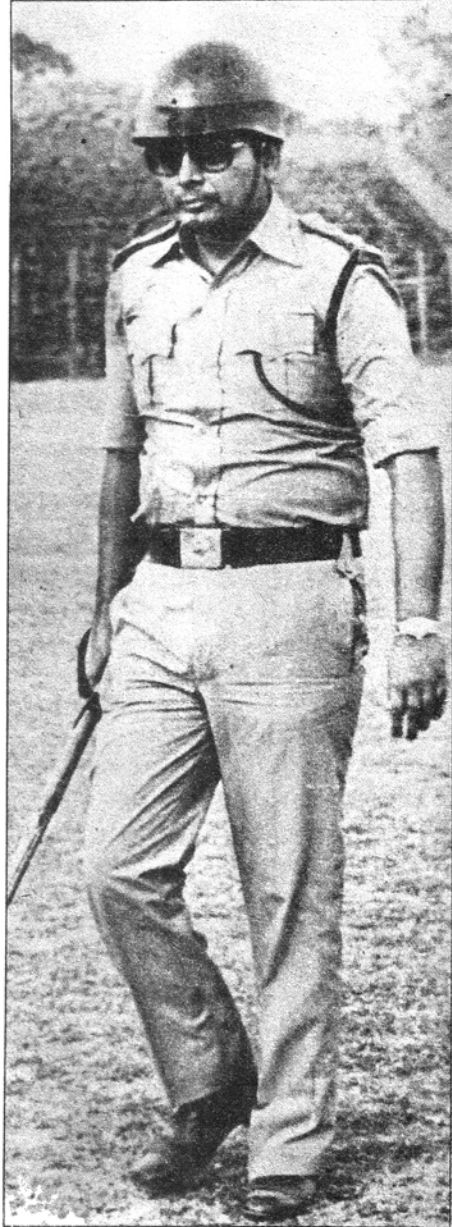
গৌতম **চক্রবর্তী**
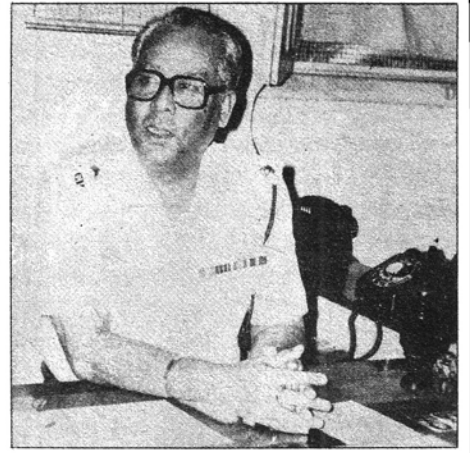
পার্কস্ট্রীট থানার ও.সি. বিনয় মুখার্জি

তাঁর সর্বস্ব তিনি জমা দেন মীরার কাছে। কিন্তু পরে শুধুই কপাল চাপড়ানো। অবশেষে এ খবর পৌঁছয় ওই অঞ্চলের ফরোয়ার্ড ব্লকের এম এল এ, ছায়া ঘোষের কাছে। তিনি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে একদিন সশরীরে হাজির হলেন গণেশ অ্যাভেন্যুর কমার্স হাউসে মীরার অফিসে। সেদিন ছায়া দেবী সিকিউরিটি নেন নি। অফিসে ঢোকা মাত্র মীরা তাঁকে নাটকীয়ভাবে রিভলবার দেখান। সেদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে চলে আসেন ছায়াদেবী।

এ খবর পৌঁছে গেছিল কলকাতা পুলিশ দফতরে। গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারটি তদন্ত করতে নামে। তারপর একদিন মীরার অফিসে গিয়ে হাতে-নাতে তাকে গ্রেফতার করে। চাপের মুখে সব স্বীকার করে মীরা চ্যাটার্জি।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। জটিল হয়ে উঠেছে অপরাধ কলাকৌশল। লালবাজারের এক অফিসার জানালেন, আগে যে ধরনের অরাজকতা কিংবা অপরাধ দেখা যেত, এখন তা আর দেখা যায় না। অপরাধের ধরন-ধারণ অনেক সফিসটিকেটেড হয়ে যাচ্ছে।

অফিসারটি জানালেন, 'এখন যারা অপরাধ করে, খুবই বুদ্ধির সঙ্গে কাজ সারে। ফলে পুলিশকে ব্যাপারটা ট্যাকটফুলি হ্যাণ্ডল করতে হয়।' তাঁর মতে, এখন শুধু পেটি ক্রিমিনালরাই আসরে নামেনি, হোয়াইট কালারের ক্রিমিনালরাও মৌরসি পাট্টা জাঁকিয়ে বসেছে। আরেক অফিসারের মন্তব্য, 'কলকাতা পুলিশ বিগত বিশ বছর ধরে যে ধরনের কেস যেভাবে হ্যাণ্ডল করছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব।'

কলকাতা পুলিশের এইসব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুধু শহর কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতার বন্দর এলাকাও নানা শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনীর উৎস। কলকাতা পুলিশের এই অঞ্চলটি একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীন।

১৯৮২ সালের জুন মাস। কলকাতা বন্দর এলাকা জুড়ে তখন স্মাগলারদের প্রচণ্ড দাপট। সে সময় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন বিনোদ কুমার মেহতা। দারুণ দুঃসাহসী এই ডেপুটি কমিশনার।

ডি সি ডি ডি (১) এইচ এ সফি

গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ধ্রুব গুপ্ত

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম

কলকাতা পুলিশের প্রবাদপুরুষ পঞ্চানন ঘোষাল

সেদিন রাতে হঠাৎ বিনোদবাবুর কাছে খবর এল, বন্দর এলাকাতে বেশ কয়েকজন দাগী ক্রিমিনাল গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। তারা নানা জিনিস পাচার করার একটা বড় মওকা পেয়েছে। খবর পাওয়ার পরেই জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। দুরন্তগতিতে ছুটছে জীপ। কিছুটা এগোবার পরই হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দ। বাইরে তখন নিকষ অন্ধকার। ওই অন্ধকারে জিপ থেকে রিভলবার হাতে নেমে পড়লেন বিনোদ। ক্রিমিনালদের ডেন সম্পর্কে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। জানতেন, কোথায় কোথায় ক্রিমিনালরা রাতের অন্ধকারে বাসা বেঁধে থাকে।

একটা দোতলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। আচমকা টর্চের আলো এসে পড়ল তাঁর মুখে। চোখে ধাঁধাঁ লাগার পরই রিভলবার উন্মুক্ত করলেন। চীৎকার করে সংকেত বললেন, 'উল্লু জলদি আও'। উত্তরে একটা গুলি ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদ মেহতার হাতের রিভলবার ঝলসে উঠল। পর পর দুবার। ইতিমধ্যে তাঁর বাহিনীও ঢুকে পড়েছে। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশের হাতে ধরা দিল চারজন দাগী আসামী।

মিন্টো পার্কের ফ্ল্যাট বাড়িতে নিহত বিনোদ মেহতার স্ত্রী পিংকি মেহতার কাছে স্বামী সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই তিনি ফিরে গেলেন পুরনো সেসব দিনে। স্মৃতিচারণ করে পিংকি জানালেন, "বিনোদ ছিল দুর্দম, বেপরোয়া, মৃত্যুকেও পরোয়া করত না। শৃংখলারক্ষা ও অপরাধ দমনের জন্য ও নিজের জীবন দিয়ে গেছে।'

বর্তমান ডেপুটি কমিশনার এস রামকৃষ্ণণও কম কাজের নন। ইতিমধ্যে অনেক দাগী আসামীকে তিনি কব্জা করেছেন। প্রতিবেদকের কাছে তিনি তুলে ধরলেন একটা ঘটনা। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাস। শীতের রাত। হঠাৎ খবর এল, একদল ক্রিমিনাল খুব ডিসটার্ব করছে। বিভিন্ন ধরনের বিদেশী দ্রব্য ও তেল তারা পাচার করছে। গোটা বন্দর এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ত্রাস।

প্রথমে অ্যাকটিং ডি.সি. (পোর্ট) পার্থ ভট্টাচার্য্য ছুটলেন বাহিনী নিয়ে। তার কিছুক্ষণ পরেই জীপ নিয়ে বেরোলেন রামকৃষ্ণণ। সোর্সের খবর অনুযায়ী, মহেশতলা থেকে কয়েকজন লোক একটি গাড়ি নিয়ে আসছে। তাতে ইণ্ডিয়ান অয়েলের তেল রয়েছে। স্মাগলারদের কাছে সে তেল বিক্রি হবে।

সেদিন প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন রামকৃষ্ণণ। 'আমাকে দেখেই দুজন লোক একটা ভারি বিস্ফোরক পদার্থ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমার সৌভাগ্য, সেটা ফাটল গিয়ে অনেক দূরে।' রামকৃষ্ণণ বলতে লাগলেন, 'ফাটার পরই সরাসরি এনকাউন্টার। গ্রেফতার হল দু'জন ক্রিমিনাল। সেইসঙ্গে ট্রাক ড্রাইভারকেও ধরা হল।'

কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখাও এরকম অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'ন। বন্দরের অপরাধের চরিত্র এক রকম, শহর কলকাতার অপরাধ আবার অন্যরকম। প্রতি মুহূর্তেই বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটে। আজকাল আবার নারী অপরাধীদের সংখ্যাও বাড়ছে। এরা কেউ কেউ আবার ভদ্রঘরেরও বটে। গত ডিসেম্বরের ১১ তারিখে ৫০ বছর বয়সের পুলিশের প্রাক্তন কেরাণী তপন চক্রবর্তি ধরা পড়েন পকেটমারির জন্য। শিক্ষিত তপনের মত আরও অনেক ভদ্রলোকও এরকম অপরাধে লিপ্ত।

কলকাতা পুলিশের আরেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ধ্রুব গুপ্ত। গোয়েন্দা বিভাগের এই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাঁর কর্মজীবনে বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন।

কলকাতা পুলিশের তৎপরতার ইতিহাসে আরেকটি ঘটনা সকলকে তাজ্জব বানিয়ে দেবে। দেড় মাস আগে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা কলকাতা বন্দরের হাইড রোড এলাকার সি পি টি কোয়ার্টার থেকে গ্রেফতার করল কমল পাঁজাকে। সঙ্গে সাকরেদ কচি। অভিযোগ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জিঞ্জিরা বাজার, মহেশতলার রক্তচক্ষু মস্তান এই কমল। কম করে ১৫ টি ডাকাতি মামলার আসামী। অনেকদিন আগে থেকেই পুলিশের লক্ষ্য ছিল কমলকে গ্রেফতার করার। কিন্তু তাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক কায়দা কসরৎ করে পুলিশ ধরল কমলকে। পুলিশকে এজন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয় নি। ধরা পড়বার আগে পর্যন্ত অটোমেটিক রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কমল আর পুলিশের মধ্যে সে এক দারুণ খণ্ডযুদ্ধ। কমলকে গ্রেফতার করার পরও কিন্তু পুলিশ বুঝতে পারে নি '৮৬ তে কমলই হয়ে উঠবে 'প্রাইজ ক্যাচ'।

ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে গেল। জেদি সাকরেদ কচি পুলিশের জেরার মুখে পড়ে ফাঁস করে দিল কমলের আসল পরিচয়। ফ্লাইং ক্লাবের ঝিলে মাঝে মাঝেই যে মৃতদেহ ভেসে ওঠে তার হত্যাকারী যে কমল পাঁজা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নানা জায়গা থেকে কমলের কাছে দূত আসত। টাকা পয়সার রফা হয়ে গেলে কমল কাজ নিত হাতে। কাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে শুধু একবার দেখিয়ে দিলেই ব্যস। হত্যা ও মৃতদেহ লোপাট করার ব্যবসা তার। সাম্প্রতিক কালের
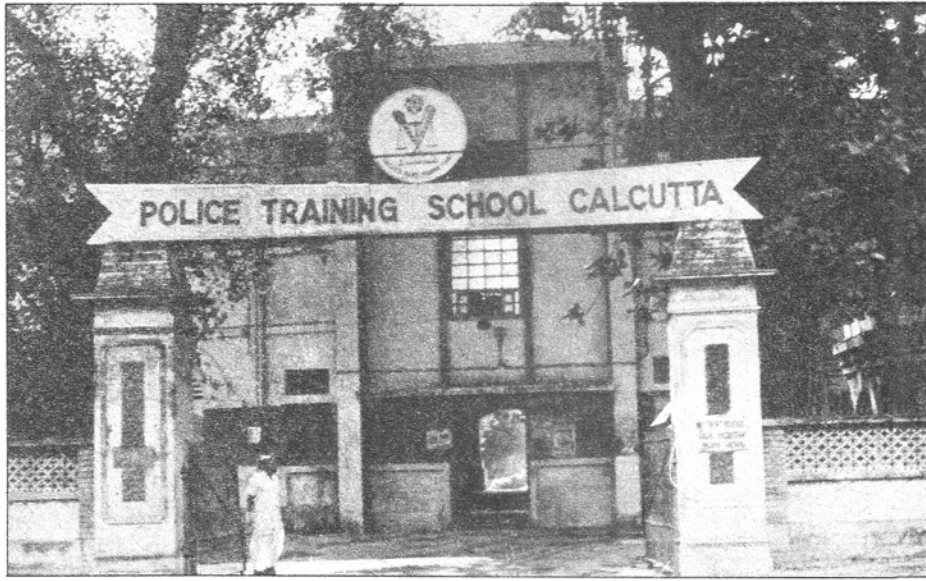
পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলকাতা

সবচেয়ে কুখ্যাত ভাড়াটে খুনী কমল পাঁজাকে গ্রেফতার করা গোয়েন্দা বিভাগের একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই খবর, পেশাদার ভাড়াটে খুনী কমল পাঁজা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুর্গাপুর, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জায়গা মিলে কমপক্ষে আরও ১০টি গুপ্ত খুনের নায়ক।

মাত্র তিন বছর ১০ মাস বয়সের সোমা কলকাতা পুলিশের একান্ত সহকারী। মাত্র এক বছরেই সাতটা জবরদস্ত কেসে সাহায্য করেছে সে। সোমা আর কেউ নয়, কলকাতা পুলিশের খুনী ধরার চৌকস 'ডোবার ম্যান' মেয়ে কুকুর।

কলকাতা পুলিশের অপরাধী ধরার কৌশল সত্যি বিচিত্র। গার্ডেনরীচ, বেসব্রিজ এলাকার ঝুপড়ি থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬, বুধবার ভোরে মাত্র ১৬ দিন বয়স্ক চুরি যাওয়া ছেলেটিকে উদ্ধার করে যেভাবে তাঁরা বাবা মার কাছে পৌঁছে দিলেন তা সতিাই রোমহর্ষক।

রামলাল ফেরিওয়ালার দ্বিতীয় স্ত্রী গীতা। স্বামী ও তিন ছেলেকে নিয়ে সংসার। ঝুপড়িতে বাস। ঘটনার আগের দিন ছিল মঙ্গলবার। বিকেল চারটা-সাড়ে চারটা নাগাদ সে নজর করল একটি মেয়ে মিনিট পনের ধরে ওখানে পায়চারি করছে। গীতা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পরিষ্কার হিন্দিতে মেয়েটি বলে—সে পাঞ্জাব থেকে এসেছে। স্বামী বাঙালি। থাকবার বাড়ি খুঁজতে গেছে কাছাকাছি। এখানেই অপেক্ষা করতে বলে গেছে মেয়েটিকে। ঘন্টা খানেক অপেক্ষাও করল মেয়েটি। তারপর মেয়েটি কোথায় গেল গীতা আর খেয়াল করেনি।

আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ঘড়িতে ছটা, সাড়ে ছ'টা তখন। গীতা দেখে মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে। এসেই যুবতীটি জলভরা চোখে হিন্দিতে বলে—এখনও স্বামীর খোঁজ নেই। এদিকে রাত্রি নামছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। যদি গীতা তাদের ঝুপড়িতে রাতটুকু কাটাতে দেয় তাহলে বড় উপকার হয়। গীতারও কেমন মায়া হয় অসহায় যুবতীটির উপর। দয়াপরবশ হয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।

দোর্দণ্ড ও কুখ্যাত ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট

হঠাৎই ভোর তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে যায় গীতার, চমকে ওঠে। ছেলে কোথায় গেল? গীতা চেঁচিয়ে ওঠে। দেখে ছোট ছেলেও নেই, আর সেই অপরিচিতা যুবতীটিও নেই। স্বামী রামলাল ছুটে এল লালবাজারে।

এ সব কিছু শুনলেন ডি সি (২) গৌতম চক্রবর্তী। তারপর নির্দেশ দিলেন, একজন আর্টিস্টকে ডেকে আনতে।

কনস্টেবল নীতিন বিশ্বাস এদিক থেকে একটি বিশ্বস্ত নাম। অভিযোগকারীর বর্ণনা শুনে অপরাধীর নিখুঁত স্কেচ করতে ওস্তাদ। নীতিন বিশ্বাস গীতার বর্ণনা অনুযায়ী যুবতীটির স্কেচ তৈরি করল। গৌতমবাবু এ সি তারাশংকর হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন তদন্তে।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৬। বৃহস্পতিবার। গার্ডেনরীচ পুলিশ বিহারের গোপালগঞ্জ থানার মুকিরটোলা গ্রামের এক বাড়ি থেকে উদ্ধার করল ছেলেটিকে। ছেলেচোর সেই ২০ বছরের বিবাহিতা যুবতী নাসিমা খাতুন ওরফে বিউটিকেও গ্রেফতার করল পুলিশ।

ডি সি (২) গৌতম চক্রবর্তী তখন নিজের ঘরে বসে আছেন। সেদিন ৬ নভেম্বর, ১৯৮৬। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় হঠাৎই বেয়ারা একটি স্লিপ এগিয়ে দেয় তার দিকে। শহরতলীর এক যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। গৌতমবাবু ডাকলেন যুবকটিকে। যুবকটি ঘরে ঢুকেই দ্বিধাগ্রস্তভাবে বল্লেন—'স্যার, আমি রেলে চাকরির একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি। কয়লাঘাট স্ট্রিটের দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক অফিসার এই চাকুরি দেবার জন্য ১০ হাজার টাকা নিয়েছেন। কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি জাল।'

যুবকটির কথায় চমকে উঠলেন ডি সি ডি ডি (২) তারপর দেখতে চাইলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি। পরিচ্ছন্ন টাইপ করা চিঠি। রবার স্ট্যাম্পটি পর্যন্ত যথাযথ। অবাক হলেন গৌতমবাবু। তবু যুবকটির কাছ থেকে চিঠিটি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

গোয়েন্দা শাখার অফিসারেরা এবার ঘাঁটি গাড়লেন কয়লাঘাট স্ট্রিটের দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অফিসে। গোয়েন্দা দপ্তরের নজর পড়ল চিফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্টের অফিসের একটি জনবহুল ব্যালকনির মধ্যেই ওই প্রতারক চক্রটি টেবিল চেয়ার পেতে গড়ে তুলেছে একটি জাল অফিস।

২১ নভেম্বর, ১৯৮৬। শুক্রবার। চেয়ারে বসে জাল অফিসার ডি আর বিশ্বাস। একটু বাদেই চাকরিপ্রার্থী যুবকটি হাজির। অফিসারের দিকে এগিয়ে দেয় টাকার বান্ডিল। টাকা নিতে যেতেই গোয়েন্দা দপ্তরের দুঁদে অফিসারেরা লাফিয়ে পড়েন ডি আর বিশ্বাসের উপর। চার সাকরেদসহ ভুয়া অফিসারকে গ্রেফতার করা হল। গত চার বছরে কম করে ৭০ জন প্রতারিত হয়েছে এই দুষ্টচক্রের কাছে।

গোয়েন্দা পুলিশ চুঁচুড়ায় ইসমাইলের বাড়িতে হানা দেয়। কাছাকাছি দু'টি বাড়িতে থাকে ইসমাইলের স্ত্রী আর ইসমাইলের এক হিন্দু রক্ষিতা। বেকার যুবক যুবতীদের মিথ্যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করার পাণ্ডা ইসমাইলকে নিয়ে এখনও জোরদার তদন্ত চলছে।

শুধু খুন চুরি ডাকাতি কিংবা জালিয়াতির রহস্য কিনারা করাই নয়, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, যা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে এমন কাজ রুখতে কলকাতা পুলিশের সদাসতর্ক নজরদারি। সেখানে একদিকে যেমন কর্তব্য কাজ করে, তেমনি অন্যদিকে প্রেরণা যোগায় দেশপ্রেম।

৩ অক্টোবর, ১৯৮৬। শুক্রবার। ক্যালকাটা হসপিটালের কয়েকজন ডাক্তারের সন্দেহ ঘনীভূত হল একজন আহত নেপালী শেরপাকে ঘিরে। আহত এই শেরপাটি এমন কিছু আলগা কথা বলে ফেলল, যাতে ডাক্তাররা সন্দেহবশতঃ খবর পাঠালেন লালবাজারে।

উগ্রপন্থী দমন সেলের গোয়েন্দারা বসে ছিলেন নিজেদের ঘরে। হঠাৎই খবর এল ক্যালকাটা হসপিটালের বিশেষ কেবিনের আহত শেরপাটি সম্ভবত জি এন এল এফের নেতৃস্থানীয়। তার বক্তব্যও কেমন সন্দেহজনক। খবর পাওয়ার পরই উগ্রপন্থী দমন সেলের গোয়েন্দারা যখন পৌঁছলেন তখন সোনি শেরপার অবস্থা সংকটময়। হসপিটালের বিশেষ কেবিনে শুয়ে শুয়ে সোনি (৩৫) ওরফে টোনি মৃত্যুর প্রহর গুণছে। গোয়েন্দা পুলিশ এবারও সোনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সোনি বলে, 'আমার নাম সোনি শেরপা। দার্জিলিং-এ বিদ্রোহী গোর্খাল্যাণ্ড নেতা সুবাস ঘিসিং-এর খুব কাছের লোক। ভারতীয় প্রশাসনের মোকাবিলা করতে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গোর্খা সেনাদের নেতৃত্বে একটি গোপন সুইসাইড স্কোয়াডও গঠিত হয়েছে বেশ কয়েকমাস আগে। আমিই সেই 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এর প্রধান। আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ক্র্যাক মাউন্টেনিয়ারিং ডিভিশন'-এর সৈনিক ছিলাম। তারপর আমি এক বছর পলাতক ছিলাম।

'ভারত নেপাল সীমান্তের ওপারে তরাই বনাঞ্চলের এক গোপন ছাউনিতে দলে দলে গোর্খাপন্থীরা কমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য জমায়েত হচ্ছেন। আর্মড এবং আন আর্মড কমাণ্ডো যুদ্ধের কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু গোর্খা সৈন্য ছুটিতে এসে স্থানীয় যুবকদের 'কমাণ্ডো টেকনিক' ও অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।'

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর অনেক আগেই 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এবার সেই তথ্য যে নির্ভুল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ এল—জি এন এল এফ আন্দোলন নেপালের মাটি থেকেই মদত পাচ্ছে। পুলিশের উগ্রপন্থী দমন সেলের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ৪ অক্টোবর লালবাজারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য পুলিশ কমিশনারের সাথে বেশ কয়েক দফা বৈঠক হয়। কলকাতা পুলিশ এ তথ্য রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে দেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলেও কলকাতা পুলিশ তা ভাল করে খতিয়ে দেখে। অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পিছপা হয় না। উল্টোডাঙ্গার ঘটনাটি কলকাতা পুলিশের আদর্শ নিষ্ঠার নজির।

সেটা ছিল ১৯৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি। উল্টোডাঙ্গা থানার কনস্টেবল শান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে হল জয়ন্তীর। জয়ন্তীর বয়স তখন সবে ১৮ বছর। বনহুগলীর বাপের বাড়ির বাইরে কখনও পা বাড়ায় নি। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে বিভিন্ন ঘটনায় তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্বামী কখনও মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে, কখনও ফেরে না। স্বামী সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা শুনতে পায়, কিন্তু অভিযোগ করতে গেলেই শুরু হয় অত্যাচার, অশালীন ব্যবহার। জয়ন্তীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে দেওর কান্তিও। শ্বাশুড়ির
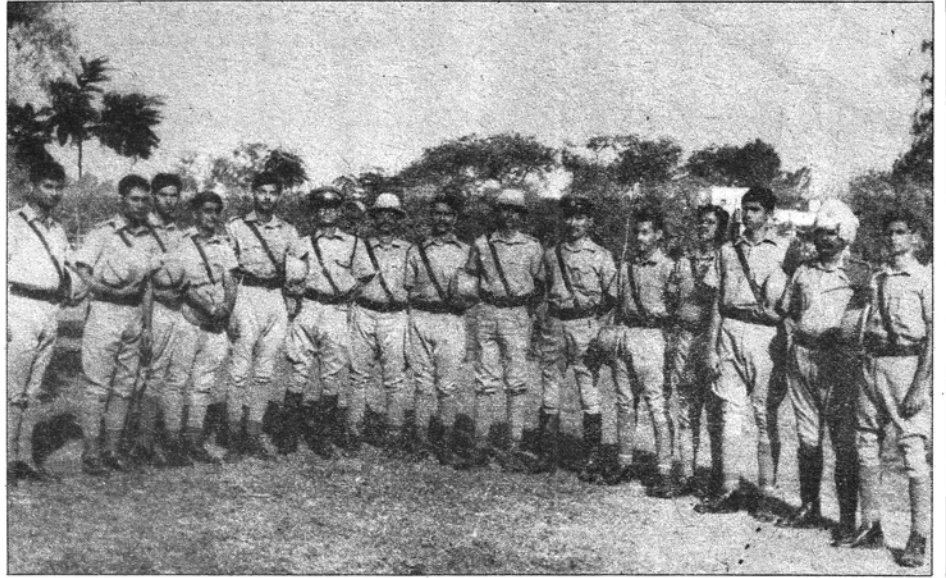
ব্যারাকপুরের ট্রেনিং ক্যাম্পে

পোর্ট পুলিশের ডি.সি. এস রামকৃষ্ণণ

কাছে অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয় না। উল্টে তিনি ছেলেদেরই পক্ষ নেন।

জয়ন্তী নীরবেই সয়ে যাচ্ছিল এ ঘটনা। কিন্তু সেদিন অবস্থা চরমে উঠল, দিনটা ১৯৮৫ সালের বিশ্বকর্মা পূজার দিন। গভীর রাতে যখন প্রচণ্ড মত্ত হয়ে বাড়ি ফিরল শান্ত, জয়ন্তী আর থাকতে পারে নি। মুখের উপর বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। স্বামী শান্ত তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। হাতের কাছের কাঠের খিল দিয়ে জয়ন্তীকে প্রচণ্ড মারধোর করে।

পরদিন-ই শান্ত একটি যুবতী মেয়েকে ঘরে আনে। জয়ন্তী অবাক হয়ে গেল যখন যুবতীটি শান্তর সঙ্গে মাতাল হয়ে তারই বিছানা দখল করে রইল। জয়ন্তী এবার বাপের বাড়ি চলে গেল। পরে শান্তই নিয়ে আসতে গেল জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর বাবা বললেন, মেয়েকে নিয়ে যেতে গেলে তোমাকে আলাদা বাড়ি করতে হবে এবং ভদ্রভাবে থাকতে হবে। কথা দিল শান্ত। জয়ন্তীকে নিয়ে সত্যিই কেষ্টপুরের একটি ভাড়া বাড়িতে উঠল। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই যে কে সেই। এ বাড়িতেই শ্বাশুড়ি এবং দেওর চলে এল, শান্ত আবার মদ শুরু করল বাড়িতেই, জয়ন্তী কোন প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রচুর মারধোর। ২ ডিসেম্বর, ১৯৮৬। জয়ন্তীর ভাই দিদিকে বাড়ি নিয়ে যেতে এলে তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি জয়ন্তীর। ৩ তারিখে অগ্নিদগ্ধ হয়ে সে মারা যায় আর.জি. কর হাসপাতালে।

জয়ন্তীর বাবার অভিযোগ পেয়ে কলকাতা পুলিশ উল্টোডাঙ্গা থানার কনস্টেবল শান্ত ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করল। অপরাধীদের ধরার জন্য কলকাতা পুলিশ সবসময়েই সচেষ্ট। ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কোনও পুলিশি কর্মচারীও যদি অপরাধী হন, তাহলেও কিন্তু তাদের তদন্তে কোন শিথিলতা থাকে না।

দক্ষিণ কলকাতার একটি ব্যস্ত রাস্তায় মিনিবাস থেকে একজন সুন্দরী সুবেশা গৃহবধূ নামতে না নামতেই ছেঁকে ধরলেন লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসাররা। মহিলাকে কোন রকম সুযোগ না দিয়েই তুলে নেওয়া হল পুলিশ ভ্যানে। ভ্যান চলল সোজা লালবাজারে।

সুন্দরী এই গৃহবধূটিকে দেখলে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত মনে হবে। ৩০/৩২ বছর বয়েস। নাম—গীতা। গীতা শুধুমাত্র সুন্দরীই নয়, চারটি ফুটফুটে সন্তানের মা-ও। ডানকুনি স্টেশনের গায়ে একটি দোতলা বাড়ির মালিক, যথেষ্ট সঙ্গত, সম্পন্ন পরিবার।

কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গীতার সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে পকেটমার জগতের কুখ্যাতা গ্যাং-লিডার তথা কুইন। সুশ্রী গীতা নিজেই শুধু পকেট কাটিয়ে নয়, তার দল সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে। লিলি, কালো গীতারা তাঁর সহযোগী। স্বামী বাবুয়াও একই পেশায়।

আঙ্গুলের সামান্য চাপে মেয়েদের গয়না খোলা গীতার কাছে জলভাত। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পার্স

হ্যাপিস্ করা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। দু'চারবার তো গীতা মোটা মাপের পার্টিকে প্রলুব্ধ করে নির্জনে এনে ছিনতাই পর্যন্ত করেছে। হাওড়ার কালিতলার বোস লেনের মেয়ে গীতা কয়েক বছরের মধ্যেই একেবারে হাত-সাফাইয়ের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে ।

গোয়েন্দা পুলিশের হাতে শুধু গীতাই নয় ১২ জন সুন্দরী ধরা পড়েছে । এরা অপারেশন চালায় কলকাতা আর শহরতলি ছাড়াও সারা ভারতে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে যায় বিভিন্ন রাজ্যে। আজমীর, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ। রথের সময়ে পুরীর দিকে ।

আন্তঃরাজ্য পকেট কাটার এইসব মহিলা 'অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য আরও তিন গ্যাং-লিডারের সন্ধান পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। তারা, পূর্ণিমা, অসিমা বোস, আদুরী। এদের দলও অনেক সুন্দরী পকেট কাটার সদস্যে ভারী। তবে গীতাই সবচেয়ে কুখ্যাতা এই লাইনে। এই আন্তঃ রাজ্য 'পকেট-কাটার কুইন' গীতা এখন লক আপে ।

ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্পর্শকাতর বিষয়েও কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৎপর। অক্টোবরের এই ঘটনাটি তারই প্রমাণ ।

১৪ অক্টোবর, ১৯৮৬। রোজকার মত ভোর তিনটেয় উঠেছে উৎপল আর উজ্জ্বল। আশ্রমের প্রভাতী কীর্তনে যোগ দেবার জন্য দাদাকে খুঁজতে এসে দু'ভাই অবাক । দাদার ঘর ফাঁকা, সারা আশ্রমের এঘর ও ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও উত্তমের কোন হদিশ পাওয়া গেল না ।

সোমবার রাতে উত্তম যথারীতি এসে ঢুকেছিল ঘরে। এখন সে রাত জেগে পড়াশুনা করে। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা । উত্তম পড়াশুনোয় বরাবরই ভাল। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছে। তাই উৎপল আর উজ্জ্বল দাদার রাত অব্দি পড়াশুনো করায় কোন সন্দেহ করেনি। কিন্তু পরদিন যখন কীর্তনের আসরে উত্তম অনুপস্থিত, এমন কি সারাদিন বেপাত্তা, তখন দু'ভায়ের সন্দেহ ঘোরাল হল। তারা জানাল আশ্রমাধ্যক্ষ উপাসনা ব্রহ্মচারীকে। কিন্তু উজ্জ্বল আর উৎপলের সন্দেহ যায় না। দাদা যদি বাইরে যেত তাহলে মানিব্যাগ ফেলে যেত না । এমন কি জামাকাপড়ও ।

উত্তম মেদিনীপুরের ছেলে। বাবা রামগোপাল চৌধুরি অময়াপুরের খামারে সামান্য একটি চাকুরি করেন । উত্তমরা পাঁচ ভাই, এক বোন, উত্তম দ্বিতীয় সন্তান । ন'বছর আগে ইসকনের মন্দির দেখতে গিয়ে রামগোপালের আলাপ হয়েছিল চৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তি মহারাজের সঙ্গে ।

এখানেই ভক্তি মহারাজের পিতৃস্নেহে মানুষ হতে লাগল উত্তম। ব্রহ্মচারী হলেন ভক্তি মহারাজের কাছে । ভক্তি মহারাজ উত্তমের নামে আশ্রমের সমূহ সম্পত্তি লিখে দিলেন। উত্তমের বয়স মাত্র ১৬। খড়দার স্কুলে পড়ে। হঠাৎই ১৯৮৩ সালে মারা গেলেন ভক্তি মহারাজ। মারা যাবার সময় তিনি বলে গেলেন–উত্তম পরিণত হলে সেই-ই হবে আশ্রমের প্রধান।

এবারে আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হলেন উপাসনা ব্রহ্মচারী। বেশ কিছুদিন ধরেই অস্থায়ী প্রধান উপাসনা ব্রহ্মচারীর সঙ্গে রেষারেষি চলছিল উত্তমের। হঠাৎই ১৪ অক্টোবর চিড়িয়ামোড়ের আশ্রম থেকে উত্তম নিখোঁজ । এবারে অস্থায়ী প্রধান উপাসনা ব্রহ্মচারী নিজেই পুলিশের কাছে নিখোঁজ বলে ডায়েরি করালেন। এর পর দু'দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পরও উৎপল আর উজ্জ্বল দাদার খোঁজ পায়নি ।

উত্তমের রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটেছে–এই কথাটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না পরিচিতরা। তাঁরা তো এতদিন উত্তমকে দেখেছেন। এমন বিনয়ী শান্ত ছেলে চোখেই পড়ে না। ইতিমধ্যে আশ্রমে হঠাৎ দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। উপাসনা ব্রহ্মচারী পাড়ার এক ছেলের কাছে বলে–উত্তমকে কারা যেন খুন করে আশ্রমের সংলগ্ন স্কুলে পরিত্যক্ত বাথরুমে ফেলে গেছে। পুজোর ছুটিতে স্কুল তখন বন্ধ ।

পাড়ার লোকেরা এবার উদ্যোগ নিয়ে পুলিশ ডাকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারপর তল্লাশি চালায় আশ্রমে। আশ্রম তল্লাশিতে কলকাতা পুলিশ নিখুঁত ক্লু পেয়ে যায়। উপাসনা ব্রহ্মচারীর আলমারির মাথা থেকে পাওয়া গেল উত্তমের ঘড়ি, চিলেকোঠা ঘরের বস্তার ভেতরে উত্তমের দু'জোড়া জুতো আর মশারি

ক্ষমতালোভী আর উত্তমের খুনী হিসেবেই নয়, কলকাতা পুলিশ ব্রহ্মচারীর ভেকের আড়ালে আবিষ্কার করে হুগলীর এক খুনে ডাকাতকে । পুলিশের জেরায় সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতেই খুনে ডাকাত ব্রহ্মচারী সাজে। আগে বাড়ি ছিল বর্ধমানে। বর্ধমানের আউশ গ্রামের বড় ডাকাতিটিও তারই নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। একটি পাঁচ বছরের মেয়েকে কুচিকুচি করে কেটে মাংস রান্না করেও নাকি খেয়েছে এই নৃশংস ডাকাত । রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে চমকে দিয়েছিল এই ভণ্ড সাধক উপাসনা ব্রহ্মচারী ।

আজও কলকাতা পুলিশের চোখ থেকে শিকার ছুটে যাওয়ার ঘটনা খুব কমই ঘটে। এক একটা ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কোন কোন ঘটনার রেশ পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায় । লালবাজার বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী। একদিকে যেমন শান্তি রক্ষা, অন্যদিকে তেমন অপরাধ দমন তাদের কাজ । তবে অপরাধ তদন্তে কলকাতা পুলিশ সত্যিই অনন্য। ইতিহাসের রাজপথ বেয়ে আসা হাজার হাজার ঘটনাকে সাক্ষী রেখে আজও কলকাতা পুলিশ ও তার প্রাণকেন্দ্র লালবাজার চিরচঞ্চল ।

কলকাতা পুলিশের বর্তমান কমিশনার বিকাশকলি বসু কিংবা সদরের ডেপুটি কমিশনার দীনেশ চন্দ্র বাজপেয়ীর ব্যস্ততার বিরাম নেই। বিরাম নেই যুগ্ম কমিশনার কমলেশ রায় কিংবা স্বরূপবাবুর। আবার অন্যদিকে ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার রুনু গুহ নিয়োগী কিংবা বোম্ব স্কোয়াডের এ সি ধ্রুব গুপ্তও ব্যস্ত। কিংবা কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসারদের কথাই ধরুন না। জীবনকে হাতের তালুর মধ্যে রেখে তারা কাজে নামেন।

লালবাজার যেন সকল ব্যস্ততার উর্দ্ধে এক অতুলনীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু শাসনের ভ্রূকুটি নয়, শুধু প্রশাসনের আদেশ পালনই নয়। এখানে কখনো সখনো দেখা যা মানবিকতার আবেগ-জর্জর দৃশ্য। তবে এগিয়ে যাওয়াই কলকাতা পুলিশ তথা লালবাজারের লক্ষ্য। শুধুই এগিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য তার অবিচল।

সেই প্রবীণ ও দক্ষ পুলিশ অফিসারের কথা মনে পড়ে তিনি আমাদের এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এই লালবাজারের প্রতিটি ইঁটই ইতিহাসের সাক্ষী। প্রতিটি ঘরে এখনো ঘুরে বেড়ায় রোমাঞ্চকর কাহিনীরা। জীবনই এখানে তৈরি করে গল্প।'

কলকাতা পুলিশের পাবলিক রিলেশন অফিসার তারকনাথ চৌধুরীর প্রতিবেদন

হ্যালো, পি আর ও বলছি। প্রেসকে দেবার মত এখন পর্যন্ত কোন খবর আছে নাকি? হ্যালো, পি আর ও বলছি, আজ ফুলবাগানে বিকেল পাঁচটায়...।

বিকেল চারটা। লালবাজারে জনসংযোগ অফিসের ঘরে সাংবাদিকদের ভিড় উপচে পড়ছে। চেয়ারে কুলোয় নি; অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছেন। আমি ওই অফিসের পাবলিক রিলেশন অফিসার। অনবরত ব্রিফিং করে চলেছি, 'আজ ফুলবাগানে একজন যুবককে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়।' পরক্ষণেই আবার রিসিভার কানে নিতে হয়, 'হ্যালো পি আর. ও বলছি, ও সি কন্ট্রোল বলছেন? লেটেস্ট নিউজ কিছু আছে প্রেসের জন্য?' কেউ কেউ আমার প্রায় ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পেন বের করে নোট নিচ্ছেন। কান খোলা, দৃষ্টি সজাগ।

লালবাজারে প্রেসের লোকেদের খবর দেবার জন্য এই পাবলিক রিলেশন দপ্তর। যদিও সাংবাদিকদের খবর দেবার সময় পাঁচটায়, তবু চারটে থেকেই তাঁরা আমাকে ঘেরাও করেন। এটা আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। প্রতিদিন অজস্র ঘটনা। সেইসব ঘটনা সাংবাদিকদের কাছে সাজিয়ে দেবার ব্রত পালন করে যাচ্ছি।

খুব অল্প বয়েসেই আমি পি আর ও হয়েছি। এটা অনেকেরই বোধহয় মনঃপুত ছিল না। এক মহিলা অফিসার তো একদিন আমার বিরুদ্ধে উর্ধতনের কাছে কড়া নালিশই করেছিলেন, আমি তখন এই দপ্তরের অধস্তন স্টাফ। নিউজ লেটার প্রকাশ করার ব্যাপারে পি আর ও-কে সাহায্য করাই ছিল আমার কাজ। সামান্য একটি ব্যাপারে ওই মহিলা অফিসারটি আমার ওপর চটেছিলেন। আসলে সেদিন আমি উঠে দাঁড়িয়ে 'উইশ' করতে পারিনি। এ নিয়েই মন কষাকষি। উর্ধতনের কাছে রিপোর্ট। তবে সেটা ফলবতী হয়নি।

তারপর ছ-ছ'টি বছর কেটে গিয়েছে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসেছি। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমার পাবলিক রিলেশনের কাজ।

১৯ নভেম্বর। গ্রেট ইস্টার্নের ব্যাংকোয়েট রুমে শুরু হচ্ছে ২০ তম সর্বভারতীয় পুলিশ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মেলন। সারা দেশের নামী পুলিশের পদস্থ ব্যক্তিরা আসছেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনারও থাকছেন। সব মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। শেষ দিনে রাজ্যপাল নুরুল হাসান আসবেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ এন রায়কে আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। সেইমত আমন্ত্রণপত্রও লেখা হয়েছে।

প্রাক্তন বিচারপতির ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে আমন্ত্রণপত্র ফেরত এল। আমার মাথায় হাত। কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মতো বসে আছি। এমন সময়ই টেলিফোনে ঝনঝনানি। ওপর মহল থেকে জানতে চাইছেন আমন্ত্রণপত্র ঠিকঠিক বিলি হয়েছে কিনা। আমি উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকি। মুহূর্তেই চারদিক গুলিয়ে ওঠে। পায়ের তলার মাটিও টলমল করতে লাগল। আমি জানি, ওইদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিচারপতিই প্রধান বক্তা।

একদিকে উদ্বোধন, অন্যদিকে শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। হাতে গাড়ি নেই। কুছ পরোয়া নেহি। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির দুটি কার্ড ডায়েরিতে পুরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় লাগালাম। ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম গ্রেট ইস্টার্নে। ইতিমধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জমে উঠেছে। টি ব্রেক চলছে। আমি প্রধান বিচারপতিকে চিনি না। পরিচিত এক পুলিশ অফিসার দেখিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতিকে। এ এন রায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছেন। আর দেরি নয়। বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। মেলে ধরলাম কার্ড দুটি।—স্যার, আপনার গভর্নরের ডিনার আর মেয়রের রিসেপশনের ইনভাইটেশন কার্ড।

আমন্ত্রণপত্র দুটি দেখে তিনি স্মিত হেসে বললেন, আমি অশোকনাথ রায় নই। আমি এ এন রায়। প্লীজ গেট ইওর কার্ডস কারেকটেড। বলেই এক গাল হেসে কার্ড দুটি ফিরিয়ে দিলেন।

কার্ড দুটি দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। কার্ড দুটিতে অশোকনাথ রায় লেখা। দেখেই শরীর ঘেমে উঠল। বাড়তে লাগল রক্ত চলাচল। কয়েক মিনিট স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা রাগে ভরে উঠল। এ কাজটা কার? কোন সে অর্বাচীন? আর ভাবার সময় নেই। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লাম লালবাজারে। অফিসের অবশ্য কেউই স্বীকার করল না ব্যাপারটা। সবাই জানাল, এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানেন না।

এক মিনিট দেরি করলাম না। অবশিষ্ট দুটো আমন্ত্রণপত্র ফের টাইপ করে দৌড় লাগালাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তখন পুরোদমে লাঞ্চ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত। এ সময়ে আমন্ত্রণী কার্ড দেওয়া কি শোভন হবে? তাছাড়া ব্যাপারটা ফাঁস হয়েও যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জানতে পারলে সমূহ বিপদ। সেইসঙ্গে কমিশনারও ব্যাপারটা জানতে পারবেন।

সামনে দাঁড়ানো এক উর্ধতন কর্তাকে দেখে ছুটে গেলাম আমি। তাঁকে বলতেই তিনি জানালেন, খাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কার্ড দেওয়া শোভনীয় হবে না। বরং পরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসাই ভাল।

কথাটি আমার মনে ধরে গেল। কালবিলম্ব না করে একজন স্টাফকে সোজা পাঠিয়ে দিলাম হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার সাহেবের কাছে। সব অনিশ্চয়তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্টাফটি ঠিকানা নিয়ে আসে। বালিগঞ্জ প্লেসের কাছে পণ্ডিতিয়া প্লেসেই তাঁর বাড়ি।

জীপ পণ্ডিতিয়া প্লেসে বিচারপতির বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তখন রাত পৌনে দশটা। কলিং বেলে হাত দিতে গিয়ে খানিকটা দ্বিধা হয়। এত রাতে বিচারপতিকে বিরক্ত করতে মনটা কেমন করে ওঠে। তবু নিরুপায়। বেল টিপতেই দরজা খোলে অল্প বয়েসি একটি ছেলে। আমি তাকে এত রাতে আসার উদ্দেশ্য জানাই। ছেলেটি ভিতরে ঢুকেই আবার ফিরে আসে। এরপর আমাদের ভেতরে বসতে বলে ছেলেটি। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপতে শুরু করল। একসময় সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে প্রধান বিচারপতি এ এন রায় সামনে এলেন। সুতির পাজামা, সাদা ফতুয়ার মত সুতির খাটো হাফ হাতা জামা। দেখে মনে হল, এইমাত্র ডিনার শেষ করেছেন। ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে কার্ড দুটি এগিয়ে দিলাম—স্যার, আজ দুপুরে নাম ভুল থাকার জন্য কার্ড দুটো দিতে পারি নি। ব্যাপারটা মনেই ছিল না তাঁর। খুব সহজভাবে কার্ড দুটি নিলেন। বেশ আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, কাল কি আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে? আজ তো সারাদিনই কেটে গেল এই অনুষ্ঠানে। বোধহয় কাল যেতে পারব না।

এরপর দু-চার কথা বলে আমি বিদায় নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত জীপে উঠে বসলাম। আমার সঙ্গী স্টাফ মোহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, দেখলেন স্যার, কত বড় উদার মন ওনার। ইচ্ছে করলে আজ সি এমকে জানিয়ে কত বড় ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারতেন।

এ রকম অনেক ঘটনার স্মৃতি জমে আছে আমার মনে। যেমন একটি টেস্ট ম্যাচের স্মৃতি। সেটা '৮০ কি '৮১ সাল হবে। সেবার একটা টেস্ট ম্যাচের টিকিটের ভীষণ দরকার হয়ে পড়ল। গ্র্যাজুয়েট বেকার ভাই টেস্ট দেখার আবদার করেছে। ইচ্ছে করলে একটি কমপ্লিমেন্টারি কার্ড যোগাড় করা কঠিন ব্যাপার নয়। সুযোগও ছিল।

কিন্তু সে সুযোগ নিতে আমার মন সায় দিল না। এদিকে ভাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে তাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেই হল। নানা ডিপার্টমেন্টে ছোটাছুটি, টেলিফোন করে হতাশ হতে হল। কেউ শুধু ভরসা দিলেন, কেউ সরাসরি করলেন দুঃখ প্রকাশ। এদিকে দিন এগিয়ে এল। আগের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু দৌড়াদৌড়ি আর ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে অফিস ছাড়ার মুখে একজন প্রবীণ সাংবাদিকের কাছে আমি প্রায় ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। ছোট্ট ভাইটি আশা করে বসে আছে।

রাত এগারোটা। বিষণ্ণ, পরাজিত মানুষের মত এবার ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু বাড়ি ফিরে অবাক। ভাই একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার দুটো কমপ্লিমেন্টারি কার্ড পাঠিয়েছেন। পর মুহূর্তে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন।

পরের দিনই কমিশনারের কাছে ছুটে গেলাম। স্বল্পবাক নিরুপম সোম মৃদু হাস্যে কিছুটা অনুযোগের সুরে বলে ওঠেন, টিকিটের ব্যাপারে বাইরের কারোর কাছে না বলতেই তো পারতেন। আমার কাছে সরাসরি এলেই হতো। হোয়াই আর ইউ শাই? বিনম্র শ্রদ্ধায় আমার মাথা নিচু হয়ে এল।

এ রকম অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে ছ' বছরের কর্মজীবনে। তবে সব থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটান ঘটে ছিল বছর কয়েক আগে। সকাল দশটা কি সাড়ে দশটা। গরমকাল। সবে অফিসে এসে ঢুকেছি। এমন সময়ই ক্রিং ক্রিং। ফোন ধরতেই ওপার থেকে ভেসে আসে এক মহিলার চটুল কণ্ঠস্বর, ইজ ইট প্রীতম?

বুঝতে পারলাম রং নাম্বার হয়ে গেছে। সে কথা জানাতেই মহিলাটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, হলই বা রং নাম্বার। আমি যদি প্রীতমকে না পেয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি, তাতে কি আপনার অবজেকশন আছে?

মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে কার না ভাল লাগে। তার ওপর ও রকম মোহময়ী আদুরে গলা।

আমি বললাম, না-না, অবজেকশন থাকবে কেন? এই তো কথা বলছি। বলুন ম্যাডাম, কি বলতে চান?

—চাই তো অনেক কিছুই, বাট হোয়্যার শ্যাল আই গেট্?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাই তোলার শব্দ ভেসে আসে।

—লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ টু ইউ। বলেই গড়গড় করে সবিস্তারে নিজের পরিচিতি বলতে লাগলেন। তবে আলাপের ধারা ক্রমে ক্রমেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। শুনে তো আমার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, ঝাঁ ঝাঁ করে কান। ঘৃণা মেশানো গলায় শেষ পর্যন্ত বলে উঠলাম, আপনি এত পারভারটেড কেন? এম এ পাশ করেছেন, ঘরে ইঞ্জিনীয়ার স্বামী। ছেলেমেয়ে, হ্যাপি ফ্যামিলি রয়েছে। কেন এভাবে একজন আননোন চ্যাপকে বিরক্ত করছেন?

—আহা হা। হোয়াই আর ইউ গেটিং সো ফিউরিয়াস মাই ডিয়ার?

ঝাঁ ঝাঁ করছে দু' কান। পারমিতা জিভ দিয়ে ঠোকা এক অশ্লীল শব্দ করেন। তারপর বলে ওঠেন, যে কোনদিন বেলা বারোটার পর এই ফোন নাম্বারে ডায়াল করতে, তাতে তিনি খুশিই হবেন।

তারপরই ফট করে লাইনটা কেটে যায়। কেমন যেন সন্দেহ হয় আমার। একসচেঞ্জ একশো সাতানব্বই—এ ফোন করে ওই ফোন নাম্বারের সত্যতা যাচাই করতেই জানা গেল ফোন নাম্বারটি ভুল। একটু বাদেই অপারেটার জানায় দু' বছর আগে ওই ফোনের নাম্বারটি মৃত। এবং তার মালিক সীতারাম ঝুনঝুনওয়ালা।

আরেকটি ঘটনা না বললে পাবলিক রিলেশন অফিসারের বৈচিত্রময় এবং মজার জীবনটি বোধহয় জানা যাবে না। একদিন এক স্কুলের কেরাণির মেয়ে এসে হাজির হল পি আর ও দপ্তরে। বাবা অফিস কামাই করে তাকে নিয়ে এসেছেন। পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম এ–র ছাত্রী, চায় পুলিশের অফিসার হতে। শ্যামবর্ণা, ছিপছিপে সপ্রতিভ চেহারার দীপান্বিতা। লম্বাটে গড়ন, সারা মুখে চাপা কৌতুক। তার অনেকদিনের ইচ্ছে কলকাতা পুলিশে মহিলা সাব-ইনসপেকটর হবে। সে ফর্ম নেবার জন্য সোজা চলে এসেছে লালবাজারে। কিন্তু মেয়েটিকে আশার আলো দেখাতে পারলাম না। বললাম, এখন সরাসরি এই পদে লোক নেওয়া হয় না। এর জন্য নাম সুপারিশ করে জেলা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র। সেখানে যোগাযোগ করলে ফল মিলতে পারে। এ কথায় কিন্তু দীপান্বিতার মন ভরে না। প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে তার মুখ। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, প্রতি বছর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে ডবলু বি সি এস পরীক্ষা হয়, তার 'বি' গ্রুপে পাস করলে যে কেউ সরাসরি ডি এস পি হতে পারে। দীপান্বিতা যেহেতু অনার্স গ্র্যাজুয়েট, সে সহজেই বসতে পারবে।

বাবা এবং মেয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরীক্ষার কোর্স, পরীক্ষার ধরন, বইপত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। শেষে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় নেয়।

এরপর নাটক জমে ওঠে। কদিন বাদে দীপান্বিতা একা চলে এল আমার অফিসে। আগের মত লাজুক নেই আর। পড়ার বিষয়ে নানা কথাবার্তা শুরু করে। তাকে কফি খাওয়ালাম। বিভিন্ন রকম আলোচনার পর বিদায় নিল সে।

কদিন পরেই ফের দীপান্বিতার আবির্ভাব। আবার কফি, আলোচনা, উপদেশ। দীপান্বিতা ভীষণ সুন্দর কথা বলতে পারে। একবার কথা আরম্ভ করলে থামতে চায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে বিদায় নেয়।

এরপর সপ্তাহে দু' দিন করে সে আমার কাছে আসতে লাগল। মুগ্ধ দুটি চোখে শুনতে থাকে আমার কথা। বেশ কিছুদিন যেতে না যেতে দীপান্বিতার চোখে মুখে ফুটে ওঠে অন্তরঙ্গতা। একদিন তো একটা সুদৃশ্য কলমই উপহার দিল আমাকে। এখন সে আর আপনি করে বলে না, তুমি করে ডাকে। দীপান্বিতা বলল, বাবা বাংলাদেশে গেছিলেন। তোমাকে দেবার জন্য এই পেনটা এনেছেন। দীপান্বিতা এবার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দুটো সিনেমার টিকিট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল, আজ লাইটহাউসে একটা ব্লো-হট ফিল্ম আছে। তুমি আর আমি দেখতে যাব।

মুহূর্তেই আগুন জ্বলে ওঠে আমার মাথায়। দীপান্বিতার স্পর্ধা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ি। কোনমতে নিজেকে সামলে টিকিট দুটো দীপান্বিতার হাতে ফেরত দিয়ে গম্ভীর মুখে বললাম, স্যরি। আজ বিকেলে যে আমার ওয়াইফের সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম আছে। দীপান্বিতার উজ্জ্বল মুখ হঠাৎই দপ্ করে নিভে গেল। থরথর করে কেঁপে উঠে বলে, তুমি, মানে আপনি ম্যারেড?

এরপর মাথা নিচু করে দীপান্বিতা ফিরে যায়। আর কোনদিনও একটি বারের জন্যও পর্দা তুলে সে বলতে আসেনি, প্লীজ, আবার এলাম...।

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেদিন দুপুরে হঠাৎ আমার দপ্তরে এসে হাজির হল ড্রাগ অ্যাডিকটেড এক মেয়ের বাবা। তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা, মেয়েকে বাঁচান। সর্বনাশা ড্রাগ ওকে শেষ করে দিচ্ছে।

একটি নামী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী তাঁর মেয়ে। কিভাবে যেন ড্রাগের কবলে পড়েছে। সুইসাইডের ভয় দেখিয়ে ড্রাগের পয়সা আদায় করে মেয়েটি। বাবা কান্নামাখা গলায় জানালেন, মেয়েকে অ্যারেস্ট করুন। অ্যারেস্ট করে আমাকে বাঁচান। ভদ্রলোককে সেদিন পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ডি সি ডি ডি'র কাছে। আর কোনদিক আসেন নি তিনি। এছাড়া এক তরুণ অধ্যাপক প্রেমের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে অ্যাডিকটেড হয়ে পড়েন। অধ্যাপনাসূত্রে একটি ছাত্রীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু মেয়েটি মালা দিল অন্যের গলায়। এই জ্বালায় নেশায় জড়িয়ে পড়েন। ফলে এক সময় চাকরিটি চলে যায়। একে একে সবাই তাঁকে ছাড়লেও সর্বনাশা ড্রাগ তাঁকে ছাড়েনি। আমি তাঁকে পাঠাই অ্যান্টি ড্রাগ সেলে।

বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। ডি সি হেড কোয়ার্টার্সের বীরেন্দ্র কুমার সাহা প্রমোশন পেয়ে ডি আই জি হয়ে চলে যাচ্ছেন রাজ্য পুলিশে। তাঁকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে। এ সি হেড কোয়ার্টার জে সি ভদ্র আমার আত্মীয়। তিনি আমার ওপর দায়িত্ব দিলেন, ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে একটা বিদায় সম্বর্ধনা লিখে দিতে। সেটা ভাল আর্ট পেপারে ছাপিয়ে ফেয়ারওয়েলের সময় বীরেন্দ্রবাবুকে উপহার দেওয়া হবে। অনুরোধ পেয়ে কাজে লেগে পড়লাম। তারপর জরুরী কল পেয়ে বেরিয়ে গেলাম রাইটার্সে। সেখানে মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করে লালবাজারে ফিরতেই চমকে উঠি। এ কি? লালবাজারে অ্যাম্বুলেন্স কেন? কাছে যেতেই মাথায় বজ্রাঘাত। জে সি ভদ্রকে ধরাধরি করে তোলা হচ্ছে। আজ দুপুরে মিটিং চলতে চলতেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। বি কে সাহার ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে বিদায়বাণী লেখা হল অনেকদিন পরে। তার আগে জে সি ভদ্রের শোকপ্রস্তাব লিখতে হয় আমাকে।

৯১ পৃষ্ঠায় দেখুন

লাখামণ্ডলের তরুণী

৩৭ পৃষ্ঠার পর

পাথরের চাঁই ফেলে, তার উপর কাঠের তক্তা ও লোহার পাত দিয়ে অন্য পারে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে এক সেতুবন্ধ। সেতুটি পেরিয়ে পরপর দুটি অর্ধ-বৃত্তাকার মোড়ের পর আসে 'কুবা'— জৌনসার বাওরের একটি ছোট বাস স্টপ। এখান থেকে মোটর যোগে জৌনসার বাওরের দিকে এগোলে, চোখে পড়ে রাস্তার দু'পাশে প্রকৃতির এক অপরূপ লীলাক্ষেত্র। পাহাড় ঘেরা পথটির দুধারের সবুজ বৃক্ষরাজি যেন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে আগন্তুক অতিথিদের।

পাহাড়ের এই আঁকা-বাঁকা চড়াই উৎরাই ভেঙে প্রবাহিত হয়েছে কল্লোলিনী যমুনা, আর অবিশ্রান্ত গতি পথের সাময়িক বিশ্রাম হিসাবে যেন বেছে নিয়েছে 'কুবা'র গিরি-সংকুল অঞ্চলকে।

বাস থেকে নেমে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৃষ্টিকে নিচের দিকে আরো প্রসারিত করলে মনে হবে, যমুনা তার কল্‌কল্‌ শব্দের মাঝে যেন এক রূপালি গালিচা বিছিয়ে অপেক্ষারতা, দর্শনার্থীর। যমুনার ওপারে তমসাচ্ছন্ন কুয়াশা ভেদ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত তিনটি পর্বতশ্রেণী অটাসু-ডাঁড়া, ছামরি-ডাঁড়া, সিগড়ি-ডাঁড়া। সবচেয়ে মাঝের পর্ব্বতশৃঙ্গ ছামরি-ডাঁড়া। এই ছামরি শৃঙ্গের উঁচু অঞ্চলের নাম 'লাখামণ্ডল'। জৌনসার বাওরের এই অঞ্চল ঘিরেই ছিল পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বিচরণক্ষেত্র। কথিত আছে এখানের 'জতুগৃহে' পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিল শত্রুপক্ষ কৌরবেরা। এক শ্রেণীর দাহ্য বৃক্ষ (লাক্ষা-জাতীয়) বেশি থাকায় এই অঞ্চলকে বলা হয় লাখামণ্ডল।

যমুনার এপারে আসার জন্য প্রথমে দু'ফার্লং রাস্তা পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে, তারপর ট্রলিতে চেপে যমুনার নীল জলের সমান্তরালে এসে তবেই এপারে পৌঁছলাম, ছামরি ডাঁড়ার পাদদেশের ছোট এক গ্রাম-ভটাড়ে। এর ভিতর দিয়েই দেড় কিলোমিটার জংলি রাস্তা ভেঙে তবেই পৌঁছনো যায় লাখামণ্ডলে।

যমুনার এপারে এসেই দেখি বড় শিলাখণ্ডের উপর মাথায় ঢাটু (স্কার্ফের মত মাথায় বাঁধার 'দোপাট্টা') ও ঢিলে জামা পরিহিতা এক পর্বতবালা নিবিষ্ট মনে জল ভরে চলেছে তার ঘড়ায়। মনে হলো প্রকৃতির নিস্তব্ধতার এক নির্বাক প্রতিচ্ছবি যেন। আমার ফোটোগ্রাফার তার ক্যামেরার সাটার টেপার আগেই মেয়েটি এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে, অপ্রস্তুত হয়ে ত্রস্তপায়ে দ্রুত এগিয়ে যায়, নিজের গ্রাম ভটাড়ের দিকে।

ভটাড় হয়ে ছামরি ডাঁড়ার দেড় কিলোমিটার দুর্গম ঢালু রাস্তা পেরিয়ে লাখামণ্ডলে পৌঁছতে পৌনে পাঁচটা বেজে যায় আমাদের ঘড়িতে। তখন সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে একঝাঁক কাল মেঘের সঙ্গে পাহাড় ঘেরা এই অঞ্চলের বুকে ছেয়ে আছে ধোঁয়াশার এক গভীর আস্তরণ।

পনের ষোলটি পরিবার নিয়ে ছোট্ট গ্রাম লাখামণ্ডল। এখানে যেমন উচ্চবর্ণের মানুষের বাস তেমনি রয়েছে হরিজন সম্প্রদায়ও। হরিজনদের জন্য পর্বতের পাদদেশে সংকীর্ণ নালা ও খানা-খন্দে ভরা বস্তি এলাকাই নির্দিষ্ট। গ্রামটির যে অংশে হরিজন ও উচ্চবর্ণ এলাকার সীমানা মিলেছে, সেখানে আছে জীর্ণ এক প্রাচীন শিব মন্দির। স্থানীয় ভাষায় এই মন্দির 'মহাসু দেবতার'। মন্দিরটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি। এই সুপ্রাচীন মূর্তিগুলির সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ছোট এক সংগ্রহালয়ও রয়েছে এখানে। সরকারি চৌকিদারের প্রহরায় সুরক্ষিত সেটি। এই 'মহাসু দেবতা'র মন্দিরের উঁচু চত্বরে দাঁড়িয়ে, বামদিকে চোখ ফেরালে এক লহমায় দেখে নেওয়া যায়, সিগড়ি ডাঁড়ার পর্বত চূড়া। সিগড়ি ডাঁড়া ও ছামরি ডাঁড়ার সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছে এক ঝুলন্ত গভীর খাদ। এই খাদটির পাশ বরাবর একটি সংকীর্ণ নালার দু'পাশে স্থানীয় হরিজনদের শষ্যক্ষেত্র।

আমাদের খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না স্থানীয় হরিজন নেতা মঙ্গতরামের ঘর। সৌভাগ্যক্রমে মঙ্গতরামকেও ঘরেই পাওয়া গেল। অপরিচিত আগন্তুক অতিথিদের প্রতি মঙ্গতরাম ও তার পরিবারের অকৃপণ আতিথেয়তা আমাদের শহরবাসী মানুষকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। পাহাড়ি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি দ্বিতল ছাদ-বিশিষ্ট মঙ্গতরামের বাড়িটি ততোধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। সাধারণত এই রকম বাড়িই বেশি দেখা যায় পাহাড়ি এলাকাগুলিতে। কাঠের দেওয়াল, কাঠের ছাদ, এমনকি কাঠের মেঝে—এক কথায় 'কাঠ-ঘর' বললেই বোধহয় সঠিক করে বলা যায়। তবে এগুলি তৈরি করা খুব সহজসাধ্য নয়, আর সেজন্যই পাহাড়ের ঢাল ভেঙে মানুষের শ্রমসাধ্য পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণকে সাধুবাদ জানাতে হয়। আজকাল অবশ্য এই ঘরগুলির পাহাড়ি সহজ সৌন্দর্যের পাশে কিছু কিছু বর্ণশ্রেষ্ঠদের কিছু পাকা বাড়িও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

জৌনসার বাওর ও 'খাই জৌনপুর'—এর বিস্তৃত এলাকা উত্তরপ্রদেশের যে তিনটি জেলার অংশগুলিকে একত্রিত করেছে, সেগুলি হল দেরাদুন, উত্তরকাশি ও গাড়োয়াল। এই বিশাল অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছে এক হাজারেরও বেশি গ্রাম, যাদের সম্মিলিত জনসংখ্যা আনুমানিক দু'লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই নিম্নবর্ণের কোল্টা ও হরিজন শ্রেণীর। আর বাকি ১০ শতাংশ উচ্চবর্ণের মহাজন শ্রেণীর মানুষ। হরিজনদের মধ্যে কোল্টা, বাজগি, ডোম, জোগড়া, ওজী, হরকীয়া, রুরীয়া, তমোটা, ঢালিয়া প্রভৃতি বর্ণের মানুষ, আর উচ্চবর্ণের মধ্যে রাজপুত এবং ব্রাহ্মণরাই সংখ্যাগরিষ্ট।

ইতিহাসের বিরাট সাক্ষ্যের চিহ্নিত স্থান জৌনসার বাওর ও খাই জৌনপুরের বিরাট পার্বত্য এলাকা। শোনা যায়, এখানকার অঞ্চলগুলিতে

লাখামণ্ডলের একটি গ্রাম

বিচরণ করে গেছেন মহাভারতের পাত্র-পাত্রীরা। মহাভারতের সময়-কালে যেমন দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীগ্রহণ কিংবা অর্জুনাদি অনেকের বহুপত্নী গ্রহণের যে দৃষ্টান্তগুলি রয়েছে, সেগুলোকে ঐতিহ্য মনে করে একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়েও এখানকার মানুষেরা আকছার চালিয়ে যাচ্ছে অন্ধ কু-সংস্কারবাহী প্রথাগুলিকে। প্রাধান্য দিয়ে বসেছে বহু পত্নী বা বহু পতি গ্রহণের কুপ্রথাগুলিকে। অথবা বলা যেতে পারে বহুবিবাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে ব্যাভিচার। আর তারই গন্ধে গন্ধে এসে পৌঁছেছে নারী ব্যবসার দালালের দল।

আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগে নারী ব্যবসার প্রথম শিকার গুনাটি নামের এক পর্বতবালা। সেই থেকে আজও এই জৌনসার বাওর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সহজলভ্যা পাহাড়ি সুন্দরীদের 'স্বর্ণ-খনি' হিসাবে। এখানে কখনই 'কমতি' হয় না সুন্দরী নারী শরীরের। এই সব জৌনসারি যুবতীদের প্রায়শই দেখা পাওয়া যায় শহরের বিভিন্ন গণিকালয়গুলিতে। যেমন, রাজধানী দিল্লির জি. বি. রোড, কলকাতার সোনাগাছি, বম্বের ফকল্যাণ্ড এরিয়া, লক্ষ্ণৌ-র দালমণ্ডি, আগরার কিনারি বাজার, সাহারাণপুরের বেশ্যালয়ে। এই পাহাড়ী কন্যাদের দেহ সুষমার চাহিদাও ব্যাপক, দেহ-পিপাসুদের কাছে। আর তাই যৌবন কুসুমিত তরতাজা ফুলগুলি দেশীয় গণিকালয়ের নরকে থেকে রোগগ্রস্ত জীর্ণ হয়ে শেষে ফিরে আসে আপন গাঁয়ে, পরিণত বয়সের জীর্ণ খাঁচাটিকে নিয়ে। লাখামণ্ডলের বাসন্তি, ছীপা ও বিসুলা এরকম ভাবেই নিজেদের দেহসুধা বিলিয়ে দিয়ে আজ প্রাক্তনের দলে। এখন আর দেহ বিকিকিনির কোন পথ খোলা নেই। নিজের গ্রামে ফিরে এসে তাই অর্থ উপার্জনের নতুন পথ ধরে। নিজেদের স্রোতের সামিল করতে চায় অল্প বয়সের নিত্যনতুন পাহাড়ি বালিকাদের। তাদের পয়সার লোভ দেখিয়ে শহরের পঙ্কিল আর্বতে ঠেলে দেয়। আর নিত্য-নতুন শিকার ধরার ফাঁদ নিয়ে শহুরে দালালদের নিয়মিত যাতায়াত থাকে এই প্রাক্তন গণিকাদের কুঠিতে। তারা প্রাক্তনদের কাছে নতুন শিকারের সন্ধান পেয়ে তাকে টেনে নিয়ে তোলে শহরের দেহ-ব্যবসার বাজারগুলিতে। যদি কোন পর্বতবালাকে স্থানীয় সেই 'প্রাক্তনা' ব্যবসায় নামাতে বিফল মনোরথ হয়, তবে সেই দালালের দল মেয়েটির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবে। সেখানে তার বাবা-মা কিংবা ভাই বোনের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার প্রতিদানে অনাহারী অর্ধাহারী মানুষগুলোর সামনে রাখবে অর্থের 'টোপ'। দু'বেলা দু'মুঠো যারা খেতে পায় না, তাদের কাছে সামান্য অর্থও তখন লটারি প্রাপ্তির সামিল। সমস্ত বিবেকবোধ ভুলে মেয়েটির বাবা-মা এই ভেবে সান্ত্বনা পাবে যে, মেয়ের পরিবর্তে তো কিছু অর্থ পাওয়া গেল, যার সাহায্যে আরো কিছু দিনগুজরানের রসদ তো মিলবে। বিবাহিত পর্বতবালার স্বামী পুঙ্গবেরাও অনুরূপ চিন্তাধারার সামিল হয়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে দালালদের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। সে তো জানে এই এলাকায় 'কনের' অভাব নেই। আর্থিক সংকুলান থাকলে বিয়ে করার জন্য পাওয়া যাবে হাজারো মেয়ে। এই সব মানুষেরা নিজেদের একান্ত পরিজনের দিকে এরপর একবারও ফিরে তাকাবে না। বেশ্যালয়গুলিতে তাদের মেয়ে, কিংবা স্ত্রীরা বুভুক্ষু লালসার শিকার হয়ে কামার্তদের নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে টুকুরো টুকরো হয়ে যাক, তাতে তাদের আর কিছু করার থাকবে না।

লাখামণ্ডলের ছীপা যখন ষোল বছরের সদ্য যুবতী, তখনই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মীরাট শহরের কবাড়ী বাজারে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের ভোগ-তৃষ্ণা মিটিয়ে 'সিফিলিস' ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য যৌনরোগের শিকার হয়ে অবশেষে পরিত্যক্ত হয় সেদিনের ষোড়শী ছীপা। আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছীপাকে আবার সেই লাখামণ্ডলের আপন ডেরায় ফিরে আসতে হয়। দেহ ব্যবসায়ের পুঁজি হিসেবে তখনও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়েই সে ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় তৈরি করে। এখন তারি একলার সংসারের শেষ সাথী—দুটো পাহাড়ি ছাগল আর বাড়ির সামনের এক ফালি ছোট ক্ষেত। বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে দশ বছরের বেশ্যাবৃত্তির চাওয়া পাওয়ার ঘরে কেবলই শূণ্যতা আর নিঃসঙ্গতা।

'প্রাক্তনা' দেহপসারিণী কমলা

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল : জনৈকা জৌনসারী তরুণী

ছীপারই মতো লাখামণ্ডলের আরও এক পর্বতবালা বাসন্তী দিল্লির জি.বি.রোডের রেড লাইট জোনে পৌঁছে যায় মাত্র পনের বছর বয়সে। পৌঁছে যায় বলার চেয়ে পৌঁছে দেওয়া হয় বলাটাই বোধহয় অধিকতর শ্রেয়। কারণ সামান্য কিছু টাকার জন্য স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করাতে পাঠায় বাসন্তীরই স্বামী ছমকু, মহাজনের ঋণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। দেহ বিক্রির মাসোহারা প্রাপ্তির লোভে প্রিয়তমা পত্নীকে সাধারণ্যে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না সে। দালালদের হাত থেকে পাওয়া নগদ অর্থ থেকে দেনা শোধ হল মহাজনের। কিন্তু বাসন্তী কি ফিরে আসতে পেরেছিল আপন সংসারে? না। কারণ একবার বেশ্যাবৃত্তির কালোছাপ লেগে গেলে সভ্য সমাজে ফেরার সমস্ত পথ ওতপ্রোত বন্ধ হয়ে যায়। তবু শেষবারের আকুল প্রার্থনা নিয়ে ফিরে এসেছিল বাসন্তী। কিন্তু 'মা' বলে ডেকে জড়িয়ে ধরার জন্য কোন সন্তান তো তার ছিল না। আর ইতিমধ্যেই ছমকু নতুন সংসার বসিয়েছে। তাই প্রত্যাখ্যাতা বাসন্তী আগের সেই দেহ-ব্যবসায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল নিজেকে।

এরপরের মেয়েটির নাম বিসুলা। অবাক লাগলেও সত্যি, এই বিসুলাই ছমকুর দ্বিতীয় পক্ষের 'ধর্মসাক্ষী' করা স্ত্রী। বাসন্তীকে দেহ

ব্যবসায় নামিয়েও আশ মেটেনি ছমকুর অর্থ প্রাপ্তির লোভ। অগত্যা বিসুলাও নেমে এলো লাল বাতির নিষিদ্ধ এলাকায় আরও এক বারবিলাসিনী হয়ে। কিন্তু এতেও অর্থ প্রাপ্তির 'স্বর্ণ' সম্ভাবনা'–কে পরিতৃপ্ত করতে পারে না ছমকুর মতো পুরুষেরা। তাই বাসন্তী ও বিসুলার পর আবার পরপর দুটো বিয়ে করে সে কিছুদিন তাদের শরীরের স্বাদ 'চেখে' নিয়ে পাঠিয়ে দেয় নরকের সাম্রাজ্যে। সহজ, সরল পতিব্রতা পাহাড়ী কন্যারা স্বামীর চাহিদা মেটাতে নিজেদের উৎসর্গ করে শহুরে বাবুদের আকাঙ্খার যূপকাষ্ঠে।

শুধু মাত্র ছীপা, বাসন্তী, বিসুলাই নয়, এমনি অনেক কোল্টা যুবতীই একের পর এক নেমে এসেছে শহরের অন্ধগলির বুকে। পাহাড়ি নেশায় মাতাল করেছে শহুরে কন্দর্পদের। তারপর একদিন ফুরিয়ে যায়।

নিজেদের জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ছীপা, বাসন্তী কিংবা বিসুলাদের নির্মম স্বীকারোক্তি: 'জৌনসারী যুবতীদের কি পরিচয়? তারা শুধু বাবুদের চোখে নেশা ধরানোর এক পেয়লা শরাব। যতক্ষণ পেয়ালাতে পানীয় থাকবে, ততদিন 'বাবুরা' আমাদের নিজেদের কাছে টানবে, আর শরাব খতম হতেই ফেলে দেবে 'গন্ধি নালায়'।'

লাখামণ্ডলের গরীব হরিজন বেলমুর তিন মেয়ে–তুকলা, দৌলতী আর পুলসী। মেজ মেয়ে দৌলতীই সবচেয়ে সুন্দরী তন্বী। তার ডাগর চোখের অনেক ভাষাই সরল মনের আড়ালে ঢাকা থাকে। যৌবন কুসুমিত দৌলতী আপন মনে পাহাড়ের এধার-ওধার ছুটে, নেচে, ঘুরে বেড়াত চপল ময়ূরীর মত।

মেয়ের সৌন্দর্য্যে গর্ব অনুভব করত বেলমু। মনে মনে ভাবত, আর কটা দিন পরে দৌলতীকে যখন শহরের বাবুদের কাছে তুলে দিতে পারবে, তখন আর কোন দুঃখ কষ্টই থাকবে না। অনেক পয়সা আনবে ও। অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আনন্দে চিকচিক করে ওঠে হরিজন বেলমুর দু'চোখ।

লাখামণ্ডলে 'মউজ ও মস্তী' নেওয়ার জন্য ঘন ঘন আসত সাহারাণপুরের রায় বাহাদুর শেঠ মনোহর লালের এক খানসামা। হঠাৎ-ই একদিন তার চোখ পড়ে গেল তন্বী দৌলতীর দেহবল্লরীর দিকে। আর যায় কোর্থায়! মনে মনে রায় বাহাদুরের জন্য উপঢৌকন দেওয়ার পরিকল্পনাও ফেঁদে বসল রায় বাহাদুরের প্রিয় খানসামাটি। আর ভাবা মাত্রই কাজ। দৌলতীর সৌন্দর্য্যের ছবিখানির এক নিটোল বর্ণনা করে বসল রায় বাহাদুরের কাছে। লালসায় দু'চোখের দ্যুতিই পালটে গেল তার। অনেক দিন তাজা যুবতীর সঙ্গে রাত কাটান নি রায় বাহাদুর। পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে তাই নিজেই রায় বাহাদুর সরাসরি পৌঁছে গেলেন গরীব হরিজন বেলুমর পর্ণ কুটিরে। দৌলতীকে তার বাবার কাছ থেকে সওদা করে নিলেন মাত্র ২০০ টাকায়। দু'শ টাকা গরীব বেলমুর কাছে গুপ্তধন পাওয়ার সামিল। কারণ গলায় ফাঁসের মতো এঁটে বসেছে তার মহাজনের দেনা। তারই পরিণামে কামতৃষ্ণার উত্তম খোরাক

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ভূতপূর্ব মন্ত্রী গুলাব সিং–এর স্ত্রী

হিসাবে দৌলতী চলে গেল সাহারাণপুরের বাগানবাড়িতে, রায় সাহেবের রক্ষিতা হিসাবে।

রায় সাহেব দৌলতীর কথা জানতে দিলেন না তার স্ত্রীকে। আর তাই স্ত্রীর অলক্ষ্যে বাগানবাড়িতে চলতে লাগল তার গোপন নিশি-অভিসার। কিন্তু রায় সাহেব শুধু দৌলতীর রূপতৃষ্ণার স্বাদ নিয়ে ক্ষান্ত হননি। তিনি দৌলতীকে লেখাপড়া শিখিয়ে 'মর্ডান' করে, তার অন্যান্য ইয়ারবক্সীদের মাঝেও মুখ বদলানোর জন্য ব্যবহার করতে লাগলেন তাকে। আর সময় বিশেষে নিজের ব্যবসার খাতিরেও অপরিহার্য হয়ে উঠল দৌলতীর যৌবন সুষমা। দৌলতীর সাহায্যে ইয়ার দোস্তদের সহযোগীতায় রায় সাহেবের 'ধনভাণ্ডার'ও ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। তাই বোধহয় দৌলতীর নতুন নাম দেওয়া হল কমলা।

কিন্তু কমলা আগে ভাগেই আঁচ করতে পেরেছিল তার আগাম পরিণাম। আর তাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে রায় সাহেবের জীবিত অবস্থায়ই কিনে ফেলে লাখামণ্ডলের নিকটবর্তী গ্রামে এক সুরম্য কোঠাবাড়ি।

রায় সাহেবের মৃত্যু হল ১৯৫৬ সালে। মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নতুন বাড়িতে এসে উঠল কমলা ওরফে দৌলতী। ততদিনে সে বিগত যৌবনা। তাই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকলেও এক বিরাট নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে ফেলল দৌলতীকে। কারণ সমাজে সে পরিত্যক্তা।

শুধু মাত্র লাখামণ্ডলই নয়, ওর আশপাশের গ্রামগুলি গুটাড়, ধৌরা, পনকোট, ছাওরী, দতরৌটা, ভটাড়, ঘানপুর, পুরৌলা–প্রভৃতি সব গ্রামের পর্বতবালারা একের পর এক শিকার হয় শহুরে দালালদের পাতা ফাঁদে। একমাত্র দিল্লির জি বি রোডেই রয়েছে এমন ১৮০ টি পাহাড়ি তরুণী।

জৌনসার বাওর ও খাই জৌনপুরের নির্মল, নিষ্পাপ পর্বতবালাদের বেশ্যালয়ে পৌঁছে যাওয়ার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল স্থানীয় উচ্চবর্ণের মহাজনদেরও। তাদের বংশানুক্রমিক শোষণ হরিজনদের মেরুদণ্ড কখনোই সোজা হতে দেয় নি। নিরুপায় মানুষগুলো নিজেদের রুটি- রুজির জন্য মহাজনদের হুকুমের দাস। আর সেই থেকে শোষণরাজের কাহিনীরও সূত্রপাত। উচ্চবর্ণের মহাজনশ্রেণীরা তাদের ও হরিজনদের মধ্যে রচনা করল ভেদাভেদের চরম সীমারেখা। এমন কি পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলগুলি, যেখানে সংকীর্ণ নদী, নালা ও অনুর্বর জমি রয়েছে, সেখানেই স্থায়ী ঠিকানা মিলল গরীব হরিজন প্রজাদের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত মানসিকতা বা সাহস তাদের ছিল না, কারণ যারা দু'মুঠো দু'বেলা নিজেদের দানা-পানি জোগাড় করতেই হিমসিম খায়, তাদের মেরুদণ্ড কি স্বাধীনতার ভার নিতে সক্ষম?

আর ফলস্বরূপ মহাজনদের 'কলুর বলদ' হিসাবে ঘানি টেনে যেতে লাগল দুস্থ এই সব পাহাড়ি হরিজনের দল। একসময় মহাজনদের সামনে জুতো পায়ে দিতে পারত না তারা। ঘোড়ায় চড়লে তো কোন কথা নেই। চাবুকের ঘায়ে পিঠে কালসিটে দাগ পড়ে যাবে। তাই সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত এই নিপীড়িত হরিজন কোল্টা সম্প্রদায়। মহাজনদের কামকেলীর উপঢৌকন হিসাবে সহজেই ব্যবহৃত হতে লাগল তাদের ঘরের সুন্দরী মেয়েরা।

স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরে এখন অবশ্য হরিজনেরা আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মহাজনদের শোষণের ট্রাডিশান সমানে চলেছে। গোলামীর মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেও, বাঁধন অত সহজে ছেঁড়ার নয়। এখনও আড়ালে-আবডালে হরিজন যুবতীদের নিয়ে ইয়ার-বন্ধুদের মাঝে চলে নিশিবিলাস। তবুও অত্যাচারিত ও শোষিত হয়েও ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছে হরিজন আদিবাসি ও কোল্টা সম্প্রদায়। উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই খাতে ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রিয় বাজেটে নির্ধারিত হয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে সরকারি প্রয়াস সত্বেও আজও কেন অবহেলিত রয়েছে এরা? কিংবা সরকারি আমলা প্রশাসনের নাগাল এড়িয়ে কতদূর বাস্তবায়ন সম্ভব কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার, তা বলার অপেক্ষা রাখে। আর তারই ফলশ্রুতিতে অনাহারের জ্বালা মেটাতে দেহ-ব্যবসায় নামতে হচ্ছে হরিজন ঘরের মেয়ে, বউদের। একমাত্র এই দেহ ব্যবসাতেই দরকার হয় না কোন মূলধন।

১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ দফা কর্মসূচীর ঘোষণায় একবার সোচ্চার হয়েছিল সরকারি প্রশাসনযন্ত্র। তোড়জোড় হয়েছিল হরিজনদের পুনর্বাসনেরও। তারই সক্রিয়তার ঢেউ এসে পড়ে জৌনসার বাওর ও খাই জৌনপুরের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতেও। সরকারি হিসেব মত গত দশ বছরে হরিজন উন্নয়ন ও পুনর্বাসন খাতে ব্যয় হয়েছে এক কোটি টাকা।

কিন্তু এতসব সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যেও চলেছে হরিজন শোষণ। পুনর্বাসন প্রাপ্ত হরিজনেরা মহার্জনদের 'চক্ষুশূল' হয়ে উঠেছে। দাওলা গ্রামের হরিজন লবীরাম সরকারি অনুদান হিসাবে পেয়েছিল ৬-৭ একর জমি। হঠাৎ একদিন লবীরামের জমিতে দেখা দিল এক অগভীর জলের ফোয়ারা। লবীরাম খুশী। সেচের জন্য তার জলের অভাব হবে না। কিন্তু কানে কানে খবর গিয়ে পৌঁছল উচ্চবর্ণের মহাজনদের কাছে। তড়িঘড়ি

ছুটে এলো তারা। ঘটনার সত্যতা যাচাই করে লবীরামকে বলল, 'তোমার জমিতে জলের যে ফোয়ারা দেখা দিয়েছে, সেটি মহাসু দেবতার দান। আর জানোই তো দেবতাদের দান একমাত্র আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠরাই গ্রহণ করতে পারি। সুতরাং ওই জমি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেই বোধহয় তোমার মঙ্গল, নচেৎ সবংশে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু লবীরাম রুখে দাঁড়ালো। প্রাচীন সংস্কারের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সে আর মানবে না। কিন্তু লড়াকু মনোভাবের পরিণামে মহাজনের অত্যাচার চলতেই থাকল। কেউ এগিয়ে এলো না সহানুভূতিতে। শেষে ওই জমি আর তার ভাগ্যে জোটেনি। মহাজনেরা তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।

গুণাড় গ্রামের কলী বাজগী (বাদ্যকর) লেখাপড়া শেখার জন্য স্কুলে পাঠায় তার একমাত্র সন্তান গিরধারীকে। পাছে লেখাপড়া শিখে মহাজনদের কারচুপি ধরে ফেলে, এই ভয়ে মহাজনদের এক পাণ্ডা এসে কলী বাজগীকে বলল, 'গিরধারী লেখাপড়া শিখলে তোর বাদ্যকরের পেশায় যে ছেদ পড়বে রে, কলী। ওকে পড়াশুনা না শিখিয়ে বরং তোর সঙ্গে 'ঢুলি' করে নে।'

মহাজনের কথা অমান্য করেও স্কুলে পাঠাল তার একমাত্র ছেলেকে। পরিণাম আবার সেই। মহাজনের পেয়াদারা ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করে আধমরা অবস্থায় ফেলে গেল কলী বাজগীকে। বিশ শতকের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোন মা-বাবা তার সন্তানের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা জানালে পরিবর্তে জোটে মহাজনের অত্যাচারের চাবুকের কালসিটে দাগ!

এমনি ভাবে একের পর এক অত্যাচারিত হয়ে চলেছে হরিজনেরা। উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব আবগারী মন্ত্রী গুলাব সিং-এর স্ত্রী, যিনি ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় থাকাকালীন হরিজন সেবার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও হরিজন অত্যাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিনি নাকি হরিজনদের অশিক্ষার সুযোগে তাদের কয়েকজনের জমি আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগ আরো অনেক ক্ষেত্রেও। হরিজন রমণীদের বেশ্যাবৃত্তি নিরুপদ্রব করার জন্য 'ঘুষ' চাইতে দ্বিধাবোধ করে না স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও।

লাখামণ্ডল নিবাসী স্থানীয় হরিজন নেতা মঙ্গতরাম ম্যাট্রিক পাস করেছেন। বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য হিসাবে যদিও দু'টি বিবাহ করেছেন, তবুও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন মঙ্গতরাম। এমন কি বেশ কয়েকটি হরিজন পরিবারের মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি করার প্রতিবন্ধকও হয়েছেন তিনি। মহাজনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তাকে বড় রকমের মাশুল গুনতে হয়। তাঁর 'ডান হাত' বলে কথিত প্রিয় সঙ্গী পুরীকে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে হত্যা করে রেখে যায়। তবুও ভেঙে পড়েন নি হরিজন নেতা মঙ্গতরাম।

জৌনসার বাওরের উন্নয়নের জন্য যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের অন্যতম দেরাদুনস্থিত নেহরু যুব সংঘের পরিচালক অওধেশ কুমার কৌশল।

সরল জীবনযাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে বিষ

এ ছাড়া সাংবাদিক নবীন নটিয়াল, পংকজ প্রসুন, ভরত ডোগরাও যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন হরিজনদের সাহায্যে।

এত সবের মাঝেও দেহ ব্যবসা থেকে সরিয়ে আনা যায় নি জৌনসারী পর্বতবালাদের। কারণ অনেক অভাবী পরিবারেই মেয়ে হল কল্পবৃক্ষের মত।

নারী শরীরের বিকিকিনিতে পিছিয়ে নেই দেরাদুনও। এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের এক সুন্দর পাহাড়ি অঞ্চল-ডাকপত্থর। এই ডাকপত্থরের পাশেই জন বসতি পূর্ণ ব্যস্ত এক লোকালয়-বিকাশ নগর। দেহ-ব্যবসার দালালের দল এখানেই রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। আশপাশের অঞ্চল ঘিরে বেশ কয়েকটি 'আড্ডাখানা' তাদের নিয়মিত শিকার ধরে আনার বাঁধাধরা জায়গা। মাঝে মধ্যে এখান থেকে মেয়ে পাচার করা হয় ভারতের বাইরেও।

দিল্লির জি.বি. রোডের 'রেড লাইট' এরিয়ার এককালের নামজাদা গণিকা মক্ষীরানী চন্দ্রকলা, এই বিকাশ নগরে এক বিরাট হোটেল খুলে বসেছে। তার নিজের নামের ঐতিহ্য ধরে আছে হোটেল 'চন্দ্রলোক'। দিনের বেলার পানভোজনের এই হোটেল রাতের আঁধারে হয়ে ওঠে, জৌনসারী যুবতীদের দেহব্যবসার প্রশিক্ষণকেন্দ্র। কখনও বা চলে তাদের অশালীন প্রশিক্ষণ। আর এই হোটেলে প্রশিক্ষণ শেষে যুবতী নারীরা শিখে ফেলে নানাবিধ উত্তেজক 'কাম-কলা'। পরবর্তী সময়ে তারা জাঁকিয়ে বসে দিল্লির জি.বি. রোড, আগ্রার কাবাড়ি-বাজার সহ দেশের বিভিন্ন বেশ্যালয়গুলিতে।

চন্দ্রকলা নিজেও এককালে দেহব্যবসায় বিপুল প্রসার জমাতে পেরেছিল রাজধানী দিল্লিতে। এখনও তার পরিচয় বহন করে জি.বি. রোডের 'চাঁদ বিল্ডিং' স্থিত এক বিরাট 'ফ্ল্যাটবাড়ি'। সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে কম পক্ষে ৪০ জন জৌনসারী পর্বতবালাকে। এদের কাছ থেকে কমিশন বাবদ চন্দ্রকলার কাছে পাঠানো হয় মাসিক ১০,০০০ টাকা। নারী ব্যবসায় প্রধান দালাল হিসাবে 'চন্দ্রকলা'র মতই রীতিমত বেড়ে চলেছে চন্দ্রকলার পশার প্রতিপত্তি।

দেহব্যবসায় নিত্য-নতুন মেয়ে আমদানী করে বিকাশ নগরে বিশাল পরিমাণে জমি কিনে রেখেছে মহেশ ও ভুরী। মহেশ বেশ্যাদের অভিজ্ঞ দালাল, তার নিয়মিত যাতায়াতের 'আখড়া' সাহারাণপুরের বেশ্যালয়ে। ভুরীও পিছিয়ে নেই, সহজ সরল জৌনসারী পর্বতবালাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে একে একে টেনে আনছে এই পাপ-ব্যবসায়।

এইসব নারী-দালালদের 'আড্ডাখানা' নিয়ে এক সময় সোচ্চার হয়েছিল সাংবাদিক নবীন নটিয়ালের বলিষ্ঠ লেখনী। ১৯৮৪-র 'বামা' পত্রিকার জুন সংখ্যায় তাঁর কলমের আঁচড়ে নগ্ন করে দেখিয়েছিলেন প্রাক্তন গণিকা চন্দ্রকলার হোটেল 'চন্দ্রলোকে'র অপকীর্তিগুলিকে। ফলস্বরূপ নবীন নটিয়ালের উপর হামলা করে চন্দ্রকলার ভাড়াটে গুণ্ডারা। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তিনি। পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনার ইতিবৃত্ত জানান। কিন্তু কোন ফল হয় না। পরন্তু তাঁর নামে মানহানির মামলা আনেন চন্দ্রকলার এক কথিত 'উপপতি' এস.এস. চৌহান। 'বামা' পত্রিকা ও নবীন নটিয়াল 'স্টে অর্ডার' নিয়েছিন এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে। বর্তমানে মামলা 'পেনডিং ট্রায়ালে'।

নবীন নটিয়াল ছাড়াও জৌনপুরী যুবতীদের দেহব্যবসার দালালদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন পুরৌলার এস.ডি.এম. শ্রী কে.কে পনথ। ১৯৭১-এ একদিন হঠাৎই তিনি হানা দিয়ে বসেন দিল্লির জি.বি. রোডস্থিত বেশ্যালয়ে। তার আচমকা হানায় ১৩২ জন যুবতীকে দেহব্যবসা থেকে মুক্ত করে আনা সম্ভব হয়। তাদের সবাইকে নিজ নিজ পরিবারে পাঠিয়ে দেন এস.ডি.এম. শ্রী পনথ।

কিন্তু কয়েকজনের একক প্রয়াসে এই পাপ-দেহব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ সাময়িক 'রেড' করে ঘরে পাঠানো জৌনসারী যুবতীরা আবার কিছুদিন পরে দালালদের খপ্পরে পড়ে চলে আসে 'রেড লাইট' এরিয়ায়।

সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে এর জন্য সোচ্চার হতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক বিধি ব্যবস্থায় উচ্ছেদ করতে হবে জৌনসারী যুবতীদের ধরে আনা দালাল-আড্ডাগুলিকে। সরকারি অনুদান, পুনর্বাসন দিয়ে লাখামণ্ডলসহ জৌনসার বাওর ও খাই জৌনপুরের দু'লক্ষাধিক হরিজনদের দাসত্বের শৃঙ্খলকে মোচন করার প্রয়াস করা উচিত।

যতদিন পর্যন্ত মহাজনদের ঋণের 'নাগপাশ' থেকে হরিজন ও কোল্টা সম্প্রদায় বেরিয়ে আসতে না পারবে, ততদিন দেহব্যবসার দালালেরা নিয়মিত পেয়ে যাবে তাদের শিকারগুলি-সুন্দরী জৌনসারী পর্বতবালা। কৈশোরের সোনা ঝরানো দিনগুলিতে যেখানে তাদের দুরন্ত হরিণের মত পাহাড়ী এলাকাকে প্রাণ চঞ্চল ও মুখরিত করে রাখার কথা, সেখানে তাদেরকেই কিনা বাবা-মা, স্বামীদের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য রুজি-রোজগারের জন্য উঠে আসতে হয় দেশের বিভিন্ন গণিকালয়গুলিতে। রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারী আমলারা কি উত্তর দিতে পারবেন-কবে জৌনসার বাওর, খাই জৌনপুরের হরিজন ও কোল্টা সম্প্রদায়ের তমসাচ্ছন্ন জীবনে দেখা দেবে সূর্যের মুখ?

ছবি: রবি বাটরা

আসানসোল : কাল শহরের মাফিয়ারা !

বাংলার শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র কয়লাশহর আসানসোল। একদিকে ভারি শিল্প অন্যদিকে কয়লাখনির সুবাদে রাজ্য অর্থনীতিতে এখানকার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এই রমরমা অবস্থার সুযোগে এখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ক্রাইম-র‍্যাকেট। যেহেতু পাশেই ধানবাদ, ঝরিয়া, সিন্ধ্রী, বোকারো ইত্যাদির মত শিল্পাঞ্চল, সেজন্যই ওখানকার মাফিয়াচক্রের ছায়া এসে পড়ে এখানকার ক্রাইম-র‍্যাকেটের উপরে। সরজমিনে কাল শহর ঘুরে এসে আমাদের দুই প্রতিনিধি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস মহাপাত্র সেইসব অন্ধকার দুনিয়ার অজানা কাহিনীর দিকে আলোকপাত করেছেন।
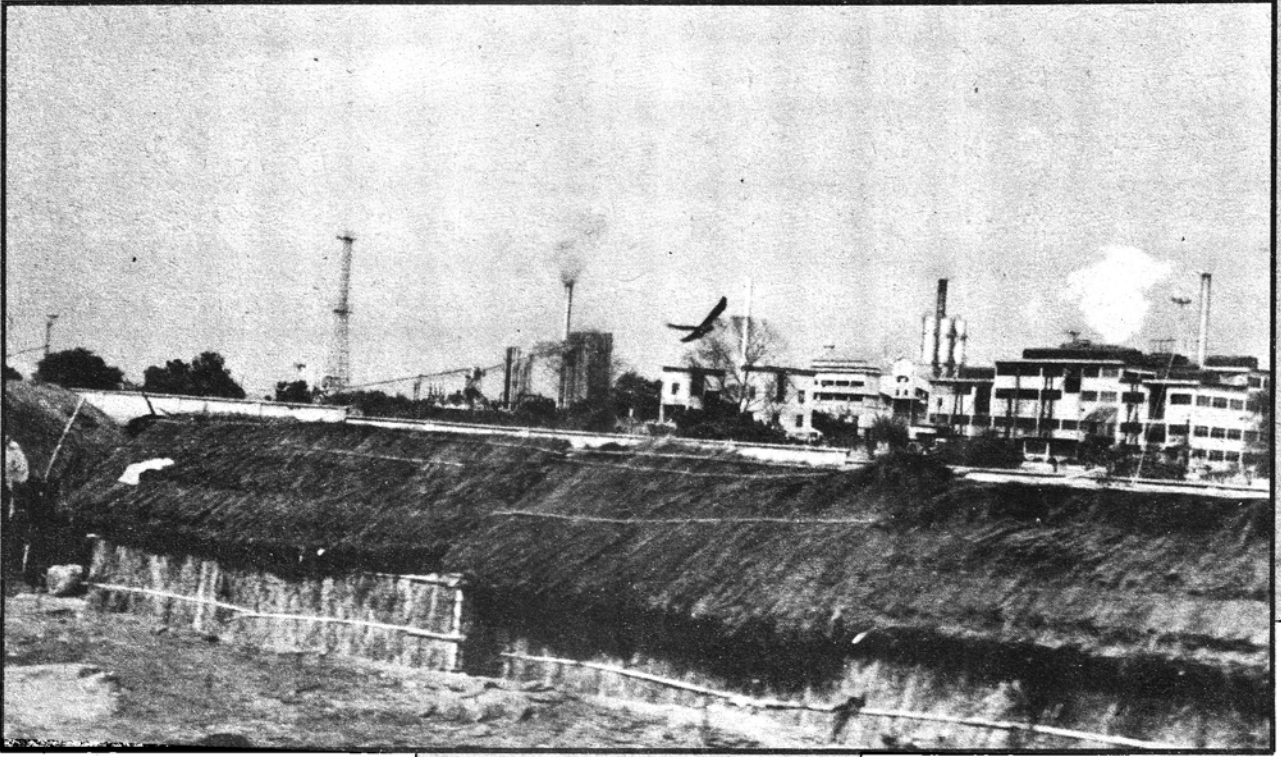
রাজনৈতিক পোস্টার সাঁটা আধভাঙা পোড়া ইঁটের দেওয়াল। ওই ভাঙা দেওয়াল টপকে ওপাশের মচকন্দ ফুলের গাছের নিচেই বৃদ্ধা রামনাইনের ডেরা। পুলিশের গুলি খেয়ে এই দেওয়াল টপকে পালানোর সময়ই মারা গিয়েছিল ঝালপুড়িয়া। গাছটির নিচে ছাইয়ের গাদা থেকে ছাই তুলে রামনাইন দাঁত মাজতে যাওয়ার সময় ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। উঠোনে তখন রামনাইনের মেজ ছেলে ফুচিয়া শীতের রোদ পোয়াতে পোয়াতে বারো ইঞ্চি ভোজালির ডগাটি টালির ওপর ফেলে সমানে সান দিচ্ছে। কথা শুনে দুটো লাল দগদগে চোখে এক পলক তাকিয়ে ইশারায় সামনের খাটিয়াতে বসতে বলে টালি ছাওয়া বাটামের নিচ থেকে আধ বোতল দেশি মদ প্রায় ঢকঢক করে গলায় ঢালল। চারদিকে বিদঘুটে মদের গন্ধ। পিছনে মহিষের খাটাল থেকে ভনভন করে উঠে আসছে মাছি। সান দেওয়া ভোজালির এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'বলুন, কাকে...'

ঠিক তক্ষুণি বছর ছাব্বিশের এক তরুণ ছুটে এসে কানে কানে কি বলায় ফুচিয়া কোন কথা না বলেই লুঙ্গিটিকে ভাঁজ করে পাঁচিল টপকে উধাও হয়ে গেল। ফুচিয়ার গুরু ঝালপুড়িয়া। রামনাইন ওকে ভালভাবেই চেনে। দু বছর আগে সে ছিল পুরো আসানসোল আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্রিমিনালদের গুরু। আফতার নামে স্টেশন পাড়ার একজন দাগী ওয়াগন ব্রেকার বলছিল, 'ঝালপুড়িয়ার ঘরেই মাল বোঝাই ওয়াগন চলে যেত। আর মেহনত করে ওয়াগন ভাঙার দরকার হত না তার।' ঝালপুড়িয়ার কাছে প্রায় দশ বছর শিষ্য হয়ে কাজ করেছে আফতার।

বারো বছর বয়েসে মা'র হাত ধরে বাপে খেদানো চাঁদুলাল ওরফে ঝালপুড়িয়া বিহার থেকে প্রথমে আসে কনস্তুরিয়ায়। তারপর বছরখানেক বাদেই ওরা বর্তমান ট্রাফিক কলোনির কাছেই বাসা নিয়ে থাকতে শুরু করে। একদিন বৃষ্টিমুখর রাতে বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলে ঝালপুড়িয়া দেখতে পায় পাশে মা নেই। অন্ধকারে হাতড়াত হাতড়াতে পাশের ঘরে জানলার চট সরিয়ে দেখে টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় মেঝের ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মা এবং একজন বছর চল্লিশের পুরুষ গড়াগড়ি দিচ্ছে। অসীম ক্রোধে দরজার হুড়কো দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে দুজনেরই মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল, সেই থেকে তার অপরাধজীবন শুরু।

শুধু আসানসোল নয়, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, বার্নপুর—এই বিশাল এলাকায় ঝালপুড়িয়ার নাম শোনেনি এমন কেউ এখনও মায়ের পেটে। এ কথা রামনাইন জোর গলায় বলে। সাদা জট পাকানো চুল কানের ওপর থেকে সরিয়ে একটি
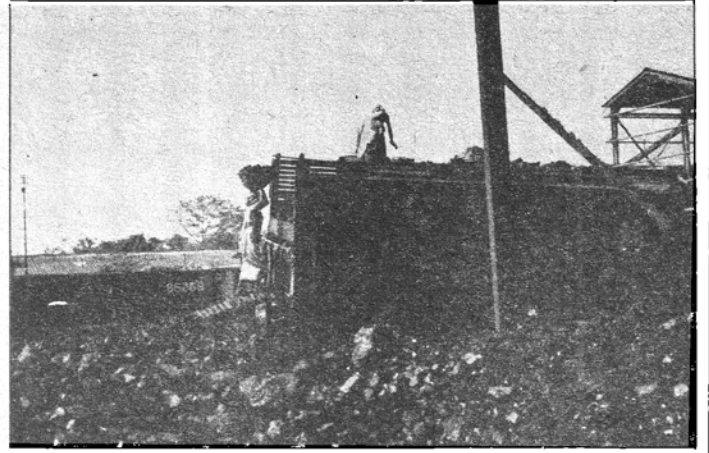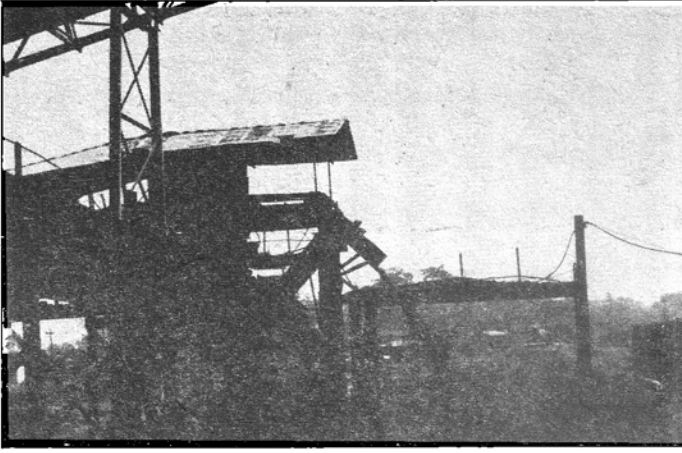
কোলিয়ারীর জগৎ

কয়লার বেআইনী পাচার

লম্বা মৌরি-বিড়িতে আগুন ধরাতে ধরাতে হাত বাড়িয়ে পেছনের দিকে ভাঙা টালির ছাউনি দেখিয়ে রামনাইন বলে, 'উধার সন্তোষ চৌধুরিকা খুপরি । শালা মাইয়া আদমি ।'

'কি করেছে ও ?'

'ছেলে জন্ম দিয়ে খাওয়াতে পারবি না তো বউর সঙ্গে শোয়া কেন । শালার মাত্র দুটো ছেলে, তাই খাওয়ানোর খেমতা নেই ! নিজের হাতে সাত মাসের মাইয়াকে গলা টিপে রেখে দিল । ওয়াগন ভাঙ, কয়লা পাচার কর ! তাও যদি না পারিস, তো জুয়ান বউকে ভাড়া দেরে শালা...'

শেষ যৌবনে ঝালপুড়িয়ারও রাতের ডেরা ছিল রামনাইনের ঘর । নির্দিষ্ট কোন ডেরা ছিল না, পুরো কালো শহরটাই তার ঠিকানা । মাঝে মাঝে পুলিশের তাড়া খেয়ে কিংবা জেল ভেঙে টাটা অথবা মোগলসরাইতে আশ্রয় নিতে পালাত । ঝালপুড়িয়া পুলিসের হাতে শেষবার ধরা পড়েছিল '৭৬-এর আগস্ট মাসে লচ্ছিপুরের বেশ্যা পল্লিতে ।

ঝালপুড়িয়ার হাতে তৈরি কুখ্যাত বিভীষিকা হিসেবে আসানসোলের আন্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ল্ডের যারা প্রথম সারির তাদের মধ্যে কানাই আব্বাস, গুড়িয়া, সজ্জন, লালা সোলেমান, ফুচিয়া, কল্লোল, খুন্টি, আফতার, ছটুয়া, কাটা ইসমাইল, ফেঁড়া, ভটুয়া, সুখিয়া, বানুলাল–এইরকম প্রায় জনা চল্লিশের নাম করা যায় । এদের মধ্যে কেউ হয়তো বাবু সাবু কেতা দুরস্ত মানুষ হিসেবে দিনের আলোয় ঘুরে বেড়ায় । কারুর হয়তো পদাধিকারও আছে । ঝালপুড়িয়ার ছাত্ররা এখন বিভিন্ন পাড়ার দায়িত্বে । একটি একটি এলাকা নিয়ে এদের রাজত্ব । সেই আসানসোল থেকে দুর্গাপুর এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে এদের রমরমা বাজার । এদের সকলেরই অবশ্য কোড নাম আছে । আসানসোল অপরাধ জগতের বর্তমান গডফাদার আফতারের কোড নাম মহাবীর । অর্থাৎ মহাবীর কোলিয়ারির মাল আদায়ের দায়িত্ব তার । ঝালপুড়িয়ার গুরুদক্ষিণা ছিল একটি কুড়ি বাইশ বছরের ফর্সা যুবতী ।

১৯৬৮ সাল, ১৩ নভেম্বর রাত একটার সময় ঝালপুড়িয়ার কাছে খবর আসে, আর কুড়ি মিনিট বাদেই সীতারামপুর থেকে ওয়াগন ভর্তি কয়লা পাঞ্জাব যাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ জনের একটি দল নিয়ে গোটা আটেক লরি সমেত কাজোড়ায় উপস্থিত হলো । সবুজ সিগন্যালের বাতি সরিয়ে ওখানে বসানো হলো লাল কাগজ মোড়া বাতি । ট্রেন এসে থামতে নিমেষেই ঝালপুড়িয়ার তিনবার জ্বলে ওঠা লাল টর্চের ইঙ্গিতে গার্ড সমেত অন্যান্য চালকদের মুখ বেঁধে ছুঁড়ে দেওয়া হল পাশের জঙ্গলে । রাতারাতি আট লরি বোঝাই কয়লা পাচার করা হলো বাংলাদেশে । এক একটি ইনকামের পর ঝালপুড়িয়ার সুন্দরী যুবতীর প্রয়োজন হয় । সেদিন সন্ধ্যায় বার্ণপুর থেকে তুলে আনা হল বিশাখা নামে এক তুখোড় যুবতীকে । আড়াই বোতল রাম গেলার পর সে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

রামনাইনের মরদ অরাফত ছিল মাফিয়াদের কয়লা-খোঁড়ার শ্রমিক । রানীগঞ্জ আর কালিপাহাড়ীর মাঝামাঝি যে ধসে পড়া বাড়িটি দেখা যায়, ওখানেই সি.আই.এস.এফ–এর গুলিতে মারা যায় সে । সেটা '৮৩–র ডিসেম্বর মাসের ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত ।

আমলাসোতা কালভার্টের কুখ্যাত সমাজবিরোধী ছটুয়ার কথা হল–'একটি মানুষের দাম ষোল টাকা ।' একটি দেশি মদের বোতল পেলে কথা মত পুরুষই হোক কিংবা নারীই 'গ্যারেজ' করে দেওয়াটা ঝালমুড়ি খাওয়ার মতো ব্যাপার । ছটুয়া বলে, 'গুরুর আদেশ আছে, কাজে নামার আগে ধর্ষণ করতে হয় । মেয়ে শরীরের ছোঁয়ায় শক্তি বাড়ে ।'

এ অঞ্চলে রামনাইনের দিকে নজর দেওয়ার মত কারুর সময় নেই ঠিকই । কিন্তু রামনাইনের কাছে আসানসোলের কালো চেহারাটি একদম পরিষ্কার । দিন ও রাতের এই শহর যেন পৃথিবীর এপিঠ ওপিঠ । সে বলে, 'ইয়ে কালা শহর মদ, মাগী আউর জুয়াকে লিয়ে বানায়া গিয়া ।' রামনাইনের মরদ অরাফত ছিল মাফিয়াদের কয়লা-খোঁড়ার শ্রমিক । রানীগঞ্জ আর কালিপাহাড়ীর মাঝামাঝি যে ধসে পড়া বাড়িটি দেখা যায় ওখানেই সি আই এস এফ-এর গুলিতে মারা যায় সে।সেটা '৮৩–র ডিসেম্বর মাসের ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। গুড়িয়ার নেতৃত্বে প্রায় ষাট সত্তর জনের একটি দল নিয়ে কয়লা খোঁড়া চলছে।বেআইনী প্রান্তর কেটে। কাজ চলছে হ্যারিকেন জ্বেলে। চারটি লরি ভর্তির পর পঞ্চম লরিটিতে কয়লা তোলা সবে শুরু হয়েছে এমন সময় কিভাবে যেন গোয়েন্দা অফিসাররা টের পেয়ে যায় । দলবল নিয়ে পুলিশ পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলায় গুড়িয়ার দল প্রকাশ্য গুলি গোলায় নামে । সে সময়ই অরাফতের মৃত্যু । গুড়িয়ার বাঁ-পা গুলিতে জখম । এফোঁড় ওফোঁড় অবস্থায় কোন রকমে গা ঢাকা দেয় সে । এই ঘটনার পর '৮৪-র ৫ জানুয়ারি বাড়ি ময়দানে বার্ণপুর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর রবি লোচন নাথ এবং আরও দুজন কনসটেবলকে খুন করা হয় । রবি লোচন সেই সময় মাফিয়াদের এক নম্বর শত্রু হয়ে ওঠার প্রধান কারণ ছিল ইসকোর মাল পাচারের প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়ানো । রবি লোচন নাথ খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বিধায়ক বামাপদ বলেন, 'এই গণ্ডগোলের পেছনে আছেন ইসকোর এক শ্রেণীর অফিসার, যার কন্ট্রোল রুম হচ্ছে ইসকোর গেস্ট হাউস ।'

মচকন্দ ফুল গাছটির নিচে রামনাইন দুটি
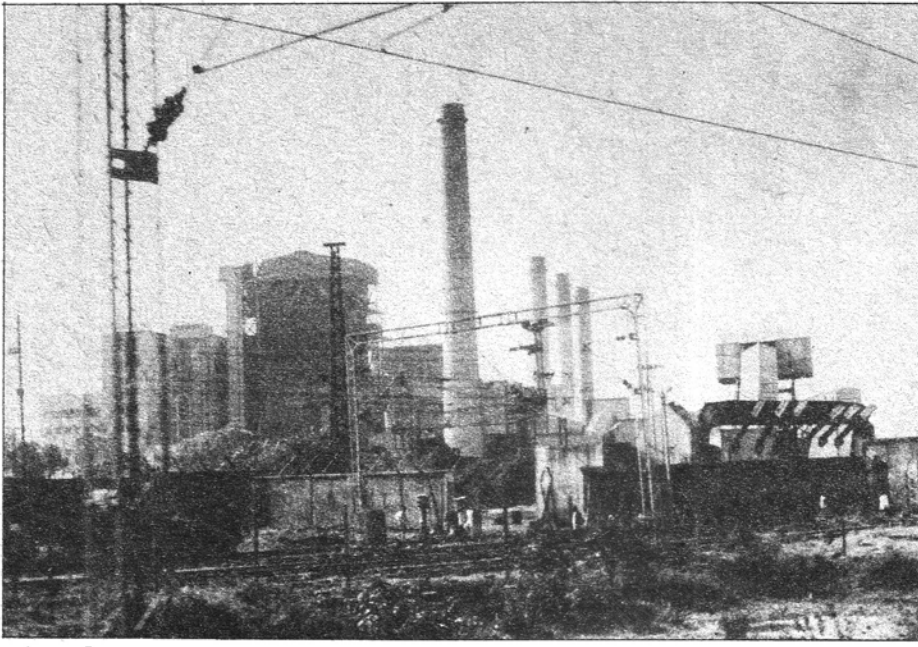
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

সাদা গরু বেঁধে মুখের সামনে ঘাসের ঝুড়িটি বাড়িয়ে দিচ্ছিল। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই শীতও জমতে শুরু করেছে আসানসোলে। এমন সময় পাঁচিল টপকে ওর ঘরে ঢুকল আব্বাস। রামনাইন চিৎকার করে বলল 'কোন মাগীর গলা কেটে ঢুকলি ?' হরিপুর, নবকাজোড়া, পরাশকোল এলাকার কুখ্যাত খুনি আব্বাস। সে ওয়াগন ভাঙতেও সিদ্ধহস্ত। লুঙ্গির ওপর লাল কালো ডোরা কাটা গেঞ্জি। সইকত ওরফে আব্বাস বার্ণপুরের এক বস্তি বাড়ির ছেলে। তখন তার বয়স কুড়ির কাছাকাছি। বাবা মারা যাওয়ার পর একমাত্র বোন খালেফাকে বিয়ে দেওয়ার কোন রকম সামর্থ ছিল না। '৭১-এর ১৪ জুলাই, ভিটেবাড়ি বন্ধক রেখে রেজিস্ট্রি অফিসে বোনের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট দিনে ফি জমা দেওয়ার পর বেআইনী কালো হাতের চাপে আরও প্রায় সাতশ' টাকা ঘুষ দিতে হয়। কিন্তু তাতেও আব্বাস পার পায়নি। তারপরই পাড়ার তিন মস্তান এসে দাবি করে ওদের একদিনের মাল খাওয়ার টাকা দিতে হবে। কিন্তু সে দাবি মেটানোর মতো সামর্থ না থাকায় তার চোখের সামনে খালেফাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় টানতে টানতে পাশের একটি কাঠের দোকানের মধ্যে নিয়ে যায়। এরপর আব্বাস নিজেকে সামলাতে না পেরে একটি চেরা কাঠের ফালি দিয়ে খালেফার শরীরের ওপর চেপে থাকা মস্তানটির মাথায় সজোরে চালিয়ে দেয়। ফিনকি দেওয়া রক্তে অপর দুজনের চোখ মুখ ভেসে যায়। আব্বাসের সেই প্রথম খুন। কয়েকদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর ঝালপুড়িয়ার আড্ডায় আশ্রয় মেলে। ওখানেই আব্বাসের সঙ্গে আলাপ হয় আসানসোলের অপরাধ-জগতের মক্ষীরানী কুস্তুরাঙ্গর। সুডৌল চেহারা, টানা ভ্রু, চাপা ঠোঁট আর উজ্জ্বল দুটি চোখ নিয়ে সুন্দরী কুস্তুরাঙ্গ বুক জোড়ার উচ্ছলতায় যে কোন পুরুষকে নিমেষেই আবেশবিহবল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু রূপ যৌবন নয়, আসানসোল রানীগঞ্জ দুর্গাপুরের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডে সে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। পুলিশের খাতায় যার নামগন্ধটিও নেই, অথচ বেআইনী কয়লা সাপ্লাই-এ জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না তার। অথচ বছর পাঁচেক আগেও লচ্ছিপুরের বেশ্যা-পল্লীতে পাঁচ টাকার বিনিময়ে সে গতর খাটিয়েছে। ঘর ভাড়া, মাসি, মস্তানদের ইনকামের ৫ পার্সেন্ট করে দিতেই রাতের টাকা ফুরিয়ে যেত। তাই কষ্ট করে একের পর এক পুরুষের সঙ্গে শোয়ার চেয়ে অন্য কোনভাবে জীবিকার সন্ধান করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে এই পথে পা বাড়ায়।

ঝালপুড়িয়ার দীক্ষা নির্দেও গুড়িয়ার উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত নাটকু এই কালা অঞ্চলের বর্তমান 'শেরদের' গুরু। স্থানীয় দুটি লোকের হত্যা-ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশ গুড়িয়ার লচ্ছিপুরের বেশ্যা পল্লীতে লুকিয়ে থাকার খবর পায়। ভ্যান ভর্তি পুলিশ বেশ্যা পল্লী ঘিরে ফেলার পর আসানসোল থানার ও সি বর্ধন চৌধুরি দুই অফিসার সমেত ঘরবন্ধ ঝুম্পাবাঈর কুঠরিতে আঘাত করলে ঝুম্পাবাঈ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দরজা খোলে। অপ্রস্তুত অবস্থায় সৌজন্য পরায়ণ ও.সি ও দুই অফিসার মুখ ফেরাতেই গুড়িয়া ছুটে পালাতে যায় এবং পুলিশের গুলিতে মারা পড়ে। তারপর গুড়িয়ার আসন পূরণ করে নাটকু। চিত্রা সিনেমার পাশেই তার ডেরা। গত ১৩ জুলাই চিত্রা সিনেমায় সবে শুরু হয়েছে ইভনিং শো। কে বা কারা অন্ধকার হলের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে আসে সদ্য বিবাহিত এক মহিলাকে। কালো রাজার ঘরোয়া উৎসবের উপযুক্ত নারীর শয্যাটি পুষিয়ে নেওয়ার জুলুম স্বরূপ এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। তারপর শেষ রাতে অতি অত্যাচারে মূর্ছা যাওয়া মেয়েদের কোন চলন্ত ট্রেনের ওয়াগনে ফেলে আসে নির্ভর-যোগ্য সাকরেদরা। তারা কি নাটকুর কেউ ?

মাল পাচার করার মতো কাঁচা টাকার ব্যবসার লোভ পুলিশ মহলেও দেখা গেছে। '৮৪র ১৬ আগস্ট, টাকা নিয়ে বেআইনীভাবে কয়লা পাচারে সাহায্য করতে গিয়ে আসানসোল থানার তিনজন পুলিশ শেখ আফতার, নীরোদবরণ মিশ্র ও শেখ জামালুদ্দিন সি আই এস এফ-এর হাতে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে একটি লরিও প্রাইভেট কার আটক করা হয়। ই সি এল জানায় এই পুলিশ দলটি তালপুকুরিয়া ফাঁড়ির। ঘটনার দিন সিরমিল্ট বেআইনী কোল ডিপো থেকে হরিশংকর মিশ্রের বি এইচ জি ৫৩৮৩ নম্বর লরিতে কয়লা নিয়ে যাওয়ার সময় কাল্লা মোড়ে সাদা পোশাক পরা ওই তিনজন পুলিশ ডব্লিউ বি জে ৩০২৫ নম্বর প্রাইভেট গাড়িতে এসে লরিটিকে আটকায় এবং মোটা টাকার দাবি করে। অন্যথা গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়। এই সময় হঠাৎই অফিসার ইনচার্জ বি এন খারকওয়ালের নেতৃত্বে কর্মরত সি আই এস এফ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পড়ে। সন্দেহবশত তারা কয়লা ভর্তি লরিটিকে দেখতে গেলে তিন জন সাদা পোষাক পরা পুলিশকে চিনতে পারে। চালক ও খালাসি সি আই এস এফকে ১৬ আগস্ট

আসানসোল থানার ও সি চন্দ্রশেখর মুখার্জি

গত ১৩ জুলাই চিত্রা সিনেমায় সবে শুরু হয়েছে ইভনিং শো। কে বা কারা অন্ধকার হলের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে আসে সদ্য বিবাহিত এক মহিলাকে। কালো রাজার ঘরোয়া উৎসবের উপযুক্ত নারীর শয্যাটি পুষিয়ে নেওয়ার জুলুম স্বরূপ এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। তারপর শেষ রাতে অতি অত্যাচারে মূর্ছা যাওয়া মেয়েদের কোন চলন্ত ট্রেনের ওয়াগনে ফেলে আসে নির্ভরযোগ্য সাকরেদরা। তারা কি নাটকুর কেউ ?

-এর কনস্ত্রুয়ার উত্তর সিয়ারসোল কোলিয়ারির ১৬১ কুইন্টাল স্টিম কয়লার ২৫৩৫৮ নম্বর চালান দেখালে অনুসন্ধান করে জানা যায় চালানটি নকল।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্রিমিনাল ও মাফিয়া চক্রের নায়কদের তীর্থস্থল হলো শ্রীপুর এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড, সোনাচোরা থেকে অণ্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর থেকে কাজোড়া। রেল অফিসে তদ্বির করতে আসা প্রাইভেট কনট্রাকটর অবিনাশবাবু বলেন, 'সরকার সি আই এস এফ নামে আলাদা একটি প্রোটেকশন ব্রাঞ্চ খোলায় অত খোলাখুলিভাবে স্মাগলিং না হলেও, হরিপুর, নবকাজোড়া, পরাসকোল এইসব জায়গায় ওয়াগান ব্রেকারদের ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণ আছে।' অবিনাশবাবু তার অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ দিচ্ছিলেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। ইসকোর প্রাইভেট লাইন মোহিসিলা কলোনি ও আমবাগানের মাঝামাঝি ডামপার দিয়ে ওয়াগন ভর্তির কাজ সবেই শুরু। ৮৮টি ওয়াগন ভর্তি কয়লার শেড নিয়ে বেনারস কনজিউমারের কাছে পাঠানোর কথা ২৭ সেপ্টেম্বর। হঠাৎ একটি আপাত ভদ্রস্থ লোক এসে বলল, 'ডাম্পারগুলি দিয়ে আগে আমাদের লরিতে দুশ টন কয়লা ভর্তি করো।' কিছুটা হকচকিয়ে অবিনাশবাবু কিছু বলতে গেলে পাশের জঙ্গলের দিকে ইশারা করতে অবিনাশ দেখে দশটি তরতাজা বোমা নিয়ে শুধু দশটি হাত বের করানো। আর কোন কথা নয়। ওদের লরিতে দুশো টন ভর্তি করার পর নিজের ওয়াগনের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। অসহায় অবিনাশ একান্তে কপাল চাপড়ায়। আর সরকার ?

রামনাইন ছটুয়ার কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। ছটুয়া ডাঙাল সাঁতামোরিয়া এলাকার নাম করা খুনী। রামনাইন বলছিল, ছটুয়া একসময় খুব ভাল লোকই ছিল। ওর মেয়ে গঙ্গাবাঈকে খুব ভালবাসতো। হঠাৎ কোন এক বিহারি ছোকরা গঙ্গাবাঈয়ের মাথা ঘুরিয়ে চম্পট দেয়। তারপর আর কোন খবর নেই। ছটুয়া বলতো—'মা-জী এই আসানসোলে থাকতে আর ভাল লাগে না। শুধু খুনখারাপি, মদ, সাট্টা-জুয়া, মাগী আর ডাকাতিতে এই শহরটা ভরে গেল।'

রাধানগর রোডের একটি বাড়িতে ছটুয়ার দল হানা দিলে ছটুয়ারই এক সাকরেদ ঐ বাড়ির একটি মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করতে থাকায় ছটুয়া তার গলা ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। মেয়ে শরীরের প্রতি তার কোন লোভ নেই। পাড়ার যে কোন মেয়ে তাই নির্দ্বিধায় ছটুয়ার কাছে আসে। বিপদে আপদে আর্জি জানায়। ছটুয়ার বিশ্বাস মেয়েরা হল পবিত্র ফুল। তাকে জয় করতে হলে ভালবাসতে হয়। ভালবাসার পুণ্য দিয়েই সমস্ত অপরাধের পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এখনও সে মাঝে মধ্যেই গঙ্গাবাঈয়ের নাম করে বিড়বিড়িয়ে বকে। তার বিশ্বাস, একদিন তার কাছে ফিরে আসবেই তার বেটি। গঙ্গাবাঈয়ের কথা মনে পড়লে গলাভর্তি মদ ঢেলে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ছটুয়া। তখন তার সামনে কেউ এতটুকু বকবক করলেই মেজাজ খাট্টা

রামনাইন, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী
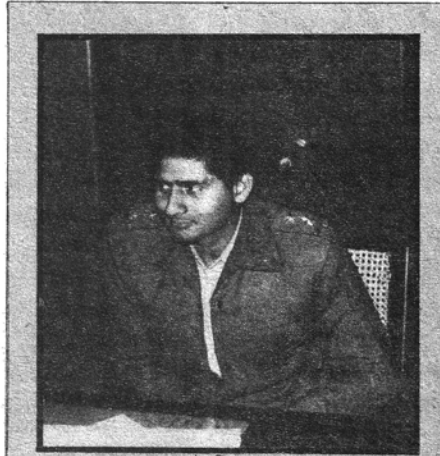
এস আই মি, মহাপাত্র

আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্রিমিনাল ও মাফিয়া চক্রের নায়কদের তীর্থস্থান হলো শ্রীপুর এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড, সোনাচোরা থেকে অণ্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর থেকে কাজোড়া। রেল অফিসে তদ্বির করতে আসা প্রাইভেট কনট্রাকটর অবিনাশ বাবু বলেন, 'সরকার সি. আই.এস.এফ.নামে আলাদা একটি প্রোটেকশন ব্রাঞ্চ খোলায় অত খোলাখুলিভাবে স্মাগলিং না হলেও হরিপুর, নবকাজোড়া, পরাসকোল এইসব জায়গায় ওয়াগান ব্রেকারদের ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণ আছে।

হয়ে যায় ছটুয়ার।

রামনাইনকে ওয়াগন ভাঙার কথা জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়, অণ্ডাল স্টেশনে যাও প্রকাশ্যেই দেখতে পাবে।

অণ্ডাল হল সারা ভারতের অন্যতম বৃহৎ রেল-ইয়ার্ড। অণ্ডাল স্টেশন থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড এই আট কিলোমিটার এলাকা নিয়েই অণ্ডাল-ইয়ার্ড। চাল চিনি থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড় ইত্যাদি নানান বিলাসদ্রব্যের ওয়াগন ভর্তি জিনিসপত্র এখান থেকেই দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচিলহীন অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় আর.পি.এফ না থাকায় লরি, জীপ ভর্তি লুটের মাল নিয়ে লুটেরার দল ফাঁকা পথে বেরিয়ে যায়। দুর্গাপুর স্টেশনে সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশের ৩৪০ ডাউন রাঁচী বর্ধমান প্যাসেঞ্জারেই দেখা যাবে বগি বোঝাই বড় বড় লোহার চাঁই।

কালো শহরের বিকিকিনির নারীরা কিন্তু আদৌ কালো নয়। বরং তাদের চোখ ধাঁধানো জৌলুষ তাদেরই জীবনের কালো প্রহরগুলি সহজেই ঢেকে রাখে। লচ্ছিপুরে অন্যতম আকর্ষণীয়া যুবতী দেহপসারিণী যমুনাবতী প্রথমের দিকে মুখ খুলতে না চাইলেও অনেক সাধাসাধির পর বলে, প্রায় বছর আপ্টেক আগে বিহারের একটি গ্রাম থেকে ঝালপুড়িয়ার খিদে মেটানোর জন্য তাকে চুরি করে আনা হয়েছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে ফেরার থাকার সময়ে তাকে দেখে ফেলেছিল ঝালপুড়িয়া। আসানসোলের অপরাধ জগতের এ হলো আরেক নিয়ম। এক সময় লচ্ছিপুরের বেশ্যাপল্লীর গণিকা হবার 'নথ' খোলা হত ঝালপুড়িয়ার কঠোর শরীরে। এখন সেই অধিকার নাকি ঝালপুড়িয়ার অন্যতম শিষ্য আফতারের হাতে। আসানসোল আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্রিমিনালের সবচেয়ে বড় রঙীন হাত হল কুস্তুরাঈ। প্রয়োজন

হলে সে যে কোন পুরুষের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় কোমর দোলাতে পারে। ১৯৮৫-র ১৭ ফেব্রুয়ারি আফতারের নির্দেশে অণ্ডাল রেল-ইয়ার্ডে কস্তুরাঈকে পাঠানো হল। একটি হালকা আকাশি রঙের নাইটি পরেই কস্তুরাঈ পাঁচজন প্রহরাদারের সামনে দিয়ে এমন ভাবে হেঁটে গেল, তাই দেখে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পাঁচজন পাহারাদার কস্তুরাঈকে অনুসরণ না করে পারলো না। একটু অন্ধাকারে যেতেই কস্তুরাঈ ওদের মধ্যে একটিকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু দিতেই অপর চারজন হুড়মুড় করে তার ওপর পড়ল। নগ্ন-নারীর নেশায় মশগুল পাঁচ প্রহরীকে তখন আচমকা পিছন থেকে আফতারের সাকরেদরা ধরে তাদেরই পোষাক খুলে চোখ মুখ হাত পা বাঁধা অবস্থায় আটকে রাখল। আর পাঁচ ক্রিমিনাল সেই পোষাকে আর পি. এফ. সেজে নির্ধারিত রেল শেডের কাছে পাহারা দিতে থাকে। ততক্ষণে অদূরে জঙ্গলের আড়ালে গাছপালা দিয়ে ঢাকা সাতটি লরি হেড লাইট বন্ধ অবস্থায় চালু করা হয়েছে। মিনিট কুড়ির মধ্যেই তারপর সাতটি চাল ভর্ত্তি লরি ফাঁকা মাঠ দিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে গেল। এ ঘটনা আসানসোলের জনৈক রিকসাঅলার কাছে শোনা। যে এক সময় ভাগ্য বিপাকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

শুধু আফতারই নয়, আসানসোলের যে কোন ক্রিমিনালই চাইলে কস্তুরাঈয়ের কাছে শরীরের আশ্রয় পেতে পারে। তার জন্য দরকার প্রচুর টাকা আর আফতারকে উপেক্ষা করার তাকৎ। কারণ কালো মানুষদের মহল্লায় দুদলের রেষারেষি ও তাঁর পরিণাম তো ওপেন-সিক্রেট। তবে পুলিশের তাড়া থাকলে আফতারের নির্দেশে যে কোন ক্রিমিনালের বউ সেজে দূরে কোথাও ডেরা বাঁধায় সাহায্য করতে হয় কস্তুরাঈকে। অবশ্য যদি তারা আফতারের সাকরেদ হয়।

আসানসোল অপরাধ জগতের প্রত্যেকটি ক্রিমিনালই যেন এক একটি পরিবারের। এদের মধ্যে অদ্ভুত সমঝোতা ঝালপুড়িয়ার জীবিত অবস্থায় দেখা যেত। এখন অবশ্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে দু-তিনটে দলে ভাগ হয়ে গেছে। তবে এদের মধ্যে আফতারের এবং নাটকুর দলই হল সবচাইতে শক্তিশালী, তাই তাদের মধ্যেই রেষারেষি ও বখরা নিয়ে লড়াই বেশি। যা বোমাবাজি পর্যন্ত গড়ায় নিত্যই। আসানসোল থানার জাঁদরেল ও.সি. চন্দ্রশেখর মুখার্জী বলেন 'দু বছর আগেও ঐ সমস্ত ক্রিমিনালরা শহরের ফুটপাতে ঢালাও করে ওয়াগন ভাঙা মালপত্র বিক্রি করতো। এখন ওসব একদম বন্ধ হয়ে গেছে। যা আছে অতি গোপনে। তাই আসানসোল আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্রিমিনালদের প্রকাশ্য দৌরাত্ম্য এখন আর নেই বললে চলে। এর অবশ্য আরও একটি কারণ, রেল-ইয়ার্ড আসানসোল থেকে অণ্ডালে চলে যাওয়া।

রানীগঞ্জ পাঞ্জাবী মোড়ের গ্যারেজের পেছনে খাটিয়া পেতে মদ খাচ্ছিল সুখিয়া আর কাটা ইসমাইল। রানীগঞ্জ কালো হীরের দেশ 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে'র দ্বিতীয় স্বর্গ। এখানকার কাটা ইসমাইল ওরফে ইকবাল ১৯৬৮-র ১৪ অক্টোবর রানীগঞ্জের স্কুল পাড়ায় ডাকাতি করে ফেরার সময় পুলিশ তাড়া করলে সঙ্গে সঙ্গে ধানবাদগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে লাফ দিয়ে ওঠে। কয়েকদিন পর পুলিশ সন্ধান পায় ইকবাল আসানসোলে।

মক্ষীরাণী যমুনা
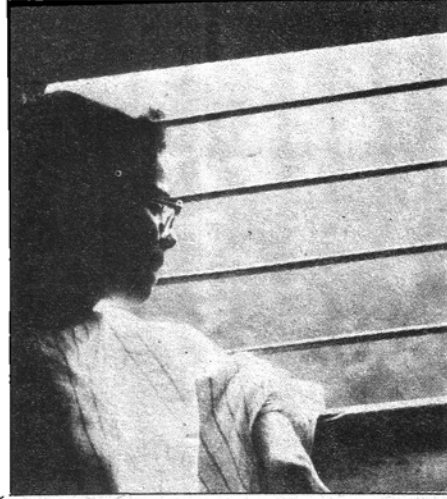
অণ্ডাল প্যাসেঞ্জার, না কি কয়লা প্যাসেঞ্জার!

স্থানীয় লোকেরা বলে, কোল এরিয়ার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য ও পরিবেশের দরুন এখানকার তরুণেরা সহজেই কাঁচা টাকা উপায়ের লোভে এই সমস্ত মাফিয়া ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্রিমিনালদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। রামনাইন বলে, কয়েক বছর আগেও ঝুপড়ির বাসিন্দা মহাবীর গুড় আজ শুধু এই এলাকা নয়, বম্বেরও শেঠ।

গভীর রাতে হঠাৎ পুলিশ এসে যাওয়ায় জানলা ভেঙে পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে তার একটি কান উড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর-এর অপরাধ জগতে কাটা ইসমাইল বলে পরিচিত ইকবাল। একটি বড় গুল্ড-মঙ্কের বোতলের শেষ ঢোক গিলে ইসমাইল আছাড় দিয়ে ফেলল বোতলটি। বুক পকেটের সিগারেট প্যাকেট বের করতে করতে সুখিয়া বলে, 'শুনছো গুরু, রানীগঞ্জের মাড়ুয়া ডাক্তার একটি মেয়েকে ন্যাংটো করে ব্লু-ফিল্ম করেছে।'

লাখ টাকা ফেললেও সন্ধ্যে সাতটার পর কোন যুবতী মহিলা এই সমস্ত এলাকায় বেরোবে না। বেরুলে হয়তোবা ব্যবসায়ের সামগ্রী হয়ে উঠবে। অপরাধী তো কেউ সেধে হয় না। অপরাধী করে পরিবেশ এবং কপাল।

স্থানীয় লোকেরা বলে, কোল এরিয়ার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য ও পরিবেশের দরুন এখানকার তরুণেরা সহজেই কাঁচা টাকা উপায়ের লোভে এই সমস্ত মাফিয়া ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্রিমিনালদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। রামনাইন বলে, কয়েক বছর আগেও ঝুপড়ির বাসিন্দা মহাবীর গুড় আজ শুধু এই এলাকা নয়, বম্বেরও শেঠ। মহাবীর হলেন ইসকোর স্টিল আয়রন পাচারের মাফিয়া চক্রের নেতা। আরেক জন হলেন ব্রিজি। কয়লা পাচার করে এখন সে আসানসোলের কোটিপতি। রামনাইন বলে 'ইয়ে শহরমে একঠো রোটি দেনেওয়ালা কোই নেহি।' রামনাইনের মরদ বেঁচে থাকা কালেও তার দারিদ্র্যের অন্ত ছিল না। কবে এক মাফিয়া চক্রের মস্তানবাবুর কাছ থেকে একশ টাকা নিয়েছিল মাল খাওয়ার জন্য। ব্যস তারপর আর উঠে দাঁড়াতে হয়নি। এমন সুদের ব্যবসাও আসানসোল অপরাধ জগতের আরেকটি দিক। সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবসা বহু বিত্তবান লোকের ইনকামের পথ। যেটা পুরোটাই বেআইনী। যার মাসিক সুদ শতকরা বাইশ টাকা।

এখানকার সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ, আসানসোলের প্রকৃত উন্নতি কেউ চায় না। সরকার, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে অফিসারদেরও একই চেষ্টা কি করে টিকে থাকা যায়। অন্যদের ধান্দা আসানসোলকে শুষে নেওয়া। এই বিকলাঙ্গ পরিবেশের চাপে উত্তরসুরীদের লোভের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটিই পথ-ওয়াগন ভাঙা, ক্রিমিনাল সাজা। তাই হয়তো আসানসোলেরই এক কবি চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'কয়লার গুঁড়োয় গর্ভবতী গন্ধর্ব বাতাস, চন্দ্রলোকে ফোটে না রজনীগন্ধা, পুলকিত সন্ধ্যাও নেই প্রতিটি অন্ধকারে...?' রামনাইন আর বেশিদিন বাঁচবে না। শুধু সেই মচকন্দ ফুল গাছের নিচে আগামী আসানসোলের কতটা ছাইভস্ম বেড়ে ওঠে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, সেটিই হবে তার দেখবার বিষয়, উত্তরসুরীদেরও।

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

কফিহাউস

কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস বাংলা সাহিত্যের ভ্রূণ-ডিপো। কলকাতার ইনটেলেকচুয়ালস কর্ণার থেকে তরুণ লেখক রাধাপ্রসাদ ঘোষাল তুলে এনেছেন গল্পময় জীবনের কতগুলি অনবদ্য মুহূর্তকে ; যা জীবনের আঙিনায় সময়ের সার্বজনীন আঁকিবুকি। স্কেচটি এঁকেছেন বিখ্যাত শিল্পী রথীন মিত্র।
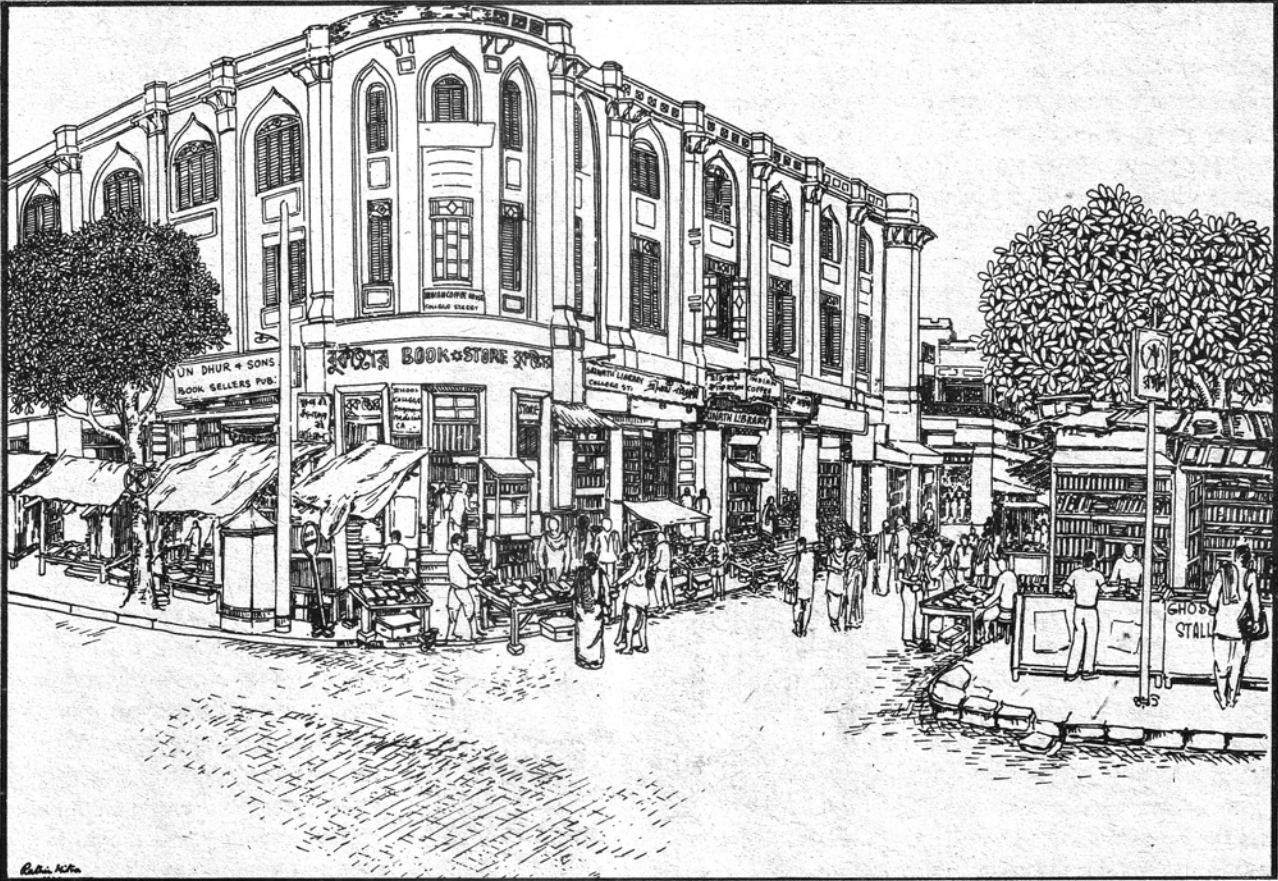
মন না মতি, ছুটছে অনবরত—নাকি শুধুই খেলা—এই যে এতগুলি যুবক-যুবতী তাদের তুমুল যৌবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ছোটাছুটি করছে, তার পিছনে কি সেই অলীক রহস্য ? কালো কফিতে চুমুক দিলে কারো বিস্বাদ লাগে, তারা দু আউন্স দুধ কিনে নেয়। কিনে নেয়, কেননা—চেয়ে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না, তাই কিনে নাও। তবে জিনিসটি তোমার হবে। তুমি ইচ্ছে মত খাও, ছড়াও, নষ্ট কর। আর মনটিকে যদি ঠিক ঠিক উড়িয়ে দিতে পারো তবে তুমি হবে আর্টিস্ট, মানে জীবন গড়া কারিগর —যাকে বলে শিল্পী। মানে র‍্যাঁদা, কাফকা, কিংবা সালভাদর দালি। সেনসেশনাল কথাবার্তা বলে তুমি ফিদা-হুসেইনও বনে যেতে পারো। কেউ বলবে আঁতেল, কেউ বলবে জিনিয়াস। তা বলুক, কাজ করলে তার নিন্দেমন্দ শুনতে হবে বৈকি! তুমি চুপ থাকবে, স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির মত, কেননা তুমি মননের স্রষ্টা,—তুমি আর্টিস্ট। তুমি তো সৃষ্টি করছো—

তোমার ওয়াইন কালারের সানগ্লাস আমার খুব নির্মম মনে হয় কৃষ্ণা—

কেন, ওয়াইন তো একটা সলিড গ্রিফ, বেদনা, দেবদারু কলোনিতে বসে বসে তুমি যা প্রায়ই পেতে। তোমার সে গাছের ছায়া আমি দেখিনি সুব্রত। শুনলাম শম্পা ভালো আছে। আমি তোমার থেকে বয়সে ক'বছরের বড়ই হবো। যা দেখেছি মনে হয়, ওয়াইন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি করে—বাবুইয়ের কথাটাই ভাবো তো একবার—

কৃষ্ণা, তুমি কমল মজুমদার পড়েছ ?

কোনটা—

'পিঞ্জরে বসিয়া শুক'—সেই যে কয়েকটা লাইন—'নাচ হইবে। মাদলের আওয়াজ আসিতেছে, মদ চলিতেছে! অভ্যাগতর সকলেই এখন অনবরত একটি পদ মুখস্ত করিতেছিল, 'পেট তো ভর'ল মহন ভর'ল না হে'—ইহা সাঁওতাল সর্দার মাঝি মহুয়া খাইতে খাইতে বলিয়াছে, চিঁড়া গুড় তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়াছে, কিন্তু মদের অভাব! তাই মন ভরিয়া ওঠে নাই—' পড়েছ ? অশিক্ষিত সাঁও-তালের মুখে কি কথা—শুনলে মনে হবে ফিলসফির লেকচারার—। সত্যি বাবুইয়ের বড় কষ্ট—

কষ্টের কথা এভাবে লোকের কাছে ছড়িয়ে দিও না সুব্রত,। কষ্ট তো হাউই, আলো নিয়ে আকাশে উঠে যাবে। দেখে লোক হাততালি দেবে, মজা পাবে, উৎসবের কথা ভেবে পুলকিত হবে। এদিকে কষ্টের ভেতরে যে বারুদ তা যে দাউ দাউ করে জ্বলছে, পুড়ছে সে কথা ক'জন ভাববে বলো ?—দহন মানে তো মৃত্যু—তার বড় জ্বালা সুব্রত—

যুবক-যুবতীদের গোলটেবিলে দু'জন মাত্র তরুণ কবি। আরেকজন মন দিয়ে ইংরেজি নভেল পড়ছেন। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে দেখছেন এই নব্য-কালচার। ভদ্রলোক দীর্ঘ ছ'ফুট লম্বা। নির্লোম গ্রীসিয়ান কাটের মুখ। একটি কাগজের আর্ট ক্রিটিক। কখনও গল্প লেখেন যাদুকরের মত। তিনি এইবার চোখ তুলে সিগরেটে আগুন ছোঁয়ালেন। ওয়েটারকে ডেকে বললেন, চিকেন স্টু—। সিগরেট খেতে খেতে ভাবলেন অনেক কিছুই, কিন্তু কল্ট, গ্রিফ, কিংবা ওয়াইন সম্পর্কে বোধহয় তার কোন অবদান নেই। তিনি ভাবছেন মর্ডান সর্ট স্টোরির ফর্ম কেমন হওয়া উচিত। মেটামরফসিস—কাফ্‌কার গল্পটি ভাবুন তো, একটা ভাস্ট স্ক্রিন,—একেবারে ক্লাসিক্যাল টিউনে বাঁধা। পারবে আমাদের দেশের লেখকরা লিখতে ——

এখন সন্ধ্যে নেমেছে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের গোপন মাঠটি থেকে গাঁজা, চরস, ড্রাগসের ঠেকটি উঠে গেছে কবেই। এই গেটের বিপরীতে ইণ্ডিয়ান কফি হাউস এখন এক আলাদা জৌলুসে মেতে উঠেছে। সবাই বলছে যেন, কাগজের সম্পাদনা করো তুমি, আমার ঘোড়াটি চাই—

সকাল বেলায় কফি হাউস একটু ফাঁকা থাকে। ন'টার পর টেবিলে কোন কোন লেখক বা ছোট প্রকাশক কফি খেতে খেতে বইয়ের প্রুফ দেখেন। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে সারাদিনে হাউসের রূপ তিনবার বদলে যায়। তিনটি রূপ আলাদা, একটির সঙ্গে অন্যটির কোন বন্ধুতা নেই।

সুব্রত এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোন টেবিলে পরিচিত কে আছেন। কোণের টেবিলটিকে ঘিরে গতকাল সন্ধ্যায় এক খাণ্ডব দহন হয়ে গেছে। সুলতা নামের মেয়েটিকে চায় দুটি পুরুষ। একজন ব্যবসা করেন, আরেকজন নামী চিত্রকর। কফির কাপ ভেঙেছে, নয়নাংশুর থাই পুড়ে গেছে গরম লেগে, আজ শোনা গেল মান বাঁচাতে সুলতা চলে গেছে তার মামার বাড়ি লক্ষ্ণৌ। লোকে বলে পাত্র হিসেবে ব্যবসায়ীটিই যোগ্যতম।

আজ সেই টেবিলটিতে চারজন সাদা মাথা বুড়ো বসে বসে সংসারের গল্প করছেন। কার কটি সন্তান, কে কোথায় থাকেন, বিয়ে কিভাবে হল, পাওনা-পত্তরের হিসেব, একটা এসটিমেট। এক একটি টেবিল এখানে এক এক রকম। আর বাকি টেবিল বলতে যুবকযুবতী। তারা হাসে, খায়, গান গায়। কখনও অভিমান করে অন্য-দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এক আজব খেলা চলতে থাকে মানুষদের মধ্যে।

কৃষ্ণা বলল, সুব্রত মানুষ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, মানুষ মূলত কেমন বলো তো—!

সুব্রত একবার চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু ওপরে আকাশ নেই, বরং এলবার্ট বিল্ডিংয়ের সিমেন্ট বাঁধানো ছাদে একটা টিক-টিকিকে দেখা গেল, পোকা ধরতে দৌড়চ্ছে। চোখ নামিয়ে বলল, খুব টাফ, কমপ্লিকেটেড—একজন শুধু আরেকজনকে অ্যাটাক করে। ভালোবাসার মানুষ বড়ই কম।

শম্পা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসে। ওর ওই লম্বা চেহারা, শান্ত চোখ, নম্র বসে থাকার ধরনটি, তার মধ্যে যেন কি একটা আছে—

কি—

তা ঠিক জানি না। তুমি ভালো জানবে। তুমি ওর হ্যাজব্যাণ্ড। খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছ তোমাদের খিটিমিটি, দ্বন্দ্ব, মেয়েকে ঘিরে আত্ম-শিবির তৈরি করা, জোরদার করা—আমার কিন্তু খুব মজা লাগে। মানে বলতে চাইছি ভালো লাগে। একটি মানুষকে পাওয়ার জন্য তোমাদের এই টানাপোড়েন। মেয়ে তো তোমাদের দুজনেরই। একজন তাকে বেশি করে পেতে চাও—এটাই কেমন ভাবায় আমাকে।

এই কফি হাউস—এর ইতিহাসটিও কিন্তু অনেক পুরনো। বিদেশ থেকে এসেছেন লেখক, পর্যটকেরা, তাদের কাছে পাওয়া যায় এই হাউ-

সের নাম। কত মূল্যবান লেখক, শিল্পীর যৌবন কেটেছে এইসব টেবিলগুলিতে। সেইসব মানুষ আর নেই, চলে গেছে সেইসব আর্দালি, রয়ে গেছে কফিহাউস—ইতিহাসের সাক্ষী নিয়ে।

একটু পরেই সেই আর্ট ক্রিটিক আর নিশ্চিন্ত-পুরের মানুষ উঠে গেলেন। সেই জায়গায় এসে বসল এক তরুণী। তাঁকে সবাই চেনে তৃষ্ণার্ত জলপরী নামে। একসময় একটা কাগজ করতেন, সেই থেকে। পিছনে দাড়িবালা এক যুবক এবং বিবাহিতা আরেকজন, ইনি গান গাইতে পারেন খুব ভালো। রান্নায় নাম আছে বেশ। এসেই তারা হৈ হৈ শুরু করে দিলেন। বদলে গেল টেবিলটির চেহারা।

সেই দাড়িবালা যুবক বলে উঠল, এই সুব্রত, শুনেছিস—গেরিলা সুইসাইড করেছে—

কেন, কেন?

কেন আবার, নেশার ঝোঁকে। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছে নিচে। হেরোইন ছাড়া তো চলতো না ছেলের! বাপের একমাত্র ছেলে।

চারপাশের লোকজন যারা শুনল, তারা বলল—আহা! কত বড় লোকের ছেলে, কত পয়সা। কত খরচ করে এডুকেশন। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত মাঝে মধ্যে। ভালো পপ গান গাইতে পারত। মনটা ছিল উদার। য়্যুনিভার্সিটি পলিটিক্স করত। বাম রাজনীতি। তারপর কিভাবে যেন বখে গেল। এই তো সেদিন কফি হাউসে টেবিল আলো করে বসেছিল। যখন বসত বন্ধুদের কাউকে বিল দিতে হত না। বন্যাত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১,০০০ টাকা ডোনেট করেছিল।

—কিন্তু বাবুই কোথায়? সেই ছিপছিপে, কালো স্মার্ট তরুণ? দুর্দান্ত গল্প লেখে। আর মাঝে মাঝেই টেবিলে এসে বলে, আমার বড় বেদনা। মানুষ আমাকে এত বেদনা দিল। একদিন এর মাশুল গুনতে হবে সোসাইটিকে—বলে খুব কতকটা হাসে ছেলেটা, বাম গালে তিলটি দাড়িতে ঢাকা পড়লেও দেখা যায়। তিলের মত তিল তিল করে দুঃখের কথা বলে—। কই এখনও এলো না তো। কৃষ্ণা বলল, সুব্রত সাড়ে আটটা তো বাজে—বাবুই কখন আসবে?

আস্তে আস্তে ফাঁকা হয় টেবিল। শেষ ঘন্টার মত বেজে উঠল বেল। কবি, শিল্পীরা এবার ঘরে ফিরবেন। কারণ পৃথিবীতে সব আড্ডাই একদিন ঘরের মধ্যে গিয়ে মিলিয়ে যায়। মানুষ তখন বড় বেশি গৃহস্থপনায় মেতে ওঠে। লোকজন কমে যায় ঠিকই, কিন্তু ওয়েটারদের সাদা ইউনিফর্ম একটুও ফেড করে না। আগামীকাল আসছে। সকাল থেকে আবার তাদের সেজেগুজে কাজে নেমে পড়তে হবে। যাকে বলে ডিউটি।

চলে গেল তৃষ্ণার্ত জলপরী, সেই মধুমুখি বউ আর দাড়িবালা যুবক। সুব্রত বলল, চল একটু নিচে গিয়ে দাঁড়াই। হাউস তো এবার বন্ধ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ তার ব্যাগটি পিঠে ঝুলিয়ে নিল। মাথার হেলমেট হাতে দুলিয়ে সুব্রত নেমে এল কফি হাউসের নিচে। ফুটের দোকানদার খোলা বইপত্র সাজাচ্ছে, তাকেও ঘরে ফিরতে হবে।

এইভাবে রাত বাড়ছে সর সর করে। কল-কাতার রাজপথ, কলেজ স্ট্রিটের বুকপিঠ সব হিম হয়ে উঠবে এবার।

সবাই চলে গেলে এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ায় কফি হাউসের গেটে। তার মুখে দাড়ি, অন্ধকারে এখন আর কোন তিল দেখা যাচ্ছিল না। হতে পারে এই সেই বাবুই। যেন পাখির মত উড়ে এল। কিন্তু গেট বন্ধ। পৃথিবীতে এক এক জন মানুষ আসে, তারা গন্তব্যে পৌঁছোয় ঠিকই, কিন্তু তার আগেই চোখের সামনে খোলা দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। এ বাবুই তো সেই পাখি, যে শুধু স্বপ্ন দেখে, বাসা বোনে, সবাই চলে গেলে একা একা এদিক ওদিক তাকায়, গায় গুনগুন। বেদনার গানটি শুধু শোনে বন্ধ কফি হাউস। আর বিষণ্ণ কলকাতা জুড়ে শুধু কিছুটা নিষ্প্রাণ হাওয়া খেলা করে। কেউ তার নাগাল পায় না।

কফি হাউস : সালতামামি

বাঙালির পাতে মাছ–ভাতের মতই কফি হাউসের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে ১৫ নম্বর বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের কথা। ১৫ নম্বর বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট মানে চলতি কথায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, যদিও তার প্রথাসিদ্ধ নাম 'ইনডিয়া কফি হাউস'। অথচ কলকাতায় এখন আরও কয়েকটি কফি হাউস আছে এবং দুয়েকটির কৌলীন্য বর্তমানে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের চেয়ে বোধহয় বেশিই হবে। তবু কেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস ? একি শুধুই পথিকৃতের স্বীকৃতি ? তাই বা বলি কি করে ! কারণ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের জন্ম ১৯৪১ সালে। পক্ষান্তরে ১৭৮০ সালেই এ শহরে কফি হাউসের প্রথম আবির্ভাব ঘটে গেছে। ভ্যানসিটার্ট রো-র 'লণ্ডন ট্যাভার্ন'ই কলকাতার প্রথম কফি হাউস। তারপর একে একে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে লালবাজারের 'হারমোনিক হাউস', 'ক্রাউন অ্যাণ্ড অ্যাঙ্কর হোটেল অ্যাণ্ড ব্রিটিশ কফি হাউস', 'ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফি হাউস' ইত্যাদি। সেকালের কফি হাউসগুলি ছড়িয়ে ছিল লালবাজার ও বেনটিংক স্ট্রিটের আশেপাশে। চাতকের মত তৃষ্ণার্ত রাইটারদের নৈমিত্তিক আনা-গোনা ছিল সেখানে। ফুল কুড়োতে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যেত। কেউ সাফল্যে উদ্দাম হয়ে, কেউ বা ভারাক্রান্ত মনকে চাঙ্গা করতে হাজির হত কফি হাউসে। এসব উপসর্গে কফির চেয়ে মদই ছিল সার্থক রিমেডি। তাই কফি হাউসে মদও পাওয়া যেত। এমনকি হুঁকো বা আলবোলাও ছিল সেখানকার একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

কফি হাউসের মার্বেলের মেঝে আর টেবিলের মাথায় দুলত টানা পাখা। তার সাথে গেলাসে গেলাসে আমেরিকার বরফ সিভিলিয়ান সাহেবদের তৃপ্ত করত দারুণভাবে। অবশ্য শুধু হৈ হল্লাই নয়, পত্র পত্রিকা পাঠেরও রেওয়াজ ছিল। তাই কফি হাউসের টেবিলে টেবিলে শোভা পেত 'পাঞ্চ', 'হরকরা', 'ক্যালকাটা অ্যাডভার-টাইজার' প্রভৃতি সেকালের পত্র-পত্রিকা। কলকাতার উন্নতির জন্য সেকালে যেমন লটারির ব্যবস্থা হয়েছিল, তেমনি কফি হাউসগুলোও মাঝে মাঝে লটারির আয়োজন করত নিজেদের উন্নতির স্বার্থে।

অর্থাৎ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস এদেশে কফির নেশা ধরানোর পথিকৃত নয়। তার একশ একষট্টি বছর আগেই কলকাতা কফির স্বাদ লাভ করেছিল। তবু কেন বাঙালির মজ্জায়, ধমনীতে মিশে গেছে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস ? এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের ঐতিহ্যে। সত্যিকার অর্থেই এখানকার কফি হাউস শুধু রেস্তোরাঁর পেয়ালাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই নাম-টুকুর সাথে মিশে আছে এক দুর্মর নেশার গন্ধ। কফি হাউসের পেয়ালা বাঙালির কাছে অতলস্পর্শী সাগরের মত, বহু ঢেউ আর তুফানে যা টইটুম্বুর। কলকাতা আন্দোলনের শহর। মিছিল নগরী। এত আন্দোলন, এত মিছিল, এত বিতর্ক, অহেতুক মৃত্যু, আশা-হতাশা, মতাদর্শা ও কর্মযজ্ঞের ভার পৃথিবীর আর কোন শহর বহন করেছে কিনা বলা মুশকিল। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক আদল একদিন অবিকলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল ১৫ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের অট্টালি-কায়।

১৫ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। প্রায় লাগোয়া দুখানা বড়সড় দালান বাড়ি। বাড়ির মালিক রাম-কমল সেন, ব্রাহ্ম সমাজের অবিসংবাদী নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে এ বাড়ির কর্তৃত্ব একদিন তাঁর হাতেই চলে আসে। ১৮৭৬ সাল। কেশবচন্দ্র সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। তাঁর চোখে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রঙ। এদিকে কলকাতাতেও তখন নবজাগরণের হাওয়া। সে হাওয়ায় দুলছে আটপৌরে মূল্যবোধের প্রচ্ছদগুলি। খসে পড়ছে। কেশবচন্দ্র পুরনো দালানের সংস্কার সাধন করে দু'টি বাড়িকে মিলিয়ে দিলেন। দু'টি বাড়ি একাকার হল। এক তলায় অনেক গুলি ঘর। দোতলার হলঘরটি রীতিমত বড় মাপের। তিন তলায় ব্যাল-কনি সমৃদ্ধ ফুট বিশেক বারান্দা। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের পিতা অর্থাৎ রানী ভিকটোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের নামানুসারে ১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসে স্থাপিত হল 'অ্যালবার্ট ইনসটিটিউট অ্যাণ্ড হল।'

নামকরণে রাজভক্তির নিদর্শন থাকলেও 'অ্যালবার্ট হল' কার্যত হয়ে ওঠে বৃটিশ বিরোধী সভা সমাবেশের মূলকেন্দ্র। জন্মের তিন মাস পর ২৬ জুলাই এখানেই গঠিত হয় 'ইনডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা'। উদ্যোক্তা রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। সাত বছর পর ১৮৮৩ সালের ২৮-৩০ ডিসেম্বর এখানে বসে 'ভারত সভা'র জাতীয় সম্মেলন, যাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা সামিল হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই 'ভারত সভা'র জঠর থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। ১৯২৭ সালের ৩ এপ্রিল এই হলেই গঠিত হয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন, যার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যা-পক ড: গৌরাঙ্গনাথ বন্দোপাধ্যায় ও মৃণাল কান্তি বসু। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের গ্রেপ্তা-রের প্রতিবাদে অ্যালবার্ট হলই প্রথম মুখরিত হয় ২২ মার্চ, ১৯২৯ সালে। ২৩ এপ্রিল, ১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকারের প্রেস অর্ডিন্যানসের বিরুদ্ধে কল-কাতার জাতীয় সংবাদপত্রগুলি বন্ধ পালন করে। এই প্রেস অর্ডিন্যানসের বিরুদ্ধে অ্যালবার্ট হলের কমিটি রুমে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিকরা মিলিত হন এক প্রতিবাদ সভায়। ১ মে-র সেই সভার সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৭৬ থেকে ১৯৪১। মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সেই 'অ্যালবার্ট ইনসটিটিউট অ্যাণ্ড হল' এর পরমায়ু ফুরিয়ে গেল নিদারুণ অর্থাভাবে। ফলে দেউলিয়া ইনসটিটিউটের হাত থেকে বাড়িটি কিনে নেন রাজা প্রথম মল্লিক। ঘটনাক্রমে ওই সময় দক্ষিণ ভারতে কফির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কফি বোর্ড ভারত জুড়ে কফিকে জনপ্রিয় করার প্রচারাভিযানে নামে। একই সঙ্গে চলতে থাকে অন্তর্দেশীয় বাজার তৈরির নানা প্রয়াস। মওকা বুঝে অ্যালবার্ট হলের নতুন মালিক কারবার খোলার প্রস্তাব দিলেন কফি বোর্ডকে। স্কুল কলেজে ঠাসা এলাকা, ছাত্র-শিক্ষকদের স্বর্গরাজ্য, বিশ্ব-বিদ্যালয় চত্বর, বই পাড়া–সব মিলিয়ে কফি বোর্ডের মনের মতই জায়গা। সুতরাং কফি বোর্ড সাগ্রহেই অ্যালবার্ট হল ভাড়া নিলেন। জন্ম হল ঐতিহাসিক কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের। সেটি ১৯৪৩ সাল।

কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলেও একদিন তারা প্রমাদ গুণলেন। এক কাপ কফি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা–হৈ চৈ ! কফি বোর্ডের মাথায় হাত ! সারাক্ষণ এরকম ভনভনানি চললে তো কর্মচারীদের মাইনে যোগানই দায় হবে। সুতরাং কফি বোর্ড ফন্দি খুঁজতে লাগলেন। এভাবেই একদিন রপ্তানী ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিযোগিতায় বিপুল সরবরাহের প্রশ্নে তাঁরা একটি অজুহাত পেয়ে গেলেন। ১৯৫৬ সালে বন্ধ করে দেওয়া হল কলেজ স্ট্রিট আর দিল্লির কনট সার্কাসের কফি হাউস।

বাংলার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র ছাত্রীরা এই লক আউট মানতে পারেন নি। তাঁরা জোট বাঁধলেন। শুরু হল লেখালেখি, প্রচার অভিযান। সমস্ত ছাত্র সংগঠন বামপন্থী ডানপন্থী, কংগ্রেস কমিউ-নিস্ট একযোগে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে দাবি জানালেন কফি হাউসের তালা খোলার। কিন্তু ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জলবায়ুর পক্ষে কফি পান ক্ষতিকর বলে তাদের দাবি নীতিগত-ভাবে নাকচ করে দিলেন। ফলে শুরু হল বিক্ষোভ। সেই সঙ্গে বিধান রায়ের সঙ্গে অশোক সেনের বিস্তর যুক্তিতর্ক। শেষ পর্যন্ত বিধান রায় নরম হলেন। তবু সমস্যার জট ছাড়ল না। কারণ কফি বোর্ড তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়। খেসারত দিয়ে তাঁরা আর কফি হাউস চালাতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক শলা-পরামর্শের পর কফি হাউস চালাবার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হল কর্মচারীদের সমবায় সমিতির ওপর। ১৯৫৮ সালে আবার কফি হাউ-সের দরজা খুলল। সেদিন যেন কলকাতায় উৎ-সবের হাওয়া। সবাই যেন এক হারানো সম্পত্তি ফিরে পেল।

সত্তরের গোড়ায় শীতল শিলিগুড়ি গরম হয়ে ওঠে নকশাল আন্দোলনের উত্তাপে। নকশাল বাড়ির স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল প্রেসিডেন্সি–ভার্সি-টিতেও। স্বাভাবিকভাবেই কফি হাউসও হয়ে উঠল গনগনে। বাম–ছাত্র আন্দোলনকারীদের চেয়ারগুলি এ সময় চলে যায় নকশালপন্থীদের দখলে।

এভাবেই কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসও এখনো বেঁচে আছে। যদিও সেদিনের প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত আড্ডা আজ ভাঙা হাটের নামান্তর মাত্র। ভার্সিটি-প্রেসিডেন্সির কমনরুম ছাড়া তাকে আর কিইবা বলা যাবে ! তবু হাজার হাজার মৌমাছির গুঞ্জরনে অবক্ষয়ের মধ্যেও যে কফি হাউস এখনও বেঁচে আছে, বাঙালীর কাছে তার গর্বই বা কম কিসে !

ছবি : কুমার রায়

স্মিতা : শেষ 'ভূমিকা'য়

বিধাতার অমোঘ নির্দেশে শেষ শটের জন্য প্রস্তুত অভিনেত্রী। চারিদিক নিথর ও নিস্পন্দ। নির্বাক জনস্রোতের মধ্যে বান্দ্রার কার্টার রোডের বাড়িতে শায়িতা স্মিতা পাটিল। রক্তিম বস্ত্রাবরণে এক নববধূবেশ। শেষবারের মত তাঁর 'মেক-আপ' দেখে নিলেন প্রিয় মেক-আপ ম্যান দীপক। সামান্য খুঁতও বাদ দিল না তার ব্রাশের মসৃণ আঁচড়। হেয়ার ড্রেসার মায়া নির্বাক বিহবল ভঙ্গিতে আরো এক বার দেখে নিলেন প্রিয় অভিনেত্রীর শেষ বারের কেশ বিন্যাস। ভারাক্রান্ত পরিবেশে বধূবেশী স্মিতা যেন তার সংলাপহীন 'ফাইনাল শটের' জন্য তৈরি। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে পরিচালকের মুখ থেকে শোনা গেল না, 'স্টার্ট ক্যামেরা, অ্যাকশান।'

আর কখনও ক্যামেরা অলোকিত করবে না। শিবাজী-পার্কের শ্মশানে 'আক্রোশ'-এর সংলাপহীনা স্মিতা হারিয়ে গেলেন পার্থিব জগতের পঞ্চভূতের মধ্যে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের নতুন ধারার নিশান্তের শুরুতেই অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলের ঘটল অকাল প্রয়াণ।

আর্ট ফিল্মের পরিচিত চৌহদ্দি ছেড়ে কমার্শিয়াল ছবিতেও পাড়ি জমিয়েছিলেন স্মিতা। তাঁর প্রথম কমার্শিয়াল ছবি 'নমক হালাল'। তাও আবার 'সুপারস্টার' অমিতাভের বিপরীতে। প্রথম ছবির সুবাদে আশাতীত সাফল্য পান নি স্মিতা। কারণ তিনি নিতান্তই অজ্ঞ ছিলেন কমার্শিয়াল 'সেট-আপ'-এর সিনেমাটোগ্রাফি সম্পর্কে। ক্যামেরাম্যানও ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি কোন 'অ্যাঙ্গেল' থেকে শট নিলে গ্ল্যামার সর্বস্ব হিন্দি ছবিতে ভাল লাগবে স্মিতাকে। এ ছাড়া কমার্শিয়াল ছবিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেওয়া হয় কেবলমাত্র নায়কদেরই। আবার যে ছবিতে অমিতাভ থাকবেন, সেখানে তো নায়িকার ভূমিকা হবে জেমস বণ্ডকে ঘিরে থাকা 'বণ্ড-সুন্দরীদের' মত। নিজের এই ব্যর্থতা প্রসঙ্গে স্মিতা বলেছিলেন, 'গ্ল্যামার সর্বস্ব হিন্দি ছবিতে আমার মত অভিনেত্রীদের মানিয়ে নেওয়া বেশ শক্ত। তার উপর ক্যামেরাম্যানকেও খুলে বলতে পারিনি আমার আনইজি ফিলিংস-এর কথা।'

স্মিতা প্রসঙ্গে ফলাও করে লেখা হয় পাকিস্তানের সংবাদ পত্র 'দ্য মুসলিম' পত্রিকার প্রথম পাতায়। এছাড়া প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'দ্য নেশান'-এর ১৯ ডিসেম্বরের বিশেষ নিবন্ধে 'কভার' করা হয়েছে স্মিতার অভিনয় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিউজস্টোরি।

'দ্য নেশান'-এর উদ্ধৃতি অনুসারে স্মিতাকে বলা হয় 'নারী স্বাধীনতার বিমূর্ত প্রতীক'। নাইরোবিতে আন্তর্জাতিক নারী অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে স্মিতার অনবদ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে 'দ্য নেশান'-এর মন্তব্য 'এশিয়ার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের মধ্যে স্মিতা পাতিলই অগ্রগণ্যা। আমাদের সাহিত্যে ও স্মরণে স্মিতা চিরকালই বেঁচে থাকবেন শুধুমাত্র 'সিনেমাটোগ্রাফির' অনন্যা শিল্পী হিসেবেই নয়, নারী স্বাধীনতার প্রচারক হিসেবেও।'

এই স্মিতা পাতিলই এশিয়ার মধ্যে একমাত্র অভিনেত্রী যার রেট্রোসপেকটিভ হয়েছে প্যারিস 'ফিল্ম উৎসবে'।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্মিতা সম্বন্ধে যেন শেষ কথা বলেন বিশ্বখ্যাত পরিচালক কোস্টা গোরা : 'স্মিতা পাতিলই একমাত্র অভিনেত্রী যিনি ভারতীয় নারীর সমস্ত রূপেই অভিনয় করেছেন, কখনো 'চক্র', 'ভূমিকা', 'অর্থ'-এর রক্ষিতার ভূমিকায়, আবার কখনো 'তেরে শহর মে' 'মাণ্ডী'র বেশ্যা হিসাবে। তারই পাশাপাশি 'ভীগী পলকেঁ'য় পতি-পীড়িত বিদ্রোহী নারী চরিত্রে। এখন স্মিতাকে নিয়ে একটি ছবি করাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা।'

কিন্তু কোস্টা গোরা'র ইচ্ছা শুধু কল্পনায় থেকে গেল। বাস্তবায়িত হল না। কারণ চলচ্চিত্রের আঙ্গিনা ছেড়ে এমনকি জীবনের চালচিত্রের মায়া কাটিয়ে স্মিতা পাড়ি জমিয়েছেন এক নতুন ভূমিকার সন্ধানে। আর্ট ফিল্মে শাবানার সঙ্গে তাঁর তুলনা পরিপূর্ণতার অবকাশ পেল না। দর্শকের স্মৃতিতে রয়ে গেল আয়ত দুটি চোখ। আয়ত চোখের অভিনেত্রী ইনগ্রিড বার্গম্যানের মৃত্যুতে হলিউডের বুকে নেমে আসা শূন্যতার চেয়েও ভারতীয় চলচ্চিত্রের কাছে এ অভাব অনেক বেশিমাত্রায় অপূরণীয়।

বাংলা ভাগের আতংকে ভোগা বাঙালির কাছে মহাআতংকের যে নামটি–তা হল সুবাস ঘিসিং। দার্জিলিং জেলার জংলী আন্দোলনের জনক সুবাস শুধু নাম আর বিবৃতিতেই পরিচিত। আমাদের প্রতিবেদক সেই বিতর্কিত নামের আড়াল থেকে আসল মানুষটির পরিচয় সংগ্রহ করে এনেছেন।

পাহাড়ি আগুন : সুবাস ঘিসিং !

নেতা বরণ

দু চোখে নিঃসীম বেদনা নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী নাগা গেরিলাটির দিকে হতভম্ব ভাবে তাকিয়ে থাকে ২০ বছরের তরুণ গোর্খা সৈন্যটি। হাতে তখনও তার নিত্যসঙ্গী থ্রি নট থ্রি রাইফেলের মুখ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেটা ১৯৫৮ সালের ২২ জুন। সমগ্র নাগাল্যাণ্ড জুড়ে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর পূর্বাঞ্চল শাখা 'অপারেশন ফিজো' অভি-যান চালাচ্ছে। তাতে সামিল ৮ নং গোর্খা রেজি-মেন্ট। বিতর্কিত নাগা বিদ্রোহী জেনারেল ফিজো তখন নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মণিপুরের আতংক। ফিজোর গেরিলা-বাহিনীর হাতে প্রায় প্রতিদিনই তিন পাহাড়ি রাজ্যে চার-পাঁচ জন করে নিরীহ মানুষ মারা পড়ছে। সেজন্যই নাগাল্যাণ্ড রাজ্য সরকার এবং ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস যৌথ-ভাবে শুরু করে গেরিলা গ্রেপ্তারের সাঁড়াশি অভি-যান।

কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী গেরিলা নাগাটির শেষ কথাগুলি গোর্খা যুবককে কয়েক মুহূর্তের জন্য বোবা করে দেয়। অসীম যন্ত্রণায় টনটন করে ওঠে বুক। কুঁচকে ওঠে কপাল। কোন এক মর্মবিদারী স্মৃতির আতংকে বিপর্যস্ত যুবক দুটি চোখ বন্ধ করে ফেলে। তৎক্ষণাৎ তার অন্ধকার স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে দার্জিলিং জেলার মিরিক চা বাগানের সেই বীভৎস দৃশ্যটি।

সে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস। বৃহস্পতি-বারের সন্ধ্যা পূজা তখনও দেবী চোমোলুঙমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়নি। সবেমাত্র মহাকালের মন্দিরের ঘন্টা মিরিক চা বাগিচার কুলি বস্তিতে উপাসনার সময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ঘরেই ছিলেন গোর্খা সৈন্যটি। ওর বাবা বুদ্ধিমান ঘিসিং বাগিচার গার্ডেনবাবু। সবে দার্জিলিং–এর সেন্ট রবার্ট স্কুলের পড়াশোনায় ইতি ঘটিয়ে চলে এসেছে যুবক। তাই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বাবার সঙ্গে বসে আলোচনা করছিল সে। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এল এক বুকফাটা আর্তনাদ।

গার্ডেনবাবু বুদ্ধিমান ঘিসিং চীৎকার শোনা-মাত্র দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। পিছন পিছন সেই যুবক। ততক্ষণে বস্তির খোলা উঠোনে লোক-লস্করের মেলা। লোক বলতে সকলেই কুলিকাবারি, শুধু এক ইংরেজ সাহেব আর তার পাশে দুই বাঙা-লিবাবু।

ওরা বাগিচা কর্মী টোনি শেরপার কাছে এসেছে। টোনি যে কত অসুস্থ তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তবু রেহাই নেই। টোনি সাহেবের কাছ থেকে তিন বছর আগে আগাম বাবদ পাঁচশ টাকা

৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন

একা একা সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না

প্রশ্ন: ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আপনি, আলি আকবর সাহেব, ভীমসেন যোশী এক সময় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে তো শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। সেটা ছিল স্বর্ণযুগ। সেই ধারা কি উত্তরসূরিরা বজায় রাখতে পারবেন?

রবিশঙ্কর: এ ব্যাপারে আমার দু'রকম মত আছে। প্রথমতঃ, এখন পারমাণবিক যুগ চলছে। পৃথিবী জুড়ে চলছে গতির লড়াই। সর্বত্রই যুদ্ধের আশঙ্কা। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সঙ্গীত তো বেসুরো বাজবেই। ভারতেও চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। সেজন্য সঙ্গীত তো তাঁর নিজস্ব সুষমায় বাজতে পারে না। দ্বিতীয় দিকটা কিন্তু কিছুটা আশাব্যঞ্জক। আমার সঙ্গে আধুনিক সময়ের সঙ্গীতকারদের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমি যে সময়ে সঙ্গীত সাধনায় নেমেছিলাম, সে সময়ে বহু প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের দেখেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম। ওরা আলাদা আলাদা ঘরাণার লোক। তাঁদের নিজস্ব শৈলী ছিল। ফলে প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল বেশি। পাতিয়ালার আমির খাঁ, বড়ে গুলাম আলি ছিলেন আসরে। এখনকার সঙ্গীতকারদের মধ্যে অবশ্য সে ব্যাপারটা নেই। এরা একটি ঘরাণায় কোন রকমে গান শিখে খেয়াল, ঠুমরি, ভজন গাইতে শুরু করেন। খুব সহজেই সাধুবাদ পেতে চান। এতে হয় কি, তারা সম্পূর্ণভাবে কিছুই শিখতে পারেন না। ফলে আধা-গায়ক হয়ে নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করেন। এ ছাড়া আজকালকার গায়কেরা রেডিও, দূরদর্শন, রেকর্ড, ক্যাসেটের মাধ্যমে গুরু-কাজ অনেকটাই পুষিয়ে নেয়। ফলে এরা নকলবাজ হয়ে ওঠেন, প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভালো সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। আগেকার সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে চটক ছিল না, এখনকার সঙ্গীতজ্ঞরা চটক বেশি পছন্দ করেন।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন এখনকার সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রতিভা লুকোনো আছে?

রবিশঙ্কর: আমি খুবই আশাবাদী। শ্রোতাদের মধ্যে বোদ্ধার অভাব নেই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধিও তারিফ করার মত। তবে সবারই ধৈর্যের অভাব।

প্রশ্ন: মাইহার অনেককে বড় শিল্পী করেছে।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর, সেতারের এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সম্প্রতি আমাদের প্রতিনিধি শ্রীকন্দ গুপ্তের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা, বাবা আলাউদ্দীন খাঁ, অন্নপূর্ণা, সাধনা ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তাঁর অনুভবের কথা জানিয়েছেন।
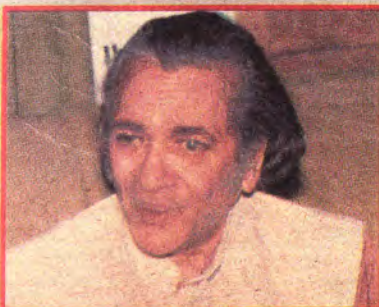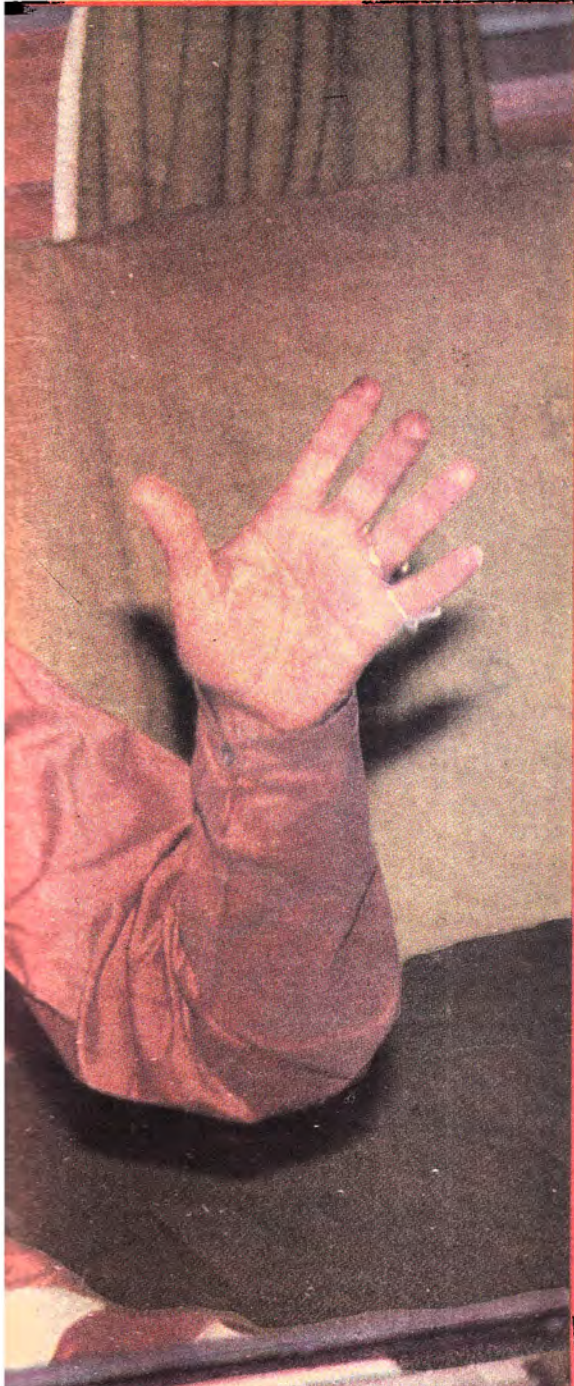
শোনা গিয়েছিল সরকার নাকি ওখানে একটি আকাদেমি বানাবেন। যাই হোক, সরকারের পরিকল্পনা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। আপনি কি অন্য কোন শিল্পীর সঙ্গে ওখানে অথবা অন্য কোন জায়গায় বাবা আলাউদ্দিন খাঁয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন আকাদেমি বানাবেন ?

রবিশঙ্কর: স্থান হিসেবে মাইহার কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাবাই ওই জায়গাকে মহৎ ও নামী করে তুলেছিলেন। মাইহারে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাদের মধ্যে প্রতিভা কিংবা গুণ তেমন ছিল না। বাবাই তাদের ঘষে-মেজে গড়ে পিঠে বড় করে তুলেছিলেন। আপনি নিশ্চয় মাইহার ব্যাণ্ডের নাম জানেন। ওখানে তাঁর সান্নিধ্যে এসে খ্যাতিমান যারা হয়েছেন, তারা অনেকেই মাইহার ছেড়ে চলে এসেছিলেন। বাবার একান্ত ইচ্ছে ছিল যে তাঁর যা অর্জিত বিদ্যা আছে তা সবার মধ্যে ভাগ করে দেবেন। বেছে বেছে গায়ক তৈরি করা তাঁর ধাতে ছিল না। যে তাঁর কাছে ছুটে আসতো, তাকেই তিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে গান কিংবা অন্যান্য বাজনা শেখাতেন। যাদের মধ্যে প্রতিভা থাকত না, তারা পালিয়ে যেত। আর যাদের মধ্যে সম্ভাবনা ছিল তারা থেকে যেতেন। বাবার কাছে ফাঁকি ছিল না। সেদিক থেকে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আকাদেমি তৈরি করে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এখন শুধু মাইহার নামে কাটছে।

প্রশ্ন: জায়গার কথা না হয় বাদই দিলাম, আচ্ছা বাবা আলাউদ্দিন খাঁ মাইহারে যে সঙ্গীত শেখাবার প্রথা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রথা কি এখনও চলছে ?

রবিশঙ্কর: হ্যাঁ, ওখানে ওই প্রথা এখনো চলছে। উদাহরণ স্বরূপ, আলি আকবরের কিছু শিষ্য ওখানে আছেন। দুর্ভাগ্য, এক মহান প্রতিভাধর শিষ্য রজভূষণ কাবরা মারা গিয়েছে। এছাড়া খাঁ সাহেবের অনেক বিদেশি শিষ্য রয়েছে। খাঁ সাহেব বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ভালোবাসেন। আমার মতে, এটা প্রথমে নিজের দেশেই হওয়া দরকার। আমি আমার এত ব্যস্ততার ফাঁকেও লস অ্যাঞ্জেলসে একটা সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝলাম, ওটা ওদের হুজুগ মাত্র, ফলে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম। এর আগে বোম্বাইতেও আমি এরকম একটা শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছিলাম। সেখানে আমার শিষ্যরা শেখাতো। আমি মাঝে মাঝেই ওখানে যেতাম। একসময় বুঝতে পারলাম, ওখানকার ছাত্ররা আমার কাছেই শিখতে চায়। ব্যাপারটা আর কিছুই না, ওরা বিখ্যাত রবিশঙ্করের কাছে শিখতে আগ্রহী, অন্য কারো কাছে নয়। এরপর আমাকে কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। মাইহারের বাবার মত আমিও বিশ্বাস করতাম যে সঙ্গীতচর্চায় পারম্পর্য প্রয়োজন। কিন্তু সময় বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটিও বদলাতে শুরু করল। এখন কোন শিষ্যই

৭৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

আনন্দপান্থ

রমাপ্রসাদ ঘোষাল
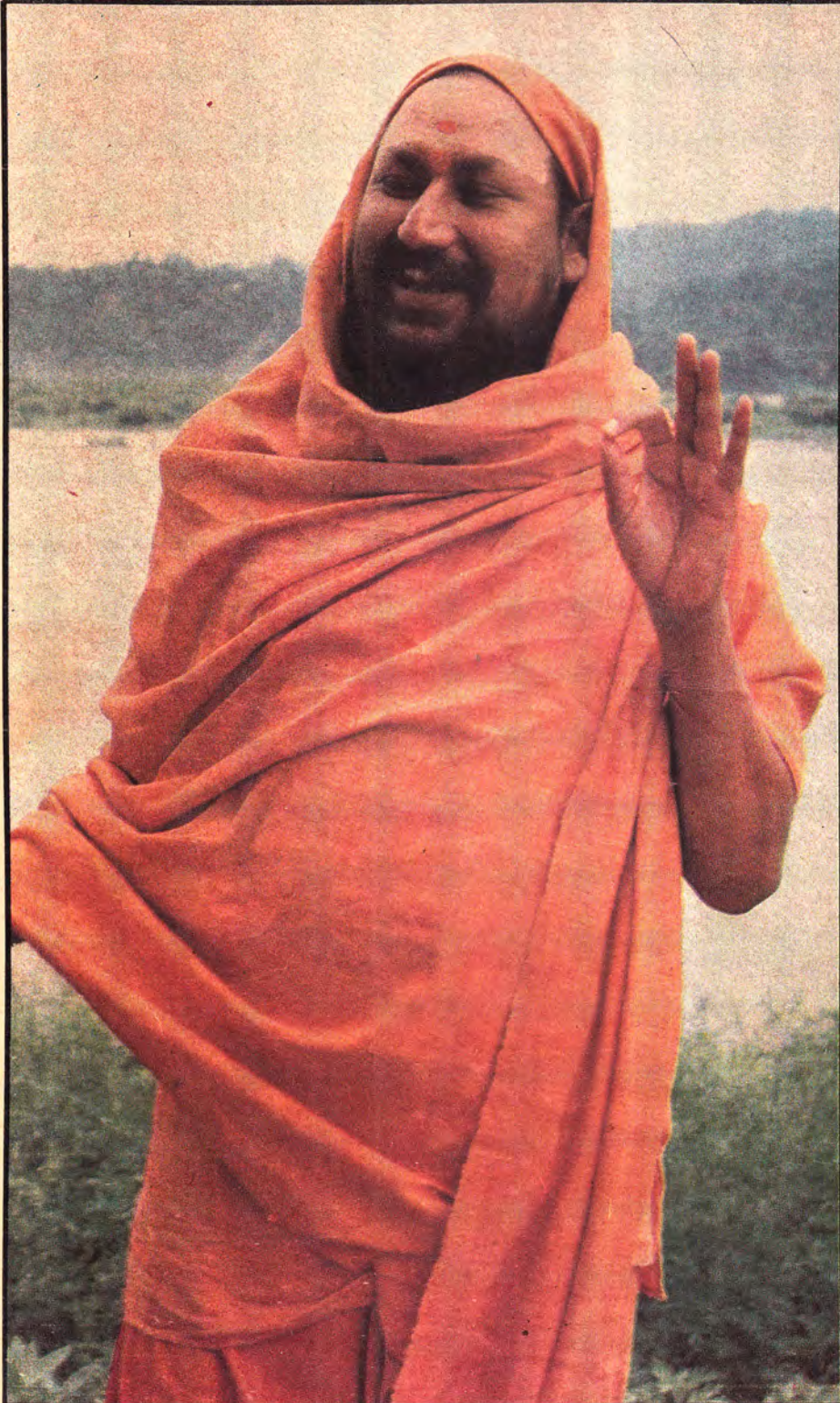
শত নদীর দেশ কামরূপ কামাখ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় তন্ত্রক্ষেত্র। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তারই খাদে খাদে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি স্রোত নানান নদীর নাম নিয়ে টিকে আছে। পশ্চিমে রুদ্ররূপ ব্রহ্মপুত্র নদ। আর সেই নদী-পাহাড়ের দেশে রয়েছে নাম না জানা শত শত গুহা। দিনের আলো যেখানে কোন কালে ঢুকবে না। অথচ ওই সব ভয়াল ভয়ংকর গুহা-মধ্যেই আছেন সাধনারত মহাতান্ত্রিক। পরনে রক্তবস্ত্র, গলায় হাড়মালা, আসন বলতে পঞ্চমুণ্ড। কেউ তারা কাপালিক, কেউ অঘোর, কেউ আবার নাগা সন্ন্যাসী। কুমারের জেদ চেপে যায়। সে বীর, সে ক্ষত্রিয়। যেমন করেই পারুক, এই গুপ্তপীঠের রহস্যজাল সে ভেদ করবেই। আর এ জন্য চাই কুমারী পূজা।

সর্ববিদ্যা স্বরূপা হি কুমারী নাত্র সংশয়।
একা হি পূজিতা বালা সর্বং হি পূজিতং ভবেৎ॥
—যোগিনীতন্ত্র। সপ্তদশ পটল। পৃ: ৩৩

'সন্দেহ নাই কুমারী সর্ববিদ্যাস্বরূপা। একটি কুমারী পূজা করলেই সব দেবীর পূজা করা হয়।' গুপ্ততীর্থ কামাখ্যায় মহামায়া কুমারী রূপে বিরাজিতা। কুমারী পূজা সর্বফলদায়ক। তাই মহামায়া তাবৎ বিদ্যা অবিদ্যার মায়াজাল ভেদ করতে সেই কুমারী মাতার পূজা আবশ্যক।

ওঁ বাল রূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীম্ বরবর্ণিনীম্।
নানালংকারনম্রাঙ্গীম্ ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম।
চারু হাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং চিন্তয়েৎ শুভম।

কুমারী ধ্যানে শুরু হয় কুমারী পূজা। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠস্বরে সারা নীলাচল যেন থরথর করে কাঁপে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা পশুপক্ষী চলতে ভুলে যায়। স্মিতহাস্যে সৌম্যশান্ত রমণীকান্ত কুমারের ধ্যানমন্ত্র পাঠ শোনেন।

রাত্রি নামে। কুমারের চোখে ঘুম নেই। খোলা জানালা দিয়ে পশ্চিমের পাহাড় তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। বুকের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, ওই গাছগাছালির ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ী গুহাতেই লুকিয়ে

আছে আশ্চর্য জগত। যেখানে হয়, নয় হয়ে যায়। কুমার নিবিড়ভাবে তাকিয়ে দেখে। জীবনে অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে। কুমারের কৌতূহল মাখা চোখে অন্ধকার এক অসহ্য সুন্দর ভাষা নিয়ে কথা কয়। ডাকে। হাতছানি দেয়। পশ্চিম পাহাড়ের ডান দিকে হঠাৎই একটা আলো জ্বলে ওঠে। নীল আলো। একপলক দেখা দিয়েই ফের গাছপালার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ কুমার মনে মনে নাড়ি ছেঁড়া টান অনুভব করে।

শব্দ না করে দরজার ছিটকিনি খোলে ত্রস্ত হাতে। তারপর মনে মনে গুরু প্রণাম সেরে দ্রুত মিশে যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। এখন কৃষ্ণপক্ষ। স্তূপ স্তূপ মেঘের ফাঁকে চাঁদ কোথায় যেন ডুবে গেছে। চারদিকে থৈ থৈ অন্ধকার। ভরসা শুধু ক'টি নক্ষত্র।

নক্ষত্রের আলোয় পাহাড়ী পথ ভারি মায়াময় হয়ে ওঠে। রাস্তায় ছিটকে সরে যায় সোনামুখী বোড়া সাপ। কুমারের তবু ভয় নেই। পশ্চিম পাহাড়ের সেই নীল আলো ফের দেখা যায়। এত টিমটিমে তার রং, যেন কেউ ঢাকনা পরিয়ে রেখেছে। সেই আলো চুম্বকের মত টানতে থাকে।

ইন্দ্রমোড়ের পর থেকেই পাহাড়ের পথ চালু। সামনে বিশাল হাঁ-মুখ খাদ। এত আঁধারে সেথায় চোখ চলে না। শুধু থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতলে আরও ডাইনে অনেক নীচ থেকে জলস্রোতের কলকল শব্দ কানে আসে। চালু পথে পা পিছলালেই অবধারিত মৃত্যু। ভয়হীন কুমার ঝড়ের বেগে নামতে থাকে। তার পায়ে লেগে পাথর ঝরার শব্দ হয়।

খাদের ঠিক মাঝ বরাবর জলধারার শুরু। পাহাড়ী অসমীয়ারা বলেন, অতলধারা। এই জল কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। শেষ বর্ষার জল পায়ে লাগলে কাঁটার মত বেঁধে। কনকনে জলের ছোঁয়ায় পা হিম হয়, শরীর হিমে হিটিহিটি করে।

হাঁটু জল, কোমরজল, গলাজল! কুমার কোনমতে পেরিয়ে যায় অতলধারা। পাড়ে উঠতেই পাহাড়ী কাঁকড়া পায়ে দাঁড় বেঁধায়। তাকে ছাড়াতে পা থেকে রক্ত ঝরে। কুমারের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পরনের কাপড় খুলে নিঙড়ে নেয়। তারপর ভিজে কাপড়েই পশ্চিম পাহাড়ের পা ছোঁয়।

এখানে গাছপালা একটু পাতলা। তবে সেই অর্থে পায়ে চলার পথ বলে কিছু নেই। খাড়াই পাহাড়, পথ বলতে শুধু থাক্ থাক্ পাথরের চাটান। ইতস্ততঃ শাল সেগুনের মেলা। কুমার কোনমতে গাছের ডাল ধরে চড়াই উৎরাই রাস্তায় নীল আলো লক্ষ্য করে চলে।

মাইল খানেক পর থেকে খাড়াই পাহাড়ের শরীরে হঠাৎ একটা খাঁজকাটা জায়গা। ক্রমে সেটা খানিক সমতলভূমির মত হয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে কুমার পৌঁছে খানিক দম নেয়। চোখ চারিয়ে তাকায় চতুর্দিকে। এখন আর নীল শিখাটা দেখা যাচ্ছে না।

গাছপালা ফের এখান থেকে ঘন হতে শুরু করেছে। এদিকটায় ঝোপঝাড়ও একটু বেশি। কুমার ডান দিকে খানিকটা এগোয়। ওদিকেই তো শেষবারের মত নীল শিখাটা দেখা গেল।

কিছুদূর এগোতেই পরিষ্কার একটা গোলাকার জায়গা। যেন কেউ ঝোপঝাড় গাছপালা চেঁছে সাফ করে রেখেছে। আর তারই উল্টো দিক থেকে সরু সিঁথির মত বেরিয়ে গেছে পায়ে চলা রাস্তা। কুমার সেদিকে এগিয়ে যেতেই রাস্তা শুরুর মুখে দুখানি ঘট দেখতে পায়। তাতে এখনও কাঁচা বেলপাতা, কিছু গাঁদা ফুল এবং দুছড়া নীল অপরাজিতার মালা।

সরু রাস্তাটি বড়ই রহস্যময়। নিয়মবদ্ধ তিন হাত ছাড়া ছাগলের মড়ার খুলি সারিবদ্ধভাবে পোঁতা। তারই মাঝে মাঝে সিংসহ মহিষের মুণ্ড।
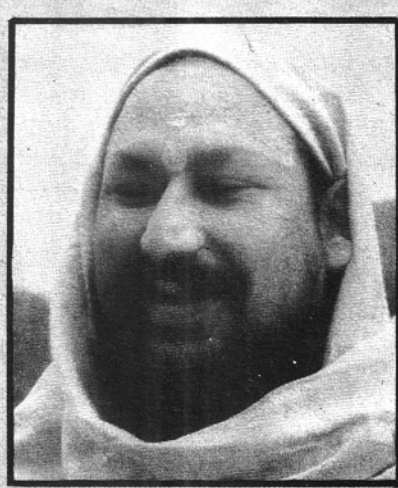
ভাল করে শুনতে কুমার গুহাগাত্রে কান পাতে। কারা যেন কি মন্ত্র পড়ছে। মন্ত্রের সবটা বোঝা না গেলেও শ্লোক শেষের 'নমো কামাখ্যায়'টি বেশ বোঝা যায়। উত্তেজনায় কুমারের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

প্রতিটি খুলিতেই সিঁদুর মাখানো। আর খুলিগুলোর মাঝ বরাবর লাল টকটকে পঞ্চমুখী জবা ফুল। কাণ্ড দেখে কুমারের বুক শিরশির করে ওঠে।

এরকম ত্রিশ/চল্লিশ হাত চলার পর এক প্রকাণ্ড পুত্রজীবা গাছ। তারই তলা থেকে শুরু এক প্রকাণ্ড অন্ধকার গুহামুখ। এত অন্ধকার যে কুমারের চোখ চলে না। কুমার খানিক ইতস্ততঃ করে। যাওয়া কি উচিত হবে? এই গুহা পর্যন্ত আসাই যখন এত ভীষণ, এর ভেতর না জানি আরও কত ভীষণ। তা হোক, রহস্যভেদ করতেই হবে। কুমার এগিয়ে যায়। আর তখনই চোখে পড়ে গুহামুখের পাশে সেই ভয়ংকর সিংহ-মুখটা।

সিংহ মুখ! কুমারের তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় সারা দেশে চাউর সেই গল্পকাহিনীটা: 'সিংহ ডাকলেই লিঙ্গ খসে এখানে'। কথাটা যে ভাবেই প্রচার হোক, আসলে সাধন পীঠে লিঙ্গ ব্যবহার নিষিদ্ধ। অর্থাৎ মহা পুণ্যক্ষেত্র কামরূপ কামাখ্যায় কোন রকম ব্যাভিচার বা উপাচার চলবে না। এই যে থেকে থেকে ছাগমুণ্ড সাজানো। এই ছাগমুণ্ড শাস্ত্রঅর্থে কামভাবের প্রতীক। সেই কামকে বলি দিয়ে তার নিহত মুণ্ডের উপর পা দিয়ে (অর্থাৎ জয় করে) মাতৃসাধনা করতে হবে। সিংহমুখ সেই অনুশাসনের ছবি। কুমার অতিজাগতিক উপলব্ধির শেষে গুহামুখে ঢুকে পড়ে।

গুহাপথ বড়ই পিছল। যেন রাস্তায় শ্যাওলা পড়ে গেছে। কুমার সামান্য ঝুঁকে পড়ে। নখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গুহার তলদেশ। না: শ্যাওলার চিহ্ন মাত্র নেই। অবাক হয়। আসলে পিচ্ছিল মনে হচ্ছে। মানুষের মনই সবচেয়ে বড় বোঝদার। সে যা বোঝে, মানুষ তাই বোঝে। আর সত্যিই তো পথ বড়ই পিচ্ছিল। সাধনার পথ পিছলে যাবার ভয় থেকেই এই বোধের জন্ম।

কিছুটা এগোতেই কথাবার্তা কানে আসে তার। কুমার ভাল করে শুনতে গুহাগাত্রে কান পাতে। কারা যেন কি মন্ত্র পড়ছে। মন্ত্রের সবটা বোঝা না গেলেও শ্লোক শেষের 'নমো কামাখ্যায়'টি বেশ বোঝা যায়। উত্তেজনায় কুমারের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

দশ পা বাদেই মোড়। মোড় ঘুরতেই সামনের পথ জুড়ে এক কারুকার্যময় দেওয়াল। চোখ ধাঁধানো সাদা রঙ তার। সেই দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসছে মন্ত্ররব। তা এখন আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট। অনেক ভাল বোঝা যায়।

কুমার দেওয়ালে হাত রাখে। কৌতূহল মেটাবার রাস্তা না পেয়ে নিরুপায় আক্রোশে পর পর তিনটে ঘুষি মারে। ফাঁপা দেওয়ালে শূন্যতার ঢং ঢং শব্দ হয়। তিনটে ঘুষি মারার পরই কুমার নিজের হাত দেখে অবাক হয়ে যায়।

হাতে গুরুর দেওয়া তামার কবচ। তাতে কামাখ্যার রক্ত বস্ত্রের টুকরো আছে। দেওয়াল ভেদ করে কানে আসা 'ওঁ কামাখ্যায়' যেন কুমারের বুকের মধ্যে তিমির মত ঘুরপাক খাচ্ছে। আর হঠাৎই কবচটা হয়ে ওঠে আলোকময়। ক্রমে সেটা বাড়তেই থাকে।

এবার কুমার যেন একটু ভয় পেয়ে যায়।

এ কি সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড রে বাবা ! হাতের কবচটা দেখতে দেখতে কুমার সরে । ঠেস পড়ে সেই রহস্যময় সাদা দেওয়ালে । এক সময় কবচটার সঙ্গেই ঘষা লেগে যায় দেওয়ালের । আর অমনি সেই অতি অদ্ভুত কাণ্ডটা !

কুমারকে হতভম্ব করে দেওয়ালটা দুভাগ হয়ে সরে যায় । সামনের খোলা পথে চোখে পড়ে একরাশ হু হু আগুন । ঠিক তার উপরেই নাচছে এক এলোলায়িতকুন্তলা নগ্ন যুবতী । আর সেই আগুন ঘিরে চিৎ করে পাতা আটখানি ধারালো খড়গের উপর নাচছে আটজন নগ্ন যুবতী । বয়স তাদের বার তের'র বেশি হবে না ।

কুমারের ভেতরটা হিম হয়ে যায় । সে আরও দেখে হু হু করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে কুশিতে করে এক রক্তবাস তান্ত্রিক আহুতি দিচ্ছেন ঘি । তাতে মাঝেমধ্যে আগুনের ঝলকানি বেড়ে যাচ্ছে । আর সেই নৃত্যরতা যুবতীদের চারপাশে নেচে নেচে ঢাক-ঢোল-করতাল বাজাচ্ছে আরও ছয় জটা-জুটধারী সন্ন্যাসী । পরনে তাদের কাল রঙ-এর বস্ত্র ।

যিনি বসে আহুতি দিচ্ছেন, তার সামনে অগ্নিকুণ্ড বরাবর দুখানি ঘট । তাতে আম, আশুদ, বট, বকুল ও কাঁঠালের পঞ্চপল্লব । একটি ঘটে পদ্ম ও অন্যটিতে নাগফণা ।

নৃত্যরতা ৯ জন কুমারীর মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের উপর যিনি নাচছেন তিনি সবচেয়ে সুন্দর ও নিখুঁত । কুমার অনুভব করে, এ সৌন্দর্যে বিন্দুমাত্র খরতা নেই । চাঁদের কিরণের মত এ সৌন্দর্য । যার পদমূলে শুধুমাত্র বিনম্র ভক্তি উপহার দেওয়া যায় ।

আজ পয়লা ভাদ্র । কুমারের মনে পড়ে যায় 'দেওধ্বনি' । কিন্তু এ উৎসব তো পঞ্চরত্ন মন্দির-মধ্যে হওয়ার কথা । সেখানে পাণ্ডারা থাকেন । তবে ! এখানে এই পাহাড়-মধ্যে সপ্ত সন্ন্যাসীর যজ্ঞকুণ্ডে এই ৯ জন কুমারী দেওধা এলেন কোথা থেকে ? অগ্নিকুণ্ডের উপর কে ওই অপরূপা নাচুনী । তবে কি.....।

প্রশ্নটি মনে জাগতেই কুমারের চোখের সামনে পরিবেশ বদলাতে থাকে । থেমে যায় ঢাক-ঢোল । অগ্নিকুণ্ডের কুমারী হঠাৎ নীলরূপ ধারণ করেন । তাঁর সেই নীলাভ জ্যোতির কাছে অগ্নিকুণ্ডের দ্যুতি ম্লান হয়ে যায় । কুমারী নারীরূপ ধারণ করেন । কুমার এতক্ষণে পদ্মাসীনা সেই নীল নারীকে চিনতে পেরে যায় । আকুলি বিকুলি করে উঠে বুক । প্রাণপণ চীৎকারে কুমার ডেকে ওঠে–মা !

কুমারের চোখের সামনে আচমকা নিভে যায় সব আলো । গাঢ় অন্ধকার ঝুপ করে নামে কুমারের মাথায় । হারিয়ে যায় ওইসব অদ্ভুত রক্তজল করা দৃশ্য । এক অস্বাভাবিক আনন্দ যন্ত্রণায় কুমার অজ্ঞান হয়ে যায় ।

জ্ঞান যখন ফেরে তখন রাতের তিন প্রহর ফুরিয়ে গেছে । অতলধারার উল্টো তীরে শুয়ে কুমার আকাশের বুক দেখতে পায় । পাহাড়ী ঠাণ্ডা বাতাসে কুমারের গায়ে কাঁটা দেয় । শির শির করে ওঠে ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে তাকায় কুমার । নাঃ, সেখানে কেউ কোথাও নেই । চারদিকে চোখ চালায় । কোথায় গেল নীল নারী ? কোথায় বা সেই সপ্ত সন্ন্যাসী ? গুহাও নেই, নেই নগ্ন নারীদের ভাবনৃত্য, তবে কি সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল ! কুমারের বুকের ভেতর কুশকাঁটার মত প্রশ্নটা বিঁধে যায় ।

না । কামাখ্যা পাহাড় থেকে অতলধারা অব্দি আসা এতো মিথ্যে নয় । কাঁকড়ায় কাটা পায়ে রক্তের দাগ সেও মিথ্যে নয় । কুমার নিজের হাতের দিকে তাকায় । আরে, গুরুর দেওয়া সেই রক্তবস্ত্রের কবচটা কোথায় ? আতিপাতি করে
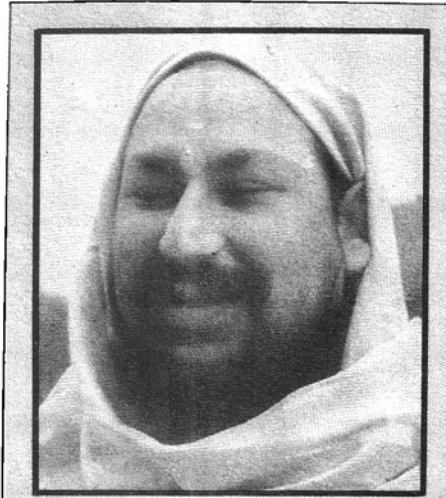
কুমারের চোখের সামনে আচমকা নিভে যায় সব আলো। গাঢ় অন্ধকার ঝুপ করে নামে কুমারের মাথায়। হারিয়ে যায় ওইসব অদ্ভুত রক্ত জল করা দৃশ্য। এক অস্বাভাবিক আনন্দ যন্ত্রণায় কুমার অজ্ঞান হয়ে যায়।

চতুর্দিকে খোঁজে কুমার । ফের অতলধারা পার হয় । হায়, কোথায় কি ! হারিয়ে গেছে কবচ । ভয়ে কুমারের বুক ঢিব ঢিব করে ওঠে । কি বলবেন গুরুদেব ! আরও খানিক ঝিম মেরে বসে থাকে সে । কোন ভাবেই কুল মেলাতে পারে না । অগত্যা মলিন মুখে কামাখ্যা পাহাড়ের পথ ধরে ।

গুরুদেবের কাছে পৌঁছতে আকাশে অরুণের আভা । শ্রান্ত কুমার স্মিত-গুরু রমণীকান্তের পা ছোঁয় । গুরু হাসেন । তারপর তাঁর সেই স্বভাব-মধুর গলায় বলে ওঠেন : মাকে দেখলে !

চমকে ওঠে কুমার । সচকিত চাউনি চলে যায় সদগুরুর মুখে । সেখানে হাসি ও প্রশ্রয় চিকচিক করছে । কুমার মাথা নত করে ।

মাকে দেখে কেমন লাগল ?

এ দেখা তো চুরি করে দেখা বাবা ! এতক্ষণ পরে কুমারের মুখ দিয়ে কথা বের হয় ।

তবু তো দেখা । দেখে কি বুঝলে ?

কুমার নিশ্চুপ । নতমুখ ।

এও এক প্রতীক । দেওধ্বনির মানে বুঝেছো কিছু ?

কুমার অসম্মতির ঘাড় নাড়ে ।

বসো দাওয়ায় ।

কুমার গুরুর আদেশে পায়ের দিকে বসে পড়ে ।

আগুন হল সাধনার প্রতীক । সাধনার আগুনে নিজেকে পোড়াতে পারলে নিজের মধ্যেই মাকে পাবে । মনে রেখো 'সোঽহং'– আমিই সে । আমিই মা, মা-ই আমি । আর মায়ের বর্ণ যে নীল, নীল হল অনন্তের প্রতীক । মা অনাদি-অনন্ত । সেই অনাদি অনন্ত মাকে পেতে উদ্দাম নৃত্য অর্থাৎ বাঁধনহারা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন । নিজের ষড় রিপু এবং এক আত্মার পূর্ণাহুতি । সপ্ত সন্ন্যাসীকে চিনলে ?

না ।

এরাই সপ্ত সন্ন্যাসী । এদেরই আহুতি দিতে হবে । দমন করা নয়, জয় করতে হবে । এ মূলত গুপ্তমার্গের রহস্য । জগজ্জননী কৃপা করে তোমাকে দেখিয়ে দিলেন বৎস । এ হল তাঁর অহেতুক কৃপা । তাঁর প্রতি তোমার আকুলতা, তোমার টান, তোমাকে দেখিয়েছে এক অলৌকিক প্রতীকি দৃশ্য ।

কিন্তু আপনার দেওয়া মহামূল্যবান কবচ আমি যে হারিয়ে ফেলেছি বাবা ।

রমণীকান্ত কুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন অসীম স্নেহে । –তোমার হারাবার কিছুই নেই বাবা । যে মাকে এমন করে খুঁজতে পারে । সে কিছুই হারায় না । তার সব কিছুই মায়ের কাছে গচ্ছিত থাকে । সেটি মাকে দেখার কাজে লাগার জন্যই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল বাবা । সেটি ছাড়া তুমি যে এই মহারহস্য ভেদ করতে পারতে না বাবা ।

ততক্ষণে পূব আকাশে তামাম অন্ধকার ছিঁড়ে উঠে আসছে সোনার থালার মত সূর্য । গুরু-কৃপায় শান্ত কুমার নিজের মধ্যে সে সূর্যকে অনুভব করে । বুকটা আলোয় ভরে যায় ।

[ক্রমশঃ]

৬৫ পৃষ্ঠার পর
নিয়েছিল বড় মেয়ের বিয়ে দিতে। শোধ না করতে পারায় এতদিনে তা বাড়তে বাড়তে চক্রবৃদ্ধি সুদে হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। আজ সাহেব তার দুই বাঙালি হিসেববাবুকে নিয়ে এসেছেন একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে।

খেতে না পাওয়া টোনির রোগটি বড় বিষম। একেবারে রাজরোগ। যক্ষা যাকে ধরে তার কি গরীব হলে রেহাই আছে! তেমনি ক্ষয়রোগ যক্ষা দিনে দিনে টোনিকে কুরে খেয়েছে। বাড়িতে আপন বলতে একমাত্র মেয়ে রিমা। রিমা কুমারীর সোমত্ত বয়স, তবু রোজগারের ধান্দায় তাকেই যেতে হয় বাগানে চায়ের পাতা তুলতে। ওই বাঙালি বাবুরাই তাকে এই পার্টটাইম কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে।

গত তিন-চারদিন ধরে রিমা কাজ করতে যায়নি। বাঙালিবাবু তাকে নাকি কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। কুপ্রস্তাব বলে কুপ্রস্তাব! সাহেব কর্তার 'বেডরুম ডিক্সনারি' হবার প্রস্তাব। রাজী হয়নি রিমা কুমারী। তাই সদলবলে খোঁজ নিতে আসা।

রিমা কুমারী নেপালী ঘরে টগরের ফুল। যেমন রূপ, তেমনি যৌবন। তার ষোল বছর বয়স যেন আগুনের হাতছানি দেয়। এ হেন সুন্দরী যুবতীর দিকে যে চা বাগিচার জন্তুরা হাত বাড়াবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

বাবার পেছন পেছন ঘরের বাইরে এসে থ হয়ে যায় যুবকটি। তখন সাহেবের পায়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে টোনি। 'সাহেব আমার মা-বাবা। তোমার লোকজন আমার একমাত্র মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। তাকে ফিরিয়ে দাও সাহেব। তার ইজ্জৎ লুট কোর না। তাহলে সে আত্মঘাতী হবে।'

সাহেব হাসতে হাসতে অস্বীকার করে ব্যাপারটা। গোর্খা যুবকটির মনে হয় যেন হায়না দাঁত বার করে হিংস্র হাসি হাসছে।

সাহেবের হয়ে হিসেববাবু দাঁত বার করে বলে: তোমার মেয়েকে আমার লোক নিয়ে যাবে কেন? আমি টাকা পাই—সেটাই চাইতে এসেছি। দিয়ে দাও—চলে যাই। যারা তোমার মেয়েকে নিয়ে গেছে কাজ হয়ে গেলে তারা নিশ্চয় ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সাহেব এখানে আসার পাঁচ দশ মিনিট আগেই আট-দশজন ,ষণ্ডা মার্কা লোক জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেছে রিমা কুমারীকে। রিমা সন্ধ্যার মুখে বেরিয়েছিল জল আনতে। তখনই লোকগুলি তাকে ধরে। তার চীৎকার বস্তির লোকজনকে বাইরে টেনে আনবার আগে রিমা হাওয়া। এবং বস্তিতে সাহেবের আগমন।

বেশি কান্নাকাটি,পা জড়িয়ে অনুনয় বিনয় হতেই সাহেব এক ঝটকায় পা সরিয়ে নেয়। টোনির বুকে বুটের লাথি বাজে। সে ছিটকে পড়ে উঠোনের পাথর চাঁইটার কাছে। পাথরে লেগে টোনির কপাল কাটে। রক্ত ঝরতে থাকে। গার্ডেনবাবু বুদ্ধিমান ঘিসিং প্রতিবাদ করতে বাঙালি বাবুদের হুমকির কাছে তিনি অপমানিত হন। সাহেব বেরিয়ে যায় সদলবলে।

ভোর রাতে রিমা আসে। তার পরনের ঘাগরা তখন ফালা ফালা করে ছেঁড়া। শতচ্ছিন্ন ব্লাউজে উদগ্র যৌবন ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। বস্তির লোক জাগার আগেই সামনের গাছে রিমা গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে। সকালে সকলে উঠেই মৃতা রিমাকে ঝলন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করে। তখন তার শরীরের চতুর্দিকে মানুষ-পশুর দাঁত ও নখের দাগ দগদগ করছে।

আজ এই মৃত্যুপথযাত্রী নাগা গেরিলার শেষ কথাটি শুনে যুবক সৈন্যটির সেদিনকার কথা মনে পড়ে যায়। শেষ গুলিটি বুক পেতে নিয়ে গেরিলাটি শেষবারের মত ইংরেজিতে বলে ওঠে: তোমরা ভারতবাসী হয়ে কেন আমাদের উপর এভাবে আঘাত হানছ? আমরাও তো ভারতবর্ষের অধিবাসী; মাটির জন্য লড়ছি আমরা। মাতৃভূমির জন্য। এই দেশ, এই মাটি আমাদের। অথচ বিদেশী ভিনরাজ্যের মানুষজন এসে আমাদের সম্পদ চুরি করে। আমাদের মা বোনেদের ইজ্জৎ নেয়। আমরা সেই শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচারের প্রতিবিধান করতেই লড়ছি। তবে কেন একজন মানুষ হয়ে আমাদের এমন করে গুলি করে মারছ?

রাইফেল নামিয়ে টেন্টে ফিরে যায় যুবক। তুষার-ছোঁয়া নাগাল্যান্ডের হিমশীতল রাত তাকে যেন চাবুক মেরে বেড়ায়। কুকুরও তো নিজের পেট ভরাতে পারে। আর মানুষ হয়ে আমি এরকম কাজ করব? আমার মা বোনের ইজ্জতের উপর কেউ হামলা করলে আমি কি চুপ করে থাকব?

এই যুবক দার্জিলিং-এর 'আলো চিহান' এবং 'কচ্চা বাটো' উপন্যাসের লেখক সুবাস। সুবাস ঘিসিং। ১৯৩৬ সালের ২ জুন মঞ্জু চা বাগানে সুবাস জন্মগ্রহণ করেন। সিংবুল টি এস্টেটে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর দার্জিলিং শহরের সেন্ট রবার্টস স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তারপর ১৯৫৩সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল শাখার ৮ নং গোর্খা রেজিমেন্টে একজন জওয়ান হিসাবে যোগ দেন। এর দুবছর পর সামরিক বাহিনীতি থাকতে থাকতেই পাঞ্জাব বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমে স্কুল ফাইনাল পাস করেন। এরপরই নেমে পড়তে হয় 'অপারেশন ফিজো' কর্মকাণ্ডে। সেখানেই কবি-লেখক সুবাস ২৩ বছরের জন্মদিনে মুখোমুখি হলেন নিজস্ব বিবেক বোধের।

কিছুদিনের মধ্যে সুবাস সেনাবাহিনী ছেড়ে ফিরে এলেন দার্জিলিং-এ। ভর্তি হলেন দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে। স্নাতক হবার আশায়। এই সময়েই তিনি ৩৯ টাকা বেতনে তিনধারিয়ার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেনাবাহিনী ছেড়ে এসেই তিনি তাঁর সৈনিক জীবন নিয়ে লেখেন চাঞ্চল্যকর উপন্যাস 'লুখুম ক্যাম্প'। 'মানুষ সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন নিয়ে বাঁচবে, ইতরের মত নয়, কুকুরের মতও ...' একথাই বলা হয়েছে উপন্যাসের উপসংহারে। কলেজে পড়াকালীনই সুবাসকে জেলখানায় যেতে হয়। এবং জেলে বসেই তিনি ফাইনাল পরীক্ষা দেন।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য সুবাস নিজ-ব্যর্থতায় দারুণ মানসিক আঘাত পান। ১৯৫৯ সালে গিঙটি টি এস্টেটের সূর্য ইয়োনজনকে বিয়ে করেন। কিন্তু ভাগ্য যার কপালে দু:খের টিকা পরিয়ে

স্ত্রী ধনকুমারীর সঙ্গে সুবাস ঘিসিং

রেখেছে, তার বিয়ে করলেই কি কপাল ফেরে? অথবা যাকে অনেক বড় যুদ্ধের নায়ক হতে হবে, তার কপালে ব্যথা বেদনার নিরন্তর আঘাত তো থাকবেই।১৯৬১ সালে ইয়োনজোনের সঙ্গে সুবাসের ডিভোর্স হয়ে যায়।

এরপরই সুবাসের কলম যেন দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। পরপর তিনি ২১টি কবিতাগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেন। 'নীলোচোলি,' 'আলো চিহান,' 'ফুলমায়া', 'চোট,' 'জওয়ানি কো হত্যা,' 'খোক্রো মানছে,' 'বিশ্বাস' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে তিনি নেপালী ভাষার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। চা বাগিচা কর্মীদের জীবনযাপন, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা—মূলত মানুষের বেঁচে থাকার পিছনে কান্না ও রুদ্ধ হতাশাকে সুবাস তাঁর কাহিনীগুলিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এতসব কর্মকাণ্ডেও সুবাসের মনে মাঝে মধ্যেই ভেসে উঠত মিরিকের মঞ্জু চা বাগানে ঘটে যাওয়া টোনি রিমার সেই দৃশ্যটি। খচখচ করে উঠত বুক। তখন সুবাস সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতেন। ভাবতেন অন্যায়কে প্রতিরোধ করার কথা।

সেই স্বপ্নই ১৯৬৪ সালে সুবাসকে ঠেলতে ঠেলতে গণসংগ্রামের মুখে এনে ধরে। মার্চ মাসে একই আদর্শের বন্ধুদের নিয়ে সবাস তৈরি করেন 'তরুণ সংঘ'। এটি দার্জিলিং জেলার নেপালী যুবকদের সংগঠন। এই তরুণ সংঘই ১৯৬৬ সালে পাহাড়ী জেলায় প্রথম জংগী নেপালী আন্দোলনের সূচনা করে। সেই প্রথম নেপালীদের উগ্র বিক্ষোভ।

এরপর ১৯৬৮ সালে দার্জিলিং জেলার রাজনৈতিক মহল চমকে উঠল 'নীলে ঝাণ্ডা'র আবির্ভাবে। ওরা যে কোন সভাসমাবেশ কিংবা মিছিল মিটিং-এ নীল স্যালুট করত। নেপালী যুবকদের ওই সংস্থাটির দলীয় পতাকাও ছিল নীল রঙের। ১৯৭৯ সালে সুবাস 'প্রান্তীয় মোর্চা' দল গড়ে গোর্খাদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবি চাউর করেন।

গত বছরের ১ আগস্ট দার্জিলিঙের নেপালী পাড়ায় খবর এল কালিমপঙ শহরের ছোট্ট মেয়ে সঙ্গীতা প্রধানকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। আরও পরে খবর এল, একা সঙ্গীতা নয়, সঙ্গে ৩২ জন

নিরপরাধ নেপালী যুবক পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে। জ্বলে উঠল আগুন। দার্জিলিং শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে গইলভঞ্জনগরের মাঠে গোপনে জমা হতে লাগল কুকুরি হাতে নেপালী যুবকরা। এলেন লামা পুরোহিত। দেবী চোমো-লুঙমা, ভগবান বুদ্ধ এবং সুবাস ঘিসিং-এর ছবির সামনে কুকুরি ছুঁয়ে ১৪ হাজার গোর্খা যুবক শপথ নিল: 'বঙ্গাল দেকি মাটো ফিরতো লিনছো' অর্থাৎ বাংলা থেকে আমাদের মাটি ছিনিয়ে নেব।

এই স্লোগানটি গত বছরের ২৬ জানুয়ারি সুবাস ঘিসিং প্রথম প্রচার করেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, 'বঙ্গাল হামরো চিহান হো' অর্থাৎ বাঙলা আমাদের কবরস্থান। এখানে আমরা নিজভূমে পরবাসী। আমাদের মাতৃভূমিতে সমতল থেকে ওরা আসে। ব্যবসা করে। সম্পত্তি গড়ে। মনে রাখে না আমাদের কথা। আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বাঙালির সরকার চিন্তা করে না। তাই আমরা চাই আমাদের মাতৃভূমি: প্রথম গোর্খা-ল্যাণ্ড। আর প্রয়োজনে কুকরির সাহায্যেই আমরা তা আদায় করে নেব।'

কুকরি নেপালীদের পবিত্র অস্ত্র। দেবী চোমো-লুঙমার বিপদনাশী হাতিয়ার তা। কুকরির মাধ্যমে গোর্খাল্যাণ্ড আদায় করার ঘোষণা কি রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলে? ১০ আগস্টের ঘটনা তো সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার সংকেত দেয়। সত্তর দশকের অগ্নিমানব কানু সান্যাল এই উত্তর-বঙ্গেরই নকশাল নেতা। হঠাৎই তাঁর কাছে এলেন সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত 'গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট,' সংক্ষেপে জি এন এল এফ-এর জোড়-বাংলো এলাকার বি এস দেওয়ান। তিনি এক-কালের রক্তাক্ত গণ-বিপ্লবের নেতা কানু সান্যালের হাতে তুলে দিলেন সুবাস ঘিসিং-এর গোপন চিঠি।

এদিকে পানিঘাটায় গোর্খাল্যাণ্ডপন্থী জি এন এল এফ-এর আন্দোলনে নিমা থিং নামে এক কর্মী পুলিশের গুলিতে মারা যান। ১৯ মে পানিঘাটায় তিন নকশালপন্থী গোষ্ঠী এক গোপন বৈঠকে বসল। বৈঠকে হাজির ছিলেন কানু সান্যাল, কেশব সরকার, প্রেমলাল শর্মা, নাথুরাম বিশ্বাস, অসিত দাস, পঞ্জাব রাও এবং সুভাষ দেবনাথ। তারপর নকশালদের তিন গোষ্ঠী ও.সি.সি. আর, পি.সি.সি., ও সি.পি. আই (এম এল) দলের তিন গোষ্ঠী ২৭ মে পানিহাটায় প্রকাশ্যে গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে সমর্থন করেন। সংবাদ দুনিয়ায় প্রকাশিত খবরমাফিক জানা যায়, কানু সান্যাল সুবাসকে পরামর্শ দেন সেকেলে অস্ত্র কুকরি দিয়ে কাজ হয় না, তীর ধনুক কিংবা আধুনিক অস্ত্র যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হয়।

ইতিমধ্যে দার্জিলিং হয়ে উঠেছে নেপালী-অনেপালীর যুদ্ধক্ষেত্র। নেপালী অনেপালীদের মধ্যে একমাত্র সি পি এম সমর্থকরাই বেশি। অন্য রাজনৈতিক দল একেবারে চুপচাপ। প্রতিদিন চা বাগানে দুই গোষ্ঠীর মারামারি চলছে। সুবাস অভিযোগ করেছেন, গোর্খাপন্থীদের খতম করতে সি পি এম তার কর্মীদের হাতে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছে। এরই পরিণতিতে আক্রান্ত হয়েছে সি পি এম অফিস এবং সংসদ সদস্য আনন্দ পাঠক নিজে।

বিমান বসু: উত্তরবঙ্গ নিয়ে চিন্তিত?

শিলিগুড়ি থানা থেকে সুবাস সহ ১০৩ জন গোর্খাল্যাণ্ডপন্থীর বিরুদ্ধে পুলিশ ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। এই মামলার এফ.আই.আর.-এ প্রথম আসামী হিসাবে নাম আছে জি.এন.এল.এফ. প্রধান সুবাস ঘিসিং-এর। এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি, ১৫৩ বি ধারায় অভিযোগ আছে। অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং বেআইনী অস্ত্র সংগ্রহ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য-কলাপে মদত দেবার অভিযোগ আছে। সেইসঙ্গে এদের বিরুদ্ধে জনশৃঙ্খলা রক্ষা আইনের ৯ এবং ১০ নং ধারাতেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

৩রা অক্টোবর রাতে কলকাতা শহরে ক্যাল-কাটা হসপিটালের এক বিশেষ কেবিনে ভর্তি হওয়া রোগীর কাছ থেকে কলকাতা পুলিশ জি. এন.এল.এফ আন্দোলনের আর একটা মারাত্মক দিক তুলে ধরল। যা সুবাস ঘিসিং-এর নবতম কৃতিত্ব!

ওই শুক্রবারের রাতে ক্যালকাটা হসপিটালের দুজন তরুণ ডাক্তারের উদ্যোগে কলকাতা পুলিশ ৩৫ বছরের সোনী শেরপার ভর্তি হওয়ার খবর পান। কলকাতা পুলিশের উগ্রপন্থী দমন সেলের গোয়েন্দারা খবর পেয়েই হাসপাতালে যান। সে-খানে তখন দার্জিলিং-এর সংঘর্ষে আহত সোনী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

কলকাতা পুলিশের কাছে মৃত্যুকালীন জবান-বন্দীতে সোনী শেরপা বলেছে: আমি সুবাস ঘিসিং-এর কাছের লোক। সম্প্রতি সুবাস ঘিসিং ভারতীয় প্রশাসনের মোকাবিলা করতে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গোর্খা সৈন্যদের নেতৃত্বে একটি গোপন সুইসাইড স্কোয়াড গঠনের আদেশ দেন। সেইমত একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠিত হয় কয়েকমাস আগে। আমি নিজে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্র্যাক মাউন্টেনিয়ারিং ডিভিসনের সৈনিক এবং সুইসাইড স্কোয়াডের প্রধান।
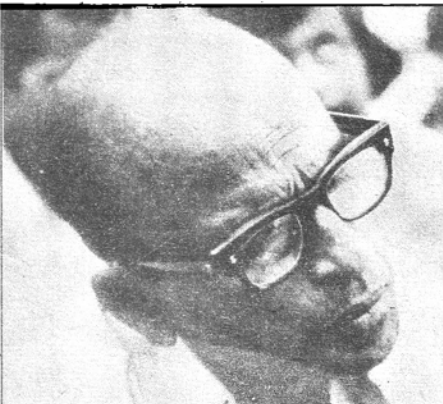
কানু সান্যাল: সুবাস ঘিসিং-এর পরামর্শক?

'আরমি ডেসারটার' বা পলাতক যোদ্ধা সোনীর জবানবন্দী থেকে এটাও জানা যায় যে, ভারত-নেপাল সীমান্তের ওপারে তরাই বনাঞ্চলে একটি গোপন ঘাঁটিতে এখন দলে দলে গোর্খাল্যাণ্ডপন্থীরা কমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য জমায়েত হচ্ছেন। তাদে-রকে সেখানে বিনা অস্ত্রে আনআর্মড ট্রেনিং এবং সশস্ত্র কমাণ্ডো যুদ্ধের কায়দায় গেরিলা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এবং প্রশিক্ষণ নেওয়া যুবকরা সকলেই নাকি সুবাস ঘিসিং-এর নামে শপথ নিয়েছে, 'প্রয়োজনে মরব, তবু আন্দোলনকে জোরদার করে যাব।'

সি পি আই (এম) সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য বিমান বসু সুবাস ঘিসিং সম্পর্কে এক বিতর্কিত অভিযোগ তুলেছেন। ভারত থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত করা হয়েছে। সেই চক্রান্তে এই দার্জিলিং-সিকিম-নেপাল অংশের ভারপ্রাপ্ত নাকি সুবাস ঘিসিং! বিখ্যাত আমে-রিকান গুপ্তচর এজেন্সি সি আই এ এই চক্রান্তের জাল বোনে। এর নাম 'অপারেশন ব্রহ্মপুত্র ব্লুপ্রিন্ট'। এ কাজের নীল নকশা আমেরিকার জর্জ ওয়াশিং-টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে জানতে চাওয়া হয়, চক্রান্ত সফল করতে কোথায় কি ইস্যু নিয়ে মুভ করা দরকার? উত্তর-পূর্বভারতের সাতভগ্নী-রাজ্য এই নীলচক্রান্তের শিকার। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুবাস ঘিসিং-এর মত একজন করে জংগী নেতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মিজোরামে লালডেঙ্গা, ত্রিপুরায় বিজয় রাংখল, মণিপুরে সনাবা সিং, নাগাল্যাণ্ডে টি. এম. টাংখুল এবং গোর্খা এলাকায় সুবাস ঘিসিং।

শিলিগুড়ি থানা থেকে ফৌজদারি মামলা দায়ের হবার পরপরই দার্জিলিং শহরের ডাঃ জাকির হোসেন রোডের বাড়ি থেকে সুবাস আত্মগোপন করেন। গোর্খাল্যাণ্ডপন্থীরা তাঁর নামে গোর্খা-ল্যাণ্ড ক্যালেণ্ডার ছাপিয়ে বিলি করেছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রী ধনকুমারী সুব্বা এবং দুই ছেলে মেয়ে। জি এল এন এফ কর্মীরা তাদের দেখভাল করছেন। আর কবি-সাহিত্যিক সুবাস হাতে রাইফেল তুলে নেবার ডাক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাহাড়ের পর পাহাড়। তিনি যেখানে যাচ্ছেন, আগুন জ্বলে উঠছে সেখানেই। তার জ্বালা পাহাড়ী আগুনের দমকে কি ভারতের মানচিত্রে উত্তরপূর্বভাগের একটা অংশ পুড়ে যাবে? নাকি তারই বলা কথা সফল হবে?: 'যদি ঘানা, সিসিলির মত অল্প জনসংখ্যার ছোট দেশগুলি স্বাধীন হয়ে রাষ্ট্র-পুঞ্জের সদস্য হয়ে যেতে পারে, তাহলে ৬০ লক্ষ গোর্খা তাদের নিজস্ব স্বাধীন ভূমি পাবে না কেন? কেন পাবে না গোর্খাল্যাণ্ড? কারো কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চাইলে কেউ তা দেয় না। লড়াই করে তা আদায় করে নিতে হয়।' আবার বাংলা ভাগ হবে কিনা তারই জন্য রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত নিয়ে অপেক্ষা এখন।

ছবি: মধুরিতা ঘোষ, কল্যাণ চক্রবর্তি

বিশেষ প্রতিবেদন

বিরোধী দলগুলির ভবিষ্যৎ কি ?

জ্যোতি বসু : বিরোধী নেতৃত্বে ?

ফারুক আবদুল্লা : কতটা বিরোধী ?

ভারতের বাইশটি রাজ্যের আটটিতে বিরোধী দলগুলি সরকার চালাচ্ছে। এই ৮ রাজ্যের তেইশ কোটি জনসংখ্যার শাসকরা কি কোনদিন দিল্লি দখল করতে পারবে ? রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসেরই বা অবস্থা কি ? বিরোধীদের শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যে বহুগুণা, বাজপেয়ী, চন্দ্রশেখর নতুন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, অন্যদিকে বিরোধীদের ছেড়ে গেছেন ফারুক ও শারদ পাওয়ার। শাসকদলের মোকাবিলায় বিরোধী দলগুলি কোথায় কি ভাবে এগোচ্ছে ? সর্বভারতীয় রাজনীতির নেপথ্য চালচিত্রের দিকে আমাদের প্রতিনিধি প্রকাশ নন্দার আলোকপাত।

ভারতীয় রাজনীতির আসরে প্রধান বিরোধী নেতারা বেশ কোন ঠাসা হয়ে পড়েছেন। শুধু কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ছাড়া আপাততঃ তাদের কোন কাজই নেই। লোক-দলের সভাপতি হেমবতী নন্দন বহুগুণা তো খবরের কাগজের লোকজনদের একরকম এড়িয়েই চল-ছেন। যদিও তাঁর দল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থানে ভাল ফল দেখিয়েছে, তবু দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে বহুগুণাজী রীতিমত চুপচাপ। তেলেগু দেশমের এন টি রামা রাও এক সময় 'কনক্লেভ পলিটিক্স'-এর সূচনা ঘটিয়ে সারা দেশে বিরাট হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য এ ধরনের আর কোনও উদ্যোগ আয়োজন চোখে পড়ছে না। শুধু রাজীব গান্ধী সরকারের কাছে বামপন্থী নেতারাই এখন একটা 'ফ্যাকটর'। তবে সেটা পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও কেরালায় সীমাবদ্ধ। এই বিরোধী শিবির হয়তো হিন্দির বলয়ে কিছুটা ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। ভারতীয় জনতা দলের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বীকার করেছেন যে, 'এই মুহূর্তে ভার-তীয় জনতা পার্টি কিংবা সর্বভারতীয় বিরোধী দল অথবা আঞ্চলিক দলগুলি কংগ্রেস আই-এর বিকল্প হবার মত অবস্থায় নেই। আমাদের আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' বাজপেয়ীর ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু এক সময় বেশ শোর-গোল তুলেছিল। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশে এদের আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ১৯৮৪ সালে বি.জে.পি. বড় রকমের ধাক্কা খায়। এর সূচনা ঘটে ১৯৮০ সালে। ১৯৭৭ সালের চোদ্দ শতাংশ ভোট এক লাফে ৮.৬ শতাংশে নামে।'৮৪ সালে ৭.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে লোক-সভায় মাত্র দুটি আসন পায় তারা।

ভারতীয় জনতা পার্টির মত অন্যান্য বিরোধী দলগুলি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর রাজনীতির প্যাঁচে ক্রমশ নুয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনীতির থেকে রাজী-বের রাজনীতি অনেকটাই অন্য ধাঁচের। তাঁর রাজনীতিতে কি ধীরে ধীরে বেহাল হয়ে পড়ছে বিরোধী দলগুলি ?

একজন মাঝারি শ্রেণীর বি.জে.পি নেতা মন্তব্য করেছেন যে বি.জে.পি. এখন কংগ্রেসের 'বি' দল। তেলেগু দেশমের সংসদীয় নেতা পি. উপেন্দ্র তো প্রধানমন্ত্রী রাজীবের ভাবধারায় মোহিত হয়ে পড়ে-ছেন। শ্রী গান্ধী তাঁর মায়ের নীতি গ্রহণ না করে নিজস্ব নীতিতে চলায় উপেন্দ্র যার পর নাই খুশি। রাজীব প্রায়ই সময় সুযোগে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে শলা পরামর্শ করছেন বলে পি. উপেন্দ্রর মুগ্ধতার শেষ নেই। তিনি বলেছেন: 'আমরা রাজীবকে প্রায়ই যে সমস্ত পরামর্শ দিই, তিনি তা গ্রহণ করেন।' বিভিন্ন বিল, কমনওয়েলথ

এইচ.এন. বহুগুণার ব্যবস্থাপনায় দিল্লিতে বিরোধী সম্মেলন

গেম বয়কট, সংরক্ষণ নীতির বিষয়ে, জাতীয় ঐক্যের বিষয়েও রাজীব বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ।

জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরের মতে, 'রাজীবের আকর্ষণীয় শ্লোগানে আমাদের বহু সহকর্মী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে শ্লোগানগুলি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ । রাজীব নাকি দেশকে একবিংশ শতকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন । এই চকমকে ফাঁকা বুলিতে অনেকেই মোহিত ।' তবে চন্দ্রশেখর স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের কিছুতেই বোঝাতে পারেন নি রাজীব সরকারের অনেক বড় বড় ভুল রয়েছে। বিশেষত প্রথম দেড় বছরে তিনি অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । কিন্তু ক্ষমতায় যাঁরা প্রথম আসেন তাঁদের প্রতি সবারই সহানুভূতি থাকে । সেইসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করাও বেশ কঠিন।

অধিকাংশ বিরোধী নেতা বুঝতে পেরেছেন যে তাদের এই পরিণতি ঘটেছে প্রধানত সংসদে নির্বাচিত না হওয়ার জন্যই । জনতা, লোকদল, বি জে পি গত নির্বাচনে পেয়েছে সব মিলিয়ে ১৫টি আসন । এই কারণে তাঁদের মনোবল অনেকটা নষ্ট হয়েছে । বি জে পি দলের নেতা এল কে আদবানির মতে, 'শুধুমাত্র সরকারি কাজের নিন্দা করে কোন ফয়দা হয় না । যদি আইন সভায় সদস্য হিসেবে উপস্থিত হওয়া যায় তবে সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা ফলদায়ক হয় ।' কিন্তু আদবানির বক্তব্য যদি সত্যি হয় তবে প্রশ্ন ওঠে যে বিরোধী দলগুলি যেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে পারছে না, সেক্ষেত্রে কিভাবে তারা নির্বাচনে জিতবেন ? নির্বাচনে পরাজিত হবার পর বিরোধী দলগুলি বুঝতে পেরেছে যে প্রথমেই জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফের জাগাতে হবে, নচেৎ ভোটে জেতা নিতান্তই দুষ্কর । কিন্তু এটা সচরাচর ঘটে না । এই বিরোধীদের অতীতে ভোটদাতা হিসেবে ছিলেন বুদ্ধিজীবী এবং শহুরে মধ্যবিত্তরা । এরা সংখ্যায় কিন্তু তেমন বেশি নয় । ফলে, ভোটের ব্যাপারে তাদের ওপর ভরসা করেও খুব একটা লাভ হয় না ।

অটল বিহারী বাজপেয়ী

এখনো পর্যন্ত বিরোধী দলগুলি সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারে নি। এই দলগুলির নেতারা এর বদলে শুধু বিবৃতি দিয়েই খালাস । যেমন, পাঞ্জাবে পরিস্থিতির জন্য ওরা শুধুমাত্র নিন্দার ঝড়ই বইয়েছেন, কিন্তু কেউই পাঞ্জাব পরিস্থিতি চাক্ষুষ দেখার জন্য পাঞ্জাবে যান নি । ওখানকার লোকজনদের কি সমস্যা, কষ্ট কোথায় তা জানবার জন্য তারা ব্যস্ত হননি । গত জুলাই-এ লোকদলের সভাপতি এইচ এন বহুগুণা রাজীব গান্ধীকে পাঞ্জাবের সর্বস্তরের মানুষের মনে ভরসা ফিরিয়ে আনতে একটি পদযাত্রা করার আহ্বান জানান । বহুগুণা কিন্তু রাজীব গান্ধী সাড়া দেন কিনা সেজন্য অপেক্ষা করলেন । নিজে আর কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিলেন না । কয়েক বছর আগে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যখন বিহারে পিপারিয়ার যাদবেরা উচ্চবর্ণের লোকজনদের হাতে খুন হল তখন লোকদল এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিরাট এক মিছিল করে । কিন্তু ১৯৮৫ সালে যখন ওই বিহারেই তপশীলী জাতিবর্গের লোকজনদের ওপর জঘন্যতম আক্রমণ করা হয়, তখন কিন্তু লোকদল নেতারা নীরব রইলেন । এ ব্যাপারে বিহারের এক সংসদ সদস্য মন্তব্য করেন যে, 'লোকদল যে অনুন্নত শ্রেণীর ভরসা, এটা কোনভাবেই প্রমাণ হয় নি ।'

সম্প্রতি জম্মুতে যে বি জে পি-র জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক হয়, তাতে তারা জনসংযোগ তৈরি করার কৌশল সৃষ্টির ব্যাপারে মনস্থির করতে পারে নি। এতদিন পর এখনই তারা কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, দুর্বল শ্রেণীর জন্য আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তৈরি করতে চলেছেন কিষাণ সেল । পাশাপাশি লেবার সেল গঠনেরও উদ্যোগ চলছে । মোট কথা অন্যান্য বিরোধী দলগুলির চেয়ে বি জে পি তবু মন্দের ভালো । গত দুবছরের মধ্যে গত এপ্রিলে দিল্লি 'জনবিরোধী বাজেট' এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন করে হাজতে গিয়েছেন। তুলনায়, অন্যান্য বিরোধী দলগুলি হাত পা গুটিয়ে বসেছিল । তাদের কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি ।

গত বছরে একবারই মাত্র জনতা দল সংবাদ শিরোনামে এসেছিল। চন্দ্রশেখর ও স্বামী অগ্নিবেশ যখন সভাপতি হবার জন্য যুদ্ধে নেমেছিলেন, তখনই জনতা দল সম্পর্কে কাগজে কাগজে লেখালেখি হয় । এই ঘটনাটি সবার মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করে যে, বিরোধী দলগুলির নেতাদের আসল উদ্দেশ্যই হ'ল অলীক ক্ষমতালাভের জন্য খেয়োখেয়ি । উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যায় আকাশ ছোঁয়া দাম, দুর্নীতি, বেকারত্ব, অরাজকতার বিরুদ্ধে আইন অমান্যই ছিল জনতা দলের সামান্য পুঁজি । জনসাধারণ কিন্তু এই আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া দিয়েছিল। তবে এটা কি আরো আগে করা যেত না ? গত অক্টোবরে যখন জনতাদলের জাতীয় কাউন্সিলের সভা হয় তখন জর্জ ফার্নাণ্ডেজ তীব্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করার দাবি তুলেছিলেন । এবং সেটি ছিল সারা দেশজুড়ে । কিন্তু সেই আন্দোলনকে বিলম্বিত করতে রামকৃষ্ণ হেগড়ে, মধু দণ্ডবতে, কৃষ্ণ কান্ত প্রচার শুরু করেন এবং সফলও হন ।

পাঞ্জাব চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর বিরোধীরা যখন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানান, বি.জে.পি তখন নীরব ভূমিকা পালন করেছিল । মিজোরাম চুক্তির ব্যাপারে একমাত্র বিরোধিতা করেছিল লোকদল । অন্যদিকে যখন কেন্দ্র পশ্চিম সীমান্তে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতে সংবিধানের ২৪৯ ধারা কার্যকর করলেন তখন কিন্তু কোন দলই এর প্রতিবাদ করে নি। একইভাবে শাহবানু মামলা এবং মুসলিম নারী বিলেও বিরোধীরা তাদের প্রতিবাদ জানান নি অথবা প্রতিরোধ করেন নি তা রুখতে ।

বিরোধী দলগুলি যেন এক একটি স্বতন্ত্র দ্বীপের মত । কেউই ঐক্যের ব্যাপারে তৎপর নয়। যদিও কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ঐক্য কামনা করছেন যে, বিরোধী দলগুলি যদি এক প্লাটফর্মে

দাঁড়ায় তাহলে একটি শক্তিশালী বিকল্প হওয়াও কঠিন নয়। কিন্তু যখনই কোন উপনির্বাচনে বিরোধী ঐক্যের প্রশ্ন আসছে, তখন তা হয়ে উঠছে দুষ্কর। চন্দ্রশেখরের মতে, '১৯৭৭-১৯৮০ সালে জনতা শাসনে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে ওই শাসনে ব্যক্তিগতভাবে ঐক্য অসম্ভব। এবং তা প্রমাণিতও হয়েছিল। নির্বাচন কেন্দ্রের ঐক্যই সবচেয়ে বড় কথা। কোনও নীতি না থাকলে বিরোধী ঐক্যের বিষয়টি নিতান্তই বাজে ব্যাপার।' ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন সভাপতি এল.কে. আদবানিও ঐক্যের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহিত নন। তার বক্তব্য হল ঐক্যের আগে দেখা দরকার প্রতিটি দলের কেমন যোগ্যতা আছে। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকলে তবে ব্যাপারটি ভাবা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসু জানিয়েছেন-'বর্তমান সময় ঐক্য নিয়ে আলোচনার সময় নয়।'

তবে বিরোধী ঐক্যের ব্যাপারে লোকদলই গত দু'বছর ধরে সোচ্চার। অথচ মজার ব্যাপার হল লোকদলের নেতা চরণ সিং-ই কিন্তু ঐক্যের সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক। চরণ বরাবরই নির্বাচনে নিজের নীতি প্রয়োগে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নীতি–এক নেতা, এক প্রতীক, এক ইস্তেহার।

ওদিকে লোকদলের কার্যকরী সভাপতি এইচ. এন. বহুগুণা আরও একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বিরোধীদের একটি মাত্র দলই থাকা উচিত। কোন ফ্রন্ট থাকার দরকার নেই। নির্বাচনের আসনে একটি প্রতীক ও ইস্তেহার নিয়ে লড়াই হবে। এ বিষয়ে তদারকির জন্য থাকবে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি, যার নাম প্রেসিডিয়াম। সমস্ত বিরোধী দলের সভাপতি নিয়ে ওই প্রেসিডিয়াম গঠিত হবে। এই কমিটিই 'ইউনাইটেড' দলের নীতি নির্ধারণ করবে। প্রধান হবেন চরণ সিং। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোন উন্নতি দেখা যায় নি।

তবে বহুগুণার এই চিন্তা ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছে বৃহত্তম বিরোধী দল তেলেগু দেশম। পি. উপেন্দ্রর মতে, সর্বধর্ম সমন্বিত ও কমিউনিস্ট বিরোধী জাতীয় স্তরের এই কমিটির প্রধান কেন্দ্র হবে দিল্লি। দলের সভ্যরা ন্যূনতম জাতীয়স্তরের কাজ চালাবে, বিশেষত যে রাজ্যে ওই দল শাসন করবে, সেই রাজ্যে তাদের স্বয়ং শাসনের ক্ষমতা দিতে হবে। সংসদীয় নির্বাচনে এক প্রতীকে লড়াই হবে, তবে রাজ্যের নির্বাচনে বিভিন্ন দলগুলি নিজেদের প্রতীক নিয়ে লড়তে পারবে। তবে এদের নেতৃত্বে থাকবে ওই প্রধান দলটি। পি. উপেন্দ্রর বক্তব্য অনুযায়ী, এই ধরনের ব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যথোপযুক্ত। তাঁর মতে, জগজীবন রামের মৃত্যু, চরণ সিং-এর স্থবিরতা, দেশাই-এর অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই হবে সব থেকে কার্যকরী বিকল্প।

জনতা দলের প্রবীণ নেতা জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং লোকদলের সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রকাশ মালব্য অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে, 'বিরোধী ঐক্যের প্রথম কথাই হল ক্ষমতা থেকে কংগ্রেসকে সরাতে হবে। যদি হিন্দি বলয়ে কংগ্রেস

অজিত সিং : লোকদলের নেতৃপদে

রাজীবের ফাঁকা বুলিতে অনেকেই মোহিত : চন্দ্রশেখর

পিছু হটে, তবে কাজটা খুবই সহজ হবে। যেহেতু দেশের দক্ষিণ কিংবা উত্তরপূর্ব অথবা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল কংগ্রেসের হাতে আর নেই, সেহেতু পশ্চিমে তাদের ঘায়েল করা মোটেই শক্ত নয়। হিন্দি অঞ্চলে কংগ্রেসকে সরাবার জন্য জনতা এবং লোকদলের এক হওয়া দরকার। ওই অঞ্চলে দুই দল রাজনীতির ক্ষেত্রে গুণগতভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তবে এই দুই দলের এক হয়ে কাজ করার ব্যাপারটি খুবই আকর্ষণীয় ও নতুন রকম হবে। তবে আরেক প্রবীণ জনতা নেতা এস. নিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন যে, এত কিছুর পরেও সেখানে দুজন প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হবেন। ফলে বিরোধীদের মধ্যে সেই স্বভাবপ্রবণতা অর্থাৎ রেষারেষি দেখা দিতে পারে।

তাহলে কি প্রবীণ বৃদ্ধ নেতারাই নতুন স্বপ্ন দেখাতে পারবেন? এল.কে. আদবানি নিশ্চিন্ততার সুরে বলেছেন, 'যদি জনতা আমলের প্রবীণ মন্ত্রীদের বয়স ও শারীরিক সামর্থ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তবে কত বছর বয়স এই কাজে উপযুক্ত? তিরিশ এবং চল্লিশ? ক্ষমতাসীন দলের অধিকাংশই ঐ বয়:ক্রমের।' তরুণেরা অবশ্যই কাজের। তাদের উদ্দীপনায় কাজ অনেক এগিয়ে যেতে পারে। অবশ্য এই কথাগুলি বিরোধীদের পরিচিত মুখগুলির ভাবমূর্তিটির বিরোধিতা করবে।

বর্তমান মুহূর্তে একমাত্র বি.জে.পি. এবং বামপন্থী দলগুলি ছাড়া কেউই উৎসর্গীকৃত কর্মীদের তথা ক্যাডারদের ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারবে না। এই ধরনের কর্মীদের সহায়তা ছাড়া তারা কংগ্রেস আই দলের বিরুদ্ধে কোনভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।

ইতিমধ্যে রাজীবের আরেক বিরোধী ফারুক আবদুল্লা কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে আপোষ করেই জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেদিনের সেই বিদ্রোহী আবদুল্লার সুর এখন বেশ নরম। এ ব্যাপারটি অবশ্যই কেন্দ্রিয় সরকারের প্লাস পয়েন্ট। অতি সম্প্রতি কংগ্রেস (স) কংগ্রেস আই–এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শারদ পাওয়ার তো এখনই ক্ষমতার জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন। শুধুমাত্র উন্নিকৃষ্ণণ ও আসামের শরৎ সিন্‌হা এই সংযুক্তিকরণের বিরোধিতা করে পাল্টা কমিটি তৈরি করেছেন।

অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি কিন্তু কংগ্রেস আই–এর বিরুদ্ধে একটু একটু করে গর্জে উঠছে। তবে ১৯৭৭ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটা আর সম্ভব নয়। ওরা অপেক্ষায় আছেন যে, হরিয়ানাতে কংগ্রেস হারলে হিন্দি বলয়ে কংগ্রেস ঘা খাবে। এটা কংগ্রেসের ভাঙনের সবুজ সংকেতও বটে। তবে ব্যাপারটি বিরোধীদের নিষ্ক্রিয়তার সামিল। কিন্তু যদি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস ফের আরেক অমিতাভ বচ্চন ও সুনীল দত্তকে আবিষ্কার করে তাহলে? আর যাই হোক ভারতের রাজনীতি ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে নির্বাচনে অভিনেতাদের কোন বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-এর মদতে মিঠুন চক্রবর্তী কিংবা দেবানন্দের নতুন দল বিরোধী রাজনীতিতে নতুন কোন আলো দেখাতে পারে। ●

ছবি : ক্রিয়েটিভ আই, সি.এন.এস., সুনীল সাকসেনা

৬৭ পৃষ্ঠার পর

গুরুর প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাবান নয়। আজকাল পিতা-পুত্রের যখন সম্মান শ্রদ্ধার অভাব, তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। আমিও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছি। আমার কাছে ১৮ বছর বয়স থেকে ২৫ বছর বয়সী বহু প্রতিভাবান শিষ্য আছে। এরা সংখ্যায় দেড়শ। তবে নামেই শিষ্য। এদের মধ্যে বিচিত্র বীণাবাদক গোপাল কৃষ্ণণ, বংশীবাদক বিজয় রাও, সেতার বাদক উমাশঙ্কর মিশ্রের মত নামী শিষ্যরাও আছেন। আমি বেনারসে ১৮ জন শিষ্যকে সেতার শিখিয়ে এখানে এসেছি। ন'বছর ধরে সমানে খেটে চলেছি। ওরা ১০ থেকে ১২ ঘন্টা অভ্যেস করে। ঠিক করেছি আমি আমেরিকা ছেড়ে দিল্লিতেই থাকব। এরপর নানা জায়গায় যাতায়াতও কমিয়ে দেব। আমার একমাত্র লক্ষ্য বাবার অভিষ্ট–সিদ্ধ করা। অন্নপূর্ণা কলকাতাতেও ওই কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি তো পশ্চিমী দুনিয়ার অনেককে সেতার শিখিয়েছেন, ভারতীয়দের সঙ্গে ওদের পার্থক্য কোথায়?

রবিশঙ্কর: আমি শুধু প্রতিভাবান ছাত্রদের সম্পর্কে বলব। পশ্চিমী দেশের ছাত্ররা ভারতের সুরজগৎকে জানবার জন্য সে সময় বড় উৎসুক হয়েছিল। তবে ওদের মধ্যে রক ও জ্যাজ সুরের প্রতি টান ছিল বরাবর। এ কারণে আমার সুরের প্রতি ওদের অনুগত হওয়া বেশ কঠিন ছিল। তবে ওই প্রতিবন্ধকতা একবার ভেঙ্গে গেলে, এ ব্যাপারে অসুবিধের কোন কারণ ছিল না। আসলে ওরা খুবই দক্ষ, ফলে খুব তাড়তাড়ি আমার প্রশিক্ষণ ওরা অনুসরণ করতে পেরেছিল। তবে ওদের মধ্যে ধৈর্যের বড় অভাব। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আর যাই না থাক, ধৈর্য আছে। আরও দেখলাম, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে রক-গায়কেরা অনেক শ্রদ্ধাবান। ওদের দক্ষতা এতই চমৎকার যে ওদের কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণেরা সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন তবে রক-গায়কদের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যে আত্ম-অহংকার নেই। অথচ আমাদের সঙ্গীত জগতের বোদ্ধারা তাদের সম্পর্কে বরাবরই উদাসীন। ন্যূনতম স্বীকৃতি দিতেও তাদের বাধে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ওই দেশের তৃতীয় শ্রেণীর রক-গায়করা এ দেশে আসতে আগ্রহী নন। আমাদের এখানে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কারদের স্বীকৃতি দেবার মানদণ্ড নেই। শুধু কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরিয়েই তারা সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে যান। এটা কি স্বাস্থ্যকর ব্যাপার? কিন্তু ওরা যদি অন্যান্য সুরের রাগ ও রাগিনীকে বুঝতে তাদের অন্তঃস্থলে পৌছতে না পারেন তবে তো বড় সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। আর যখন আনাড়ি পশ্চিমী শ্রোতাদের তাঁরা বলেন, 'আমি ধ্যান করার জন্য ব্রহ্মরাগ বাজাচ্ছি, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি। ঠিক এ ভাবেই পশ্চিমী শিক্ষার্থীরা ঠকে যাচ্ছেন। ওরা বড় জোর কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হন, সঙ্গীত নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। কেউ কেউ বা বড় রেস্তোরাঁয় কাজে লেগে পড়েন। আবার ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞরাও সুপারফিসিয়াল জ্ঞান আহরণ করে বিদেশ পাড়ি দেন। তাদের কোন গুরু নেই। নিজেরাই নিজেদের গুরু। এরা টেপ কিংবা রেকর্ডেই গান কিংবা বাজনা শোনেন। এ ছাড়া এখন ফ্যাশানই হয়েছে যে যিনিই বিদেশে মিউজিক কনফারেন্স করছেন, তিনি বড় শিল্পী। ওখানে ওরা প্রশংসায় ভেসে যান। আবার ভারতে এলে ওদের অবস্থা কাহিল। এসব দেখে মনে হয়, ভারত এদের উপযুক্ত কেন্দ্র নয়। আমি যখন আমেরিকা যাই, তখন আমার বয়স ছিল ৩৮ বছর। সেটা ১৯৫৮ সাল। আমি তখন ভারতে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। আলি আকবর আর আমি তখন সর্বজনস্বীকৃত সঙ্গীতজ্ঞ। এখন এই ধরনের সমস্যা বাড়ছে। হাল আমলের শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞেরা দেশের চেয়ে বিদেশকেই বেশি পছন্দ করেন। তবে এখনও এদেশে অনেক প্রতিভাবান ছাত্র আছেন। বিলায়েত ও আমজাদের কাছেও বহু ভালো ছাত্র রয়েছেন। অনেকের ধারণা, আমি আমার ছাত্রদের বিদেশ যেতে দিই না। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয়। আমি মনে করি আমার ক্ষমতা আছে তাই আমার কাছে এখনও ছাত্ররা রয়েছে।

প্রশ্ন: ভারতীয় ও পশ্চিমী শ্রোতাদের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে? ভারতীয় শ্রোতাদের মধ্যে কি ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়? কাদের কাছে বাজিয়ে আপনি বেশি আনন্দ পান?

রবিশঙ্কর: এ প্রশ্নের উত্তর আমি বহুবার দিয়েছি। এটার তিনরকম দিক আছে। আমি খোলাখুলিই বলে থাকি যে, ভারতে সত্যিকারের শ্রোতাও আশ্চর্যজনক ভাবে কম। অনেক সুশিক্ষিত মননশীল ব্যক্তির ভুল ধারণা আছে যে ভারতে সত্যিকারের শ্রোতা সংখ্যায় প্রচুর। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। তবে নেই যে তা নয়। যদিও অধিকাংশই ভেক–শ্রোতা। ওরা সমঝদার শ্রোতার ভান করেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি–এ বছরই বারাণসী কনফারেন্সে পণ্ডিত যশরাজ শুভলক্ষ্মী এসেছিলেন। আমি এবার বাজাই নি। দেখলাম অল্প কজনই এসেছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। তবে এলাহাবাদ এবং বারাণসীতে সমঝদার শ্রোতার অভাব নেই। অন্যান্য জায়গায়ও খুব একটা খারাপ শ্রোতা নেই। পশ্চিমবঙ্গে সুররসিক শ্রোতা আছেন তবে তারা সংগীতকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দেন না। 'বাস্তবে এই দু'ধরনের শ্রোতাদের আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা বলে থাকি। অনেক সঙ্গীতকার আবার শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গান করেন। কিন্তু পশ্চিমে তা নয়। সেখানে যিনি গাইবেন অথবা বাজাবেন তিনি দু'টি চোখ বন্ধ করে গাইবেন। কারণ গায়ক বা শিল্পীদের মনোসংযোগ রাখা জরুরি। ওদেশের শ্রোতারা ধীরে ধীরে সঙ্গীতকে ভালো বাসেন। ডুবতে থাকেন তাতে। কিন্তু আমাদের শ্রোতারা ভিন্ন প্রকৃতির। একেবারেই পাংচুয়াল নন। আসর শুরু হবার কিছু দেরিতে পৌছন। ফলে যারা গান গাইতে অথবা বাজাতে আসেন তাদের মনসংযোগ বসাতে সময় লাগে। আবার শ্রোতারা মাঝে মাঝেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। কথাও বলতে ছাড়েন না। কিন্তু পশ্চিমী দেশে ঠিক উল্টো। তারা ঠিক সময়ের আগেই চলে আসেন। চুপচাপ থেকে আসরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন: আপনি তো ভারতে থাকছেন, এখানে নতুন কিছু পরিকল্পনা নিচ্ছেন? বলতে চাইছি শুধু নতুন শিল্পী তৈরি নয়, তাদের আরও ভালোভাবে যাতে শিক্ষিত করা যায়–সে ব্যাপারে কিছু কি ভেবেছেন?

রবিশঙ্কর: হ্যাঁ, আগেই ভাবনা চিন্তা করেছি। এবার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমি কলাকুশলীদের নিয়ে বড় কিছু ভাবতে চাইছি, করতে চাইছি। অনেক শিল্পীদের বিরুদ্ধে অনুযোগ আছে, তাঁরা অনেক ফি নেন। কিন্তু এ ব্যাপারটাও যাতে নর্মাল করা যায় সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেব। সেই সঙ্গে আরেকটা কথাও আমার মনে হচ্ছে, সেটা হল স্কুল কলেজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে শুধু ঐচ্ছিক বিষয় করলে চলবে না। আবশ্যিক বিষয় করা দরকার। এছাড়া কিন্ডারগার্টেন স্তরেও এ ব্যাপারটা চালু করতে হবে। যদি আমরা নার্সারি ক্লাসের বাচ্চাদের তাল-লয়-জ্ঞান না শেখাই, তবে পরবর্তীদিকে ওদের মধ্যে সুর কিংবা শিল্প জিনিসটা ফিকে হয়ে আসবে।

প্রশ্ন: স্কুল ও কলেজে সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রবিশঙ্কর: আজকাল স্কুল কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা ঠিক যেন কারখানায় মাল তৈরির মত। এইরকম ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা হলে বছরে বছরে শুধু শিক্ষকই তৈরি হবে, আর গুণী শিল্পীদের সংখ্যা মোটেই বাড়বে না। একবার বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি আপনার জীবনে ক'জন তানসেন তৈরি করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি শুধু কানসেনই পয়দা করেছি।

প্রশ্ন: বেতার ও দূরদর্শনের উন্নতির ব্যাপারে-আপনি কি কিছু ভাবছেন?

রবিশঙ্কর: আমি এর উত্তর দিতে পারছি না। এর আগে আমি অনেক কিছুই বলেছিলাম, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করেন নি।

প্রশ্ন: কি ভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব? সিনেমার টেপ বা রেকর্ডের দামের থেকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের দাম কম করলে কি সুরাহা হতে পারে?

রবিশঙ্কর: নিশ্চয়, এতে সাড়া পাওয়া যেতে পারে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে ভিডিও ফিল্ম বানালেও মন্দ নয়। পশ্চিমী দেশে সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বেতার, দূরদর্শন অনেক সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। আমাদেরও সে কথা ভাবতে হবে।

ছবি: ইলেকট্রো স্টুডিও

দাঙ্গা, দাঙ্গা !

দিল্লি, এলাহাবাদ, বাটালা, শ্রীনগর, আহমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভারতের সর্বত্রই ছড়াচ্ছে দাঙ্গার আগুন। 'ভূস্বর্গ' গোয়ায়ও পৌঁছে গেছে সেই সর্বনাশী আগুনের ছোঁয়া। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানও দাঙ্গাদীর্ণ। কিন্তু শান্তিপ্রিয় মানুষ কেন বারবার উত্তেজনার আগুন পোহায় প্রতিবেশী রক্তের উষ্ণতায়? দীপ বসুর প্রতিবেদন।

'অসংখ্য ছড়ানো মৃতদেহের
ওপর হাঁটতে হাঁটতে কলম ভাবছিল
এটা তার জীবনের সফলতা, না লজ্জাকর 'পরাজয়'
('কলম' : শামশের আনোয়ার।)

সাংবাদিকের সামনেও এই বিষণ্নতা, আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্তগুলি আসে, যখন সংবাদ শিরোনামে একের পর এক ঝলসে ওঠে দুঃস্বপ্নের বাক্‌মুহূর্তগুলি : 'দিল্লি জ্বলছে', 'অশান্ত গুজরাতে সেনা', 'বাটালায় সংঘর্ষ, গুলি, কার্ফু', 'কর্ণাটকের দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে কুড়ি', 'করাচিতে তীব্র সংঘর্ষ অব্যাহত', 'গোয়ায় হত আট, শান্তিরক্ষায় সেনাবাহিনী' ! গত বছরগুলিতে সাংবাদিকদের এই দুঃখজনক দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়েছে অবিশ্রান্ত ভাবে, যার ফলশ্রুতিতে প্রভাতী চায়ের টেবিলে উষ্ণ চায়ের কাপের সঙ্গে নৈমিত্তিক ভাবে পৌঁছে গেছে রক্তের আর্দ্র উষ্ণতার ঘ্রাণ নিয়ে এক একটি সংবাদপত্র, 'সভ্য' জগতে যা নাকি জনসংযোগের প্রধানতম মাধ্যম।

আজ থেকে চার দশক আগের সেই হানাহানির দিনগুলি এখন হয়ত অনেকের স্মৃতিতেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অশক্ত শরীরে আশি বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজির সেই পদযাত্রার মর্মস্পর্শী স্মৃতি নতুন প্রজন্মের অনেকেরই জানা নেই। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রাচ্যের স্যুইজারল্যাণ্ড বলে কথিত সেই মনোরম দেশটি, লেবানন আর তার রাজধানী বেইরুত—এর ধীরে ধীরে সংঘর্ষনগরী হয়ে ওঠার দৃশ্যপটটিও এখানে অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু গত কয়েক বছরের সংবাদমাধ্যম পাঞ্জাব আর শ্রীলঙ্কা, রক্তক্ষয়ী গোষ্ঠীসংঘর্ষের চালচিত্রটিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভারতীয়ের কাছেও নির্বিশেষে নগ্ন করে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও হয়ত বলবেন, এ বিষয়ে আমাদের রেকর্ড ক্লিন। কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গোষ্ঠীসংঘর্ষ হয়নি—বছর কয়েক আগে নদীয়ায় এরকম কিছু একটা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু তা সফল হয়নি। কিন্তু সংঘর্ষ তো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন রূপ নেয়—কখনও তা প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক কিন্তু প্রকাশ্যে রাজনৈতিক, কখনও আড়াল আবডালের কোনও অবকাশ না দিয়েই সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক। নইলে কোনও ফুটবল ক্লাবের অবনমনের আশঙ্কা ঘিরে, হাইকোর্টে জনৈক ব্যক্তির ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেওয়ায়, এমন কি কোনও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পর—সরকারী প্রশাসন, পুলিশ আর জনগণ সহসাই 'সতর্কিত' হয়ে পড়ে কেন? আবহমান কাল থেকে মানুষের উৎসব আনন্দের, পর্বের দিনগুলিতে ইদানীং শান্তিশৃঙ্খলার রক্ষাকর্তারা বিষম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গণেশ চতুর্থী, বৈশাখি, ঈদ, দুর্গাপূজা, পোঙ্গল—এর দিনগুলি যেন এক একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটে। শান্তিরক্ষাধিকারীরা শোভাযাত্রার রাস্তা নির্দিষ্ট করে দেন, সময় নির্দিষ্ট করে দেন, তারপর উৎসবপর্ব চুকে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ইদানীং সাম্প্রদায়িকতা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতই বহুলপ্রচারিত একটি ছোঁয়াচে উপসর্গ। এর মূলে ধর্ম, ভাষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ছাড়াও অজস্র রকমের 'ভাইরাস'। ভারতের শেষ প্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রস্তরখণ্ডের ওপর দু'দণ্ড বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেখানে যখন একটি মন্দির তৈরি হল এবং মূলভূমি থেকে নিয়মিত ফেরি সার্ভিস চালু হ'ল তখন স্থানীয় খ্রীষ্টান জেলেরা তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেন, তাদের মাছ ধরার কাজ ব্যাহত হচ্ছে এই অভিযোগে। এদিকে মহারাষ্ট্রে জনৈক বাহুবলী হিন্দু সংগঠনের নেতার, যিনি বাঘের ছবির নীচে বসে সাক্ষাৎকার দেন প্রায়ই, উৎসাহী সমর্থকেরা মসজিদের পাশেই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এমন তারস্বরে লাউডস্পীকার বাজাতে থাকেন যে আজানের শব্দ তাতে শুধুমাত্র মসজিদের ভেতর থেকেই শোনা যায়। উত্তরপ্রদেশের বিতর্কিত একটি ধর্মস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক জলঘোলা হয়েছে। পাল্টাপাল্টি তৈরি হয়ে গেছে মন্দির সুরক্ষা সমিতি আর মসজিদ অ্যাকশান কমিটি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, জমায়েত-ই-ইসলামীর মত ধর্মীয় দলগুলো তো ছিলই, সাম্প্রতিককালে এদেরই পরিপূরক হিসেবেই বুঝি তৈরি হয়ে গেছে আরও কয়েকটি দল, বালদর্পী সব নাম নিয়ে। বজরং দল, আদম সেনা, বেলচা পার্টি (বেলচা দিয়ে মারামারির মধ্য দিয়েই যে দলের সূত্রপাত) ইত্যাদি ইত্যাদি। শিখ উগ্রপন্থীদের বেশ কয়েকটি দল, বব্বর খালসা, দশমেশ রেজিমেন্ট, খালিস্তান কমাণ্ডো ফোর্স—এর সঙ্গে টক্কর দিতে সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি সহ পাঞ্জাবে পৌঁছে গেছে 'শিবসেনা'। কৃপানের বিরুদ্ধে এখন পাঞ্জাব আর দিল্লিতে হামেশাই বিক্রি হচ্ছে ত্রিশূল। দলটি কাশ্মীরেও ইতিমধ্যে তাদের শাখা স্থাপন করে ফেলেছে।

ভাষা নিয়ে দাঙ্গাও গতবছর রেখেছে বেশ উল্লেখ্য নজির। মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক সীমান্তের বেলগাঁও শহরটি নিয়ে জুন মাসে দাঙ্গা ব্যাপক আকার নেয়, যা ছড়িয়ে পড়ে নিকটবর্তী শহর কোলাপুরেও। কান্নাড়িগা আর মারাঠীদের 'সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সীমা সমিতি' 'মহারাষ্ট্র একীকরণ সমিতি'র সমর্থকদের মধ্যে ভাষা নিয়ে সংঘর্ষ রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। দুই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে ও এস বি চ্যবন শান্তি আলোচনায় বসেন। বেলগাঁও থেকে ৪৯ নং জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণের দিকে এগোলে রেলের লোণ্ডা জংশন। এখান থেকে ৮৯ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বা রেলের ক্যাসেল রক, দুধ সাগর, কোলেম স্টেশন হয়ে প্রাচ্যের 'স্বর্গোদ্যান' গোয়ায় পৌঁছোনো খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। ছ'মাসের ব্যবধানে ভাষা আন্দোলনও অবশেষে গোয়ায় পৌঁছে গেল। গোয়ায় সাম্প্রতিককালে বড় দুর্ঘটনা ঘটে মাণ্ডবী ব্রিজ যখন ভেঙ্গে পড়ে। উত্তর ও দক্ষিণ গোয়ার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত ছিন্ন হয়ে যায়। গোয়ার হিন্দুদের অধিকাংশই থাকেন উত্তর গোয়ায়। দক্ষিণে প্রাধান্য খ্রীষ্টানদের।

গোয়ায় গত ১৮ ডিসেম্বর যে দাঙ্গা শুরু হয়, তা অবশ্য ধর্মীয় দাঙ্গা ছিল না। দাঙ্গার মুখ্য ভূমিকায় ছিল ভাষার রাজনীতি। বিরোধী দুই পক্ষ 'কোঙকণী পরেচো আওয়াজ' ও 'মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি'র সমর্থকেরা। ঘটনাটি ঘটে গোয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব ক্রীসমাসের অব্যবহিত আগে। এছাড়াও লক্ষণীয় যে, সময়টা ছিল পর্তুগীজ অধিকার থেকে গোয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির রজতজয়ন্তীর সময়।

কোঙ্কনী এবং মারাঠি ভাষা নিয়ে গোয়ার অসন্তোষ নতুন কোনও

চা বাগানের জীবন-রহস্য

১৪৫টি চা-বাগিচা নিয়ে উত্তর-বঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে বয়ে চলেছে এক নতুন জীবনপ্রবাহ। নয়া সংস্কৃতির সেইসব চা বাগানের মানুষজন কি ভাবে বেঁচে আছেন? কেমন তাদের দিনচর্যা? বাগানের বাবু-বিবিদের বীভৎস মজার পিছনে কাদের এত বেদনার্ত মুখ? কাদের রক্তে ভিজে গেছে চা-গাছের জমিন? এক অন্যতর জীবন-রহস্যের সন্ধানে তরুণ লেখক সুভাষ মৈত্র।

থাম, থাম রিপোর্টবাবু। খবরদার থাম বলছি...। টালমাটাল পায়ে কুলি লাইনের সরু রাস্তাটা আগলে রয়েছে চুট্টু। চোখ দুটো চুট্টুর করমচার মতো লাল। কিছুতেই ও আমাদের কুলি লাইনের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। আমি এই রিপোর্টবাবু মানে কিনা রিপোর্টার বাবুর উপর চুট্টুর যত না রাগ, তার থেকে বেশি রাগ সঙ্গী ফটোগ্রাফার আর তার ক্যামেরাটার উপর। ভর দুপুরের খর রোদে মেজাজটা ওর চড়া হয়েই ছিল, তার উপর আবার মৌতাতে বাধা। আশেপাশের দু' দশটা চা বাগানে কে না চেনে রেড ব্যাংক বাগিচার চুট্টু ওরাঁওকে। চুট্টু মস্তান, চুট্টু কুলি ধাওড়ার উঠতি নেতা, চুট্টু দিন ভর টালমাটাল পায়ে কাজ অর্থাৎ 'ডিব্‌টি' করে যায়। না কিছুতেই কুলি লাইনের ফটো 'খিঁচতে' দেবে না চুট্টু। মুখে ওর একটাই কথা দু'দিন ধরেই শুনছি: বাগিচার কুলি কামিনের খুনের পয়সায় যারা গাড়ি, বাড়ি, বিলাইতি সরাব আর মজা লুটছে তাদের কাছে যা না কেনে, এই কুলি লাইনে কি আছে তোদের? যা যা–ইখান থেকে। আমরা আমাদের মতোই আছি। ডিব্‌টি করি ফজিরের ভোঁ থেকে 'সামতক্'। অবসর সময়ে মৌজ করি, ধাম্‌সা মাদল পিটাই, আর কি আছে, সালের পর সাল এই তো চা বাগিচার জীবন। যা 'গেস্টি হাউস' বাংলোয় গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা আরাম কর। উদের ফটো খিঁচ্ জান ভরে। আমাদের মৌজের আসর ভাঙ্গছিস কেনে?

একটু নরম গলায় বললাম–ঠিক আছে ভাই আমিও বসছি তোমার সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে মিশতে চাই। সুখ দুঃখের কথা শুনতে চাই। শুধু সাহেবদের কথা শুনলে চলবে না, বাগিচার আসল লোক তো তোমরাই। ভোরের ভোঁ থেকে শুরু করে বিকেলের শেষ ভোঁ পর্যন্ত তোমরা কুলি-কামিনরাই তো পাতি তোল। মাপ কর। চায়ের সব কিছুর সঙ্গেই তো তোমাদের ছোঁয়া লেগে রয়েছে, বাগিচার কথা, বাগিচার সুখ দুঃখ কিস্‌সা-কাহানী তোমাদের থেকে আর বেশি কে জানে বল? তা আনো ভাই কি আনাবে, বসছি তোমাদের সঙ্গে।

চুট্টুর লাল চোখ বড় হয়ে ওঠে। সাচ্ বাত! বসবেন?

–হ্যাঁ কেন বসব না!

–ও। ঘুরে দাঁড়াল চুট্টু। এই ফাঁকে সঙ্গী ফটো-গ্রাফার তার কাজ বাগিয়ে নিতে থাকে।

চুট্টু হাঁক ছাড়ে–এ বুড়িয়া নানী একটো বোতল ক্যাঁটচি লে আও। রিপোর্টবাবুকে পিলা দে।

মুখে বলিরেখা আঁকা এক বুড়ি চোখের উপর হাত রেখে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। তারপর কি ভেবে বুড়িটা হঠাৎ যেন ক্ষেপে ওঠে। চুট্টুর দিকে এক ধমক ছোড়ে-বেতমিজ্।

অবাক হয়ে যায় চুট্টু। আমার দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে কি বলে। তারপর হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। মদেশীয় সুর ছড়িয়ে যায় ওর গলা থেকে। মদেশীয় সুরে টাল-মাটাল হাঁটতে হাঁটতে নির্জন বাগিচা ভরে ওঠে। চুট্টু গেয়েই চলে:

সাহেব বলে কাম্ কাম্
বাবু বলে ধরে আন
সর্দার বলে তুলবো পিঠের চাম...

ভাসতে থাকে, বহুদূর পর্যন্ত ভাসে সেই মদেশীয় সুরে। আদ্যিকালের চা বাগিচার কুলি জীবনের করুণ গাঁথা। ভূটান পাহাড়ের বুক চিরে ধেয়ে আসা বড় আদরের নদী ডায়নার নূপুর ঝমঝম...। আর ডায়নাকে ঘিরে থাকা আদিগন্ত সবুজ গালিচার মতো চা বাগানের চারদিকে ছড়িয়ে যায় সেই সুর...।

চুট্টু চলছে আমাদের নিয়ে। দু'পাশে ফালি কাটা মাটির রাস্তা, শুয়োর আর কালো কালো

শিশু পাশাপাশি শুয়ে আছে। কাঁচা নর্দমা থেকে ঠিকরে আসা অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়ে দেওয়া গন্ধ, টালি খোলা আর রাংচিতের বেড়া দেওয়া সারি সারি পায়রার খোপের মতো সব কুলি কামিনের বাড়িগুলি দু'পাশে রেখে আমরা চলছি। ছোটখাট একটা ভিড় চলছে আমাদের সঙ্গে। উলঙ্গ, আধা-উলঙ্গ এক দঙ্গল বাচ্চাকাচ্চার সঙ্গে নানা বয়সী মেয়ে পুরুষের ভিড়। ভিড় চলছে কোথায়? ভিড় চলছে আমাদের নিয়ে কুলি লাইনের সবচেয়ে বুড্ডা, চা বাগিচার সবচেয়ে আদি কুলি বোওধা ওরাওঁ-এর বাড়ি, বুড়ি ঝোর্পড়ির দিকে।

উঃ বাড়ি বটে। মুখ থুবড়ানো এক ঝুপড়ি উঠানে বসে জমিয়ে অবসর সময় আমেজ করছে বোওধা বুড়ো সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। সকলেই এ চা বাগিচায় কুলি কামিন। বিছানো চটের উপর হাঁড়ি ভর্তি হাড়িয়া, ক্যাটচির বোতল, খালি গা, শুধুমাত্র নেংটি পরা বুধো বুড়ো যেন আদিম ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ছবি। মুখ জুড়ে তার এক অদ্ভুত হাসি। প্রাণপণে ধামসার বুকে ঘা মারছিল বোওধা। গত দু'দিনের বাগানে বাগানে ঘোরাঘুরির সময়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, আমাদেরকে চিনতে পেরেছে বোওধা। তারপর চুটু গিয়ে কানে কানে কি বলতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল বোওধা। বিছানো চটের উপর দুবার হাত দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিল, বসতে বলল আমাদের। বুঝতে পারছি চা বাগিচার দীর্ঘ দিনের সাক্ষী এ বৃদ্ধ, এর কাছে লুকিয়ে আছে আমাদের না জানা এক অদ্ভুত জীবন রহস্য। ধীরে ধীরে দু'জনে এক বুক বিস্ময় নিয়ে বসলাম চটের উপর। চটের মধ্যিখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুটো শূন্য বোতল, ডাঁশ মাছি ঘুরছে ভন্ ভন্.....।

তির তির করে কাঁপতে কাঁপতে ভূটান পাহাড়ের কোণ ঘেঁসে লাল টকটক সূর্যটা ডায়না নদীর মধ্যেই যেন টুপ করে মিলিয়ে গেল। চারধারে এখন অন্ধকার। ডান বাম সামনে পিছনে যে-দিকেই তাকান যাবে, সব দিকেই চা বাগিচাগুলোকে মনে হচ্ছে অন্ধকারের এক একটা নদ এক মাপেই থমকে রয়েছে। বিচিত্র পাখপাখালী আর পোকা মাকড়ের ডাক বেড়েই চলেছে। বাগিচার মাঝে মাঝে পাতি গাছকে ছায়া দেবার জন্য শেড্‌ট্রিগুলোকে মনে হচ্ছে রাতের পাহারাদার। দূরে দূরে সাহেব-দের বাংলোয় বিজলি বাতির ঝলমল, জেনা-রেটরের একঘেয়ে ভট্ ভট্ শব্দ। আর এখানে কুলি লাইনের দীর্ঘ এলাকাটা জুড়েই ঘন অন্ধকার। বিকেলের শেষ ভোঁ বাজতেই পাতি তোলার কা-মিনেরা রুমালি আর থলি বোঝাই পাতির ভারে নুয়ে বেঁকে দৌড়চ্ছে ওজন ঘরের দিকে। সময় নেই। ছুট্ ছুট্ পা। ওজন ঘরের সামনে কে আগে পৌঁছতে পারে, দুটো শিফটেই এ এক প্রতিযোগিতা। দু'খেপে ২২ কেজি পাতি রোজ তুলতেই হবে। কমতি হলেই সর্দার কিংবা সর্দারনীর রঙীন চাউনি বুকে কাঁপন ধরায়। তাই খোপে খোপে ঘন অন্ধকার। রাতে খাওয়া দাওয়ার পাট বলতে কিচ্ছু নেই। সেই ভোরে উঠেই যা হোক কিছু মুখে গুঁজে ছোটা। দু'চারটে ঝুপড়ি থেকে টেমি বা লম্ফের আলো কাঁপছে, মাদলের তালে তালে ভাসছে মদেশীর সুর। বোওধা ওঁরায়ের উঠান জুড়ে অনেক কুলি কামিনের ভিড় জমে গেছে। থুরথুরে বুড়ি এতোয়ারী বোওধাকে জিজ্ঞাসা করল, এ্যাই বুড্ডা, রিপোর্টবাবু কে আছে, গরমেন্ট? ক্যাইচি আর হাড়ির খেলা জোর জমেছে। বোওধা একবাটি হাড়িয়া গলায় ঢালতে ঢালতে উত্তর দিল-হ্যাঁ গরমেন্ট বটে। টুকটুক পায়ে বুড়ি এতোয়ারী এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কিছুক্ষণ থ'মেরে থাকল বুড়ি। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এ-বাবু-গুলা সাহেব আসবেক নাই। বুড়ি এতোয়ারীর মুখ থেকেও ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এল। ওর দিকে তাকিয়ে বোওধা ওঁরাও বলল, হ্যাঁ, ই বাবুকে পুছু কর। বুড়ি এতোয়ারী। এই নামেই এখন আশপাশ সব বাগিচায় ওকে চেনে। কিন্তু খোদ ব্রিটিশ সময়ে ওকে নিয়েই বাগিচায় বাগিচায় লালমুখো সাহেবদের বাড়াবাড়ি লেগেই থাকত। তখন কত আদরের নামে ওকে ডাকত তারা। এতু, এতুয়া, এতাই। হ, শনিবর ছিল রঙীন খোয়া-

৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্লনিং : মরজি মাফিক শিশু !

জন্ম নেবে মানুষের প্রতিরূপ

সময়টা ২০১৩ সালের কোন এক শীতের সকাল। টালিগঞ্জের মনীন্দ্রনাথ সেন লেনের বাড়ি থেকে বেরলেন গৌতম গুপ্ত। টালিগঞ্জ থেকে মেট্রো রেল ধরে ঠিক সময়ে ধর্মতলায় পৌঁছতে হবে। অনেক কষ্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিলেছে। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে আবার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। পছন্দমত অর্ডার দিয়ে সন্তান তৈরি করার ওই একটাই তো ফ্যাক্টরি কলকাতায়। তাই যা ভীড় !

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জওহরলাল নেহরু রোডের 'ক্যালকাটা ক্লনিং সেন্টার'-এর কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন গৌতমবাবু। দেখেন তার মত আরও কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বসে আছেন সেখানে। এক এক জনের এক এক ধরনের সন্তান চাই। কেউ চান ক্রিকেটার ছেলে, কেউ বৈজ্ঞানিক মেয়ে, কারও পছন্দ এমন সন্তান যার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হবে তার বাবার মত দেখতে। এমন কি হাতের রেখাগুলিও একরকম হবে। আমাদের গৌতমবাবু তার ছেলের জন্য বৌমার অর্ডার দিতে এসেছেন। কেমন দেখতে হবে, কেমন বউ চাই, কতটা লম্বা মেয়ে দরকার, বৌমার বুদ্ধি কেমন হবে, সমস্ত কিছুই তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এক লিস্ট বানিয়েছেন। তার লিস্ট মতনই বৌমা তৈরি হবে টেস্ট টিউবে।

জীববিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে এমন দিন আসছে যখন মানুষ নিজের পছন্দ মত মানুষের জন্ম দেবে নিজের দেহের অংশ থেকে। অর্ডার মত মানুষ তৈরি হবে ফ্যাক্টরিতে। সেই আশ্চর্য অথচ আসন্ন সময়ের দিকে নিজস্ব প্রতিনিধির আলোকপাত।

সুধী পাঠক অবাক হবেন না। এটা আষাঢ়ে গল্প নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে এরকম দিনই আসতে চলেছে যখন বিজ্ঞানীরা মানুষের জেরক্স কপি তৈরি করবেন টেস্ট টিউবে। ইতিমধ্যে মনুষ্যতর প্রাণীদের মধ্যে এই পরীক্ষা সফল হয়েছে। মার্কিনী জীববিদ্যা বিশারদ

ক্লনিং প্রথায় সৃষ্ট প্রথম প্রাণী, রবার্ট ব্রিগস ও থমাস কিং-এর পরীক্ষাগারে

ডঃ টমাস কিং ও ডঃ রবার্ট ব্রিগস পঞ্চাশের দশকেই ব্যাঙের হুবহু নকল তৈরি করেছিলেন টেস্ট টিউবে। আর এক বিজ্ঞানী ক্লিমেন্ট মারকেট এই পরীক্ষা ইঁদুরের ওপর চালিয়ে সফল হয়েছেন।

শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলনে যে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয় তা এক জটিল ও এলোমেলো পদ্ধতি। তাই নতুন প্রাণীটি দেখতে কেমন হবে বা তার স্বভাব কেমন—কেউ আগে থেকে তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। সে ছেলে বা মেয়ে হবে তাও বলা যায় না একদম শুরুতে। জীববিদ্যার যে শাখা বংশগতির এইসব গভীরতম বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করে তার নাম 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'। সম্প্রতি বিজ্ঞানের শাখায় অসাধারণ দ্রুতগতিতে উন্নতি হয়েছে। 'জেনেটিক' কথাটি এসেছে 'জিন' থেকে। যাকে বলা যায় প্রাণের প্রাণবিন্দু। যে কোন প্রাণী, সে পশু বা মানুষ যাই হোক, তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে এই জিনের মধ্যে। সন্তান তার বাবার মত দেখতে হবে অথবা মার মত, তা নির্ভর করছে তার মা-বাবার থেকে তার 'জিন'-এর উপর, যা থেকে তার সৃষ্টি হয়েছিল। সন্তানের স্বভাবও নির্ভর করে তার জিনের উপর। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই প্রাণবিন্দুর মধ্যে কিভাবে প্রাণের বৈশিষ্ট্যগুলি লুকানো থাকে তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলেন বিজ্ঞানীরা।

১৯৪৪ সালে কানাডার বিজ্ঞানী আভেরী প্রথম জিনের মধ্যেকার গোপন রহস্য জানলেন। জিনের গঠনের পরিবর্তন করা সম্ভব, তা তিনি প্রমাণ

করে দেখালেন। 'জেনেটিক কোড' বা প্রাণবিন্দুর মধ্যে লুকোনো গোপন তথ্যের উপর গবেষণা করার জন্য ভারতীয় বংশোদ্ভব বৈজ্ঞানিক ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

এক একটি ইঁট দিয়ে তৈরি হয় বাড়ি, তেমনি এক একটি কোষ দিয়ে গড়া এই শরীর। কোষের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম, আর এই ক্রোমোজোমের মধ্যে সাজানো থাকে জিন। এক একটি প্রাণীতে কোষের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক এক রকম। মানুষের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা ৪৬। আমাদের দেহে দু ধরনের কোষ আছে। দেহকোষ দিয়ে তৈরি এই দেহ আর জনন কোষ, যার সাহায্যে নতুন প্রাণীর জন্ম হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু হল জনন কোষ। মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩টি করে ক্রোমোজোম। দুটি জনন কোষের মিলনে যে নতুন কোষটি তৈরি হয় তাতে মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। এই নতুন কোষটি থেকে নতুন প্রাণের যাত্রা শুরু হয়। একটি কোষ বিভাজিত হতে হতে আস্তে আস্তে নতুন কোষের জন্ম দেয় আর এই-ভাবে প্রাণীটি বড় হয়ে ওঠে।

কয়েক শ্রেণীর গাছ ও নিম্নস্তরের প্রাণীতে শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন ছাড়াই নতুন প্রাণীর জন্ম হয়। গাছের একটি শাখা থেকে নতুন গাছ তৈরি হয়, এককোষী প্রাণী অ্যামিবার কোষটি বিভাজিত হয়ে নতুন প্রাণীর জন্ম দেয়। একটি গাছের কোন একটি শাখা প্রশাখা থেকে নতুন গাছের জন্ম দেওয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ক্লনিং। সমস্ত গাছের কাটিং থেকে নতুন গাছ তৈরি হয় না, কিন্তু গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এমন অনেক গাছেরও ক্লনিং করতে পেরেছেন। একটি ব্যাঙ থেকে বা একটি ইঁদুর থেকে বিজ্ঞানীরা হুবহু একরকম ব্যাঙ বা ইঁদুর তৈরি করেছেন এই ক্লনিং-এর সাহায্যে। মানুষের হুবহু নকল তৈরি করার স্বপ্নও তাঁরা সফল করতে চান ক্লনিং-এর দ্বারা।

১৯৭৩ সালে শীতার্ত সন্ধ্যায় তাঁর কাছে এলেন এক মার্কিনী কোটিপতি ব্যবসায়ী। তিনি ডেভিড ররভিককে অনুরোধ করলেন এমন এক ডাক্তার খোঁজার জন্য, যিনি সেই ব্যবসায়ীর হুবহু নকল এক মানুষ তৈরি করতে পারবেন। যাতে তার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে ঠিক তার মতই আরেকটি মানুষ বেঁচে থাকে। সেজন্য তিনি কোটি কোটি টাকা খরচ করতে রাজি।

'টাইম' পত্রিকার সাংবাদিক ডেভিড ররভিক প্রথম মানুষের দেহে সফল ক্লনিং-এর একটি ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ১৯৭৩ সালে শীতার্ত সন্ধ্যায় তাঁর কাছে এলেন এক মার্কিনী কোটিপতি ব্যবসায়ী। তিনি ডেভিড ররভিককে অনুরোধ করলেন এমন এক ডাক্তার খোঁজার জন্য যিনি সেই ব্যবসায়ীর হুবহু নকল এক মানুষ তৈরি করতে পারবেন। যাতে তার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে ঠিক তার মতই আরেকটি মানুষ বেঁচে থাকে। সে-জন্য তিনি কোটি কোটি টাকা খরচ করতে রাজি।

সাংবাদিক এমন এক ডাক্তার খুঁজে পেলেন যিনি সত্যি সত্যিই এই কাজ করতে সক্ষম। এর আগে তিনি অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর এই পরীক্ষা চালিয়ে সফল হয়েছেন। কাজ শুরু হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোন এক দেশে গোপন এক গবেষণাগার স্থাপন করা হল।

একটি ডিম্বকোষের মধ্যে থেকে নিউক্লিয়সটি তুলে নেওয়া হল আর সে জায়গাটিতে বসিয়ে দেওয়া হল ব্যবসায়ীর একটি দেহ কোষের নিউ-ক্লিয়স। নিউক্লিয়সের মধ্যেই থাকে ক্রোমোজোম ও জিন। তাই নতুন প্রাণের মধ্যে যে তার বাবার সমস্ত গুণাগুণ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। ২৩টি করে ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণু মিলিত হয় ডিম্বাণুর সঙ্গে, আর তখন তৈরি হয় ৪৬টি ক্রোমোজোম যুক্ত ভ্রূণ। এক্ষেত্রে এসব কিছুই হল না, ডিম্বকোষের নিউক্লিয়সটি তুলে তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল আস্ত এক নিউক্লিয়স। আর এই নতুন কোষটিকে কয়েকদিন টেস্ট টিউবে রেখে তারপর তাকে প্রোথিত করা হল এক মহিলার গর্ভে। দশ মাস পরে জন্ম হল এক সন্তানের, যার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হুবহু সেই ব্যবসায়ীটির মত।

সাংবাদিকটি এই ঘটনা তার বই 'ইন হিজ ইমেজ : দি ক্লনিং অফ এ ম্যান'-এ লিখে গেছেন। বইটি লিপিনকট এণ্ড কোম্পানি দ্বারা ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি-দের নাম ঠিকানা ইচ্ছে করেই গোপন করেছিলেন তিনি। ডেভিড ররভিকের এই বইয়ের ঘটনা কিন্তু বিশ্বাস করেন নি মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা। তারা এটিকে একটি বানানো গল্প বলে রায় দেন।

মার্কিন এই সাংবাদিকের বর্ণনা সত্যি কিনা জানা যায় নি। কিন্তু ক্লনিং-এর সাহায্যে বংশগতির বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞেরই ভিন্নমত নেই। ইতিমধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়ার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শীটলস্ দুজন মার্কিনী মহিলার অনুরোধ মত 'মা কী বেটি' তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে প্রকাশ। আমেরিকার ইলিনইস বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ডঃ আটউড এখন এমন এক প্রাণী তৈরি করার চেষ্টা করছেন যার বুদ্ধি হবে মানুষের মত অথচ সে গাছের মত নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারবে সালোক-

গর্ভস্থ মানব ভ্রূণ নিয়ে ক্লনিং—এর পরীক্ষা শুরু হয়েছে
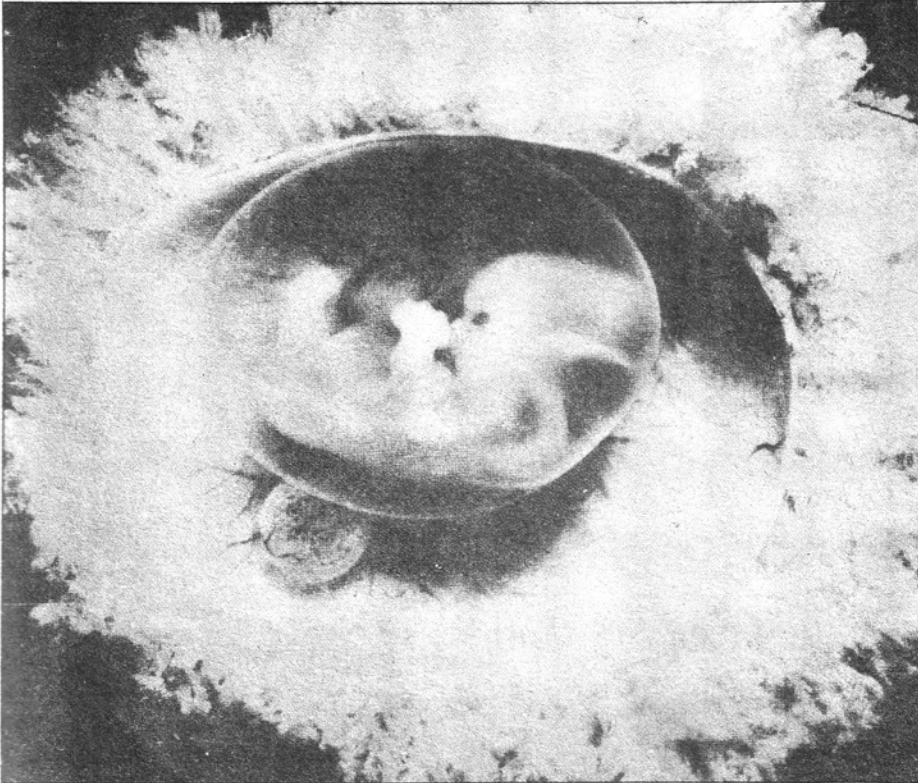
জীববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন

সংশ্লেষ পদ্ধতিতে ।

অনেক আগেই ক্যালিফোর্নিয়ার কোটিপতি বৃদ্ধ ব্যবসায়ী রবার্ট গ্রাহাম 'স্পার্ম ব্যাংক' তৈরি করে ফেলেছেন, যেখানে সযত্নে সংরক্ষিত করা আছে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি সাহিত্যিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের শুক্রাণু । মহিলারা ওখান থেকে ইচ্ছে মতন শুক্রাণু কিনে 'জিনিয়াস' সন্তানের জন্ম দিতে পারেন । সম্প্রতি এক মার্কিনী মহিলা সন্তানের জন্ম দিলেন এক নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিকের শুক্রাণুর সাহায্যে । বিজ্ঞানীর নাম অবশ্য গোপন রাখা হয়েছে । টেস্ট টিউবে মহিলাটির ডিম্বাণুর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকায় কেনা ওই শুক্রাণুর নিষেক ঘটিয়ে তারপর তা মহিলাটির গর্ভে প্রোথিত করা হয়েছিল । সন্তানটি সত্যিই উত্তরাধিকার সূত্রে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কটি পেল কিনা জানার জন্য এখনও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে । কারণ মানুষের স্বভাব ও বুদ্ধির বিকাশ তো শুধু জিনের উপর নির্ভর করে না, তার পরিবেশও এসবের এক নিয়ন্তা ।

মানুষের উপর ক্লনিং সফল হলে সন্তানের জন্মের জন্য স্বাভাবিক জনন ক্রিয়ার দরকার হবে না । কোন পুরুষ বা মহিলা ইচ্ছে করলে নিজের শরীরের অংশ, একটি দেহকোষ থেকে সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন, যেমন ভাবে পাথরকুচি গাছে পাতা থেকে নতুন গাছের জন্ম হয় । ক্লনিং-এর সাহায্যে মহান প্রতিভাধর মানুষের শরীরের অংশ থেকে এরকম অনেক 'জিনিয়াস' তৈরি হবে গবেষণাগারে । এক একটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় এক এক ধরনের মানুষের সৃষ্টি হবে । জন্মের আগেই ঠিক হয়ে যাবে কে হবে সৈনিক, কে শিক্ষক, কে রাজনীতিবিদ, আর কে কবি ।

কাগজে কলমে মানুষের উপর এই ক্লনিং করা যতই সহজ মনে হোক, বাস্তবে কিন্তু তা নয় । ১৯৮১-র জানুয়ারি মাসে জ্যাকসন ল্যাবরেটোরির পিটার হোপ ও জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কার্ল ইলমেনসি ৩৬৪ বার চেষ্টা করার পর মাত্র তিনবার সফল ক্লনিং করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাও ইঁদুরের ক্ষেত্রে । মানুষের ক্লনিং

মানুষের উপর ক্লনিং সফল হলে সন্তানের জন্মের জন্য স্বাভাবিক জনন ক্রিয়ার দরকার হবে না । কোন পুরুষ বা মহিলা ইচ্ছে করলে নিজের শরীরের অংশ, একটি দেহকোষ থেকে সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন, যেমন ভাবে পাথরকুচি গাছে পাতা থেকে নতুন গাছের জন্ম হয় । ক্লনিং-এর সাহায্যে মহান প্রতিভাধর মানুষের শরীরের অংশ থেকে এরকম অনেক 'জিনিয়াস' তৈরি হবে গবেষণাগারে ।
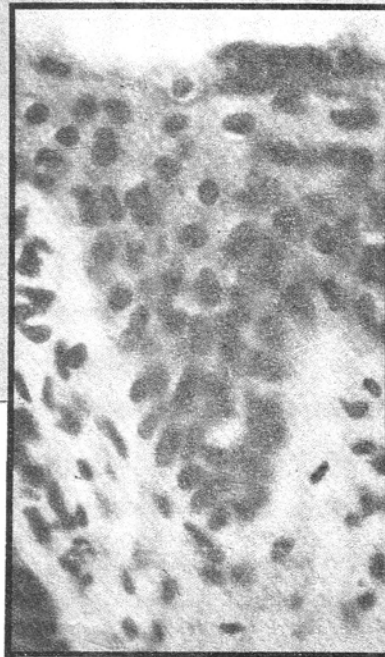
সেল নিয়ে ক্লনিং-এর পরীক্ষা
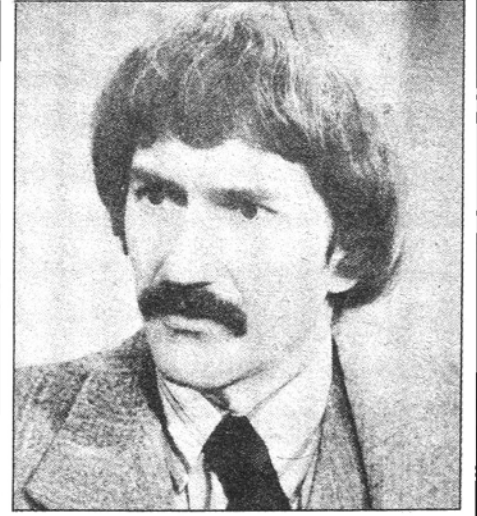
সাংবাদিক ডেভিড ররভিক

করা নিশ্চিতভাবেই ব্যাঙ বা ইঁদুরের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ । একটি দেহকোষ থেকে জীবিত নিউক্লিয়সকে বের করে আনা, তারপর সেটিকে একটি ডিম্বাণুর মধ্যে ঢোকানো-যার নিউক্লিয়সটি আগেই বের করে নেওয়া হয়েছে–এক কঠিন কাজ । এই কাজ সফল হলে যৌন সংযোগ ছাড়াই ডিম্বাণু ভ্রূণানুতে রূপান্তরিত হয় আর বিভাজিত হতে শুরু করে । এরপর ভ্রূণানুটিকে কোন মহিলার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয় টেস্ট টিউব থেকে । বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন গবেষণাগারে নকল মাতৃগর্ভ সৃষ্টি করার, আর তা যদি সম্ভব হয় তাহলে মা ছাড়াই সন্তানের জন্ম হবে বিজ্ঞানের দৌলতে । এখন যাকে আমরা টেস্ট টিউব শিশু বলি, জন্মের আগে নয় দশ মাস তার প্রতিপালন হয় মাতৃগর্ভেই । শুধুমাত্র প্রাণসঞ্চারের একেবারে প্রথমে টেস্ট টিউবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর যৌন সংযোগ ঘটান হয় ।

ক্লনিং-এর সাহায্যে নানা ধরনের উচ্চফলনশীল শস্য তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা । ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের ক্লনিং করে নানারকম দুরারোগ্য রোগ সারানোর চেষ্টা চলেছে । ক্লনিং-এর সাহায্যে ইচ্ছে মতন মানুষ তৈরি করতে পারলে হয়ত কিছু মানুষের প্রয়োজন মিটবে; কিন্তু পরমাণু শক্তি আবিষ্কারের মত এও হয়ত আর এক ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরি হবে । তখন সৃষ্টি হয়ত তার স্রষ্টাকেই চ্যালেঞ্জ জানাবে । এই ভয়ই প্রকাশ করেছেন নোবেল পুরস্কারজয়ী দুই মার্কিনী জীববিজ্ঞানী । ডঃ জর্জ ওয়াল্ড ও ডঃ যসু লেডারবার্গি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন আইন করে মানুষের উপর ক্লনিং-এর সমস্ত রকম পরীক্ষা বন্ধ হোক ।

পৃথিবীর কোন দুটি প্রাণী একরকম দেখতে নয় । সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুত রহস্যভাণ্ডার থেকে সব সময়ই অভূতপূর্ব জিনিস বেরিয়ে আসছে যারা রূপে ও গুণে অন্য সবার থেকে আলাদা । বৈচিত্রের জন্যই জীবন এত আকর্ষণীয় । কারখানার ছাঁচে ঢালাই হয়ে মানুষ বেরিয়ে এলে সে জীবনের কি আর কোন আকর্ষণ থাকবে ?

৭৭ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা নয়। গোয়া স্বাধীন হবার কিছুদিন পরই গঠিত হয় 'মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি', ১৯৬৩ সালে। উদ্দেশ্য গোয়ার মারাঠিভাষীদের স্বার্থরক্ষা। এর পর থেকে সেনসাস রিপোর্টে গোয়ার কোঙ্কনীভাষীদের সংখ্যা কমতেই থাকে। স্বাধীনতার সময়ে যা ছিল ৯৬ শতাংশ, তা ১৯৭১-এর জনগণনার সময়ে কমে দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশে, আর ১৯৮১-র জনগণনায় (যে রিপোর্ট অবশ্য এখনও সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি) তা নাকি কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ শতাংশে। ঘটনাটি আশ্চর্যরকমের। গোমন্তক পার্টির সাধারণ সম্পাদক রামকান্ত খলপও অবশ্য স্বীকার করেন, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কারণ এখনও ৯০ শতাংশ গোয়াবাসী কোঙ্কনীতে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তার বক্তব্য, কোঙ্কনী খুব একটা উন্নত ভাষা নয়, ফলে লিখিত ভাষা হিসেবেও অধিকাংশ মানুষই মারাঠিকেই নির্বাচন করেন।

ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গোয়ার প্রায় সব হিন্দুই মারাঠিকে তাদের মাতৃভাষা বলে দেখাচ্ছেন, যদিও কথাবার্তা বলেন কোঙ্কনীতে। অপরপক্ষে খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই কোঙ্কনীর পক্ষে। কিন্তু এতেও পরিসংখ্যানটি স্পষ্ট হয় না, কারণ গোয়ার দশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৫৬ শতাংশ হিন্দু এবং ৩০ শতাংশ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। আসলে, গোয়ায় যথেষ্ট চাকরি-বাকরির সুযোগ সুবিধে নেই বলে অনেককেই যেতে হয় প্রতিবেশী মহারাষ্ট্রে, পুনে, নাগপুর বা বোম্বাইয়ে। মারাঠিভাষী হলে এক্ষেত্রে সুবিধে মেলে। তাই মারাঠিকে মাতৃভাষা হিসেবে দেখানোর হুজুক বাড়ছে।

পর্তুগীজ আমলে মারাঠিভাষীদের 'ভারতীয় এজেন্ট' বলে সন্দেহ করা হত, এর ফলে কোঙ্কনীকে অনেকে দেখাতেন মাতৃভাষা হিসেবে।

তাই ১৯৮৪-৮৫-র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় মারাঠিভাষী স্কুলগুলিতে যেখানে ছাত্রসংখ্যা ৭৬,৯৯৪, সেখানে কোঙ্কনীভাষী স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৪১০ জন। মারাঠি 'গোমন্তক' পত্রিকার সম্পাদক নারায়ণ আতবাল-এর বক্তব্য-সবদিক বিবেচনা করলে গোয়ার ভাষা হওয়া উচিত মারাঠি, কারণ মারাঠি ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। অপরপক্ষে কোঙ্কনী ভাষার নিজস্ব কোনও লিপিই নেই। এছাড়া আজ পর্যন্ত এ ভাষায় সব মিলিয়ে ছাপা হয়েছে মাত্র তিনশটি বই। অপরপক্ষে কোঙ্কনী পক্ষের বক্তব্য, যেখানে অধিকাংশ অধিবাসীই কোঙ্কনীভাষী সেখানে প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রের ভাষাকে গোয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা অসঙ্গত। 'কোঙ্কনী পরেচো আওয়াজ' এর সভাপতি পুণ্ডলীক নায়কের বক্তব্য, একেই গোয়াতে ভিন্নপ্রদেশিরা মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্তদপ্তরে অধিকাংশ কর্মচারীই ভিন্ন প্রদেশের, কর্নাটক, এমনকি তামিলনাডু ও কেরালা থেকেও। মারাঠিভাষীদের জন্য আলাদা প্রদেশ রয়েছে, অথচ গোয়ায় কোঙ্কনীভাষীদের জন্য চাকরি সংরক্ষিত নয়। গোয়ায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের অধিকাংশ রয়ে যাচ্ছে কর্মহীন। বিদেশীদের ক্রমাগত আনাগোনা, তাদের কুপ্রভাব, নেশা এইসব ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট করছে, নষ্ট করে দিচ্ছে গোয়ার বেকার তরুণ সমাজকে।

তাদের মতে মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং রাণে মারাঠিদেরই সমর্থক, এমনকি গোমন্তক পার্টির নেতা খলপ লেফটেনান্ট গভর্নর গোপাল সিং-এর কাছেও মারাঠিকে স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ করার পক্ষে তদ্বির চালিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী জনতা সরকার এবং সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কোঙ্কনীকে প্রাদেশিক ভাষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গোয়া বিধানসভায় ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জন কং (ই) সদস্য এবং মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির সদস্যসংখ্যা ৮। কোঙ্কনী পরেচো আওয়াজ-এর আন্দোলনের ফলে, গোয়ার কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় একটি বিল আনার কথা বিবেচনা করেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা আনা হয়নি।

অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর দুই পক্ষের বিক্ষোভই চরমে ওঠে। বিচ্ছিন্ন ভাবে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুলিশের গুলিতে মারা যান ২৪ বছরের কোঙ্কনীভাষী তরুণ ফ্লোরিয়ানো ভাজ। দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠতে দেরি হয় না। স্বাধীন গোয়ার ইতিহাসে প্রথম ফ্লাগমার্চ করে সেনাবাহিনী।

প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের বন্দর শহর করাচিতেও ঘটে গেল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। শহরটি ভারতের কয়েকটি শহরের মতই দাঙ্গা প্রবণতায় আক্রান্ত। ১৯৮৫-র এপ্রিল মাসেও এই শহরেই শুরু হয়েছিল গোষ্ঠীসংঘর্ষের মারণলীলা। সেবার সরকারী হিসেবে মারা গিয়েছিল ২০০-রও বেশি মানুষ। এবারও সরকারী হিসেবে মৃতের সংখ্যা সমসংখ্যক, তবে বেসরকারী হিসেবে আসল সংখ্যা এর কয়েক গুণ বেশি। দাঙ্গার দুই পক্ষ পাঠান ও বিহারী। সিন্ধু প্রদেশের এই বাণিজ্য-শহরে উভয়পক্ষই বহিরাগত। বাংলাদেশ যুদ্ধের পর থেকেই করাচিতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে গাল্ফ কান্ট্রিগুলির সঙ্গে যোগাযোগকারী মাফিয়া চক্র। এছাড়াও নারকোটিক মাফিয়াদের মুখ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে করাচি। এদের মধ্যে অনেকেই আবার গড়ে তুলেছে ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবসা। আফগান-শরণার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের আকছার প্রচলনে করাচির ওরাঙ্গি, সোহরাব গথ-এর মত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হয়ে ওঠে নিত্য-নৈমিত্তিক মাফিয়া লড়াইয়ের কেন্দ্রভূমি।

এরই মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে ওঠে 'মুহাজির কৌমী মুভমেন্ট', সিন্ধু প্রদেশের রাজনীতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। প্রাদেশিক নির্বাচনের দুই প্রার্থী দীন মোহম্মদ বা তোচ (পাঠান) এবং হাসির হাসমী (বিহারী) দু'জনেই তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চালান। বিহারী নেতা বাসরা জাইদি, নিজামাবাদ এলাকায় নিহত হ'লে দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। ওরাঙ্গি এলাকায় একদিনেই নিহত হন ৬০ জন পাঠান। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত পাঠানেরা রাতের অন্ধকারে মাজদা, সুজুকি ভ্যান, মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিহারীপ্রধান এলাকা, সেকটর ১১-তে। হানাহানি ছড়াতে থাকে রহিম শা কলোনি, লিয়কত্তাবাদ, ইত্তেহাদ টাউনে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেশের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে (পাঞ্জাবী প্রাধান্যের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে) মুহাজির গোষ্ঠীর উষ্মার বহিপ্রকাশ। জাহাঙ্গির রোড, কোরাঙ্গি, নাজিয়াবাদ, ফেডারাল বি-এলাকার মত মুজাহির প্রধান এলাকার তরুণেরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সংঘর্ষে অংশ নিতে। দারিদ্র, বঞ্চনা, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি সব মিলে মিশে করাচি পরিণত হয় দাবানলের কেন্দ্রভূমিতে।

এই ভাবেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমি গড়ে ওঠে। যেমন করে গুজরাতে শুরু হয় সংরক্ষণ বিরোধী দাঙ্গা। আট সপ্তাহের অবকাশে তা রূপ নেয় সাম্প্রদায়িকতায়। ১৯৬৯-এও গান্ধীজির প্রিয় এই শহর ভস্মীভূত হয়েছিল দাঙ্গার দাবানলে। দাঙ্গায় আসে রাজনীতি, প্রবোধ রাওয়ালের মত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীদের হাত ধরে, আসে আণ্ডারওয়ার্ল্ড সহযোগীতা সুকুর নারায়ণ বাখিয়ার মত লোকেদের অংশগ্রহণে।

ভারতের কয়েকটি 'বাদ', আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদের মত শহরগুলিতে যেভাবে মাঝে মাঝেই স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল জ্বলে ওঠে, তার পেছনে কাজ করে এই সব পরস্পর সংশ্লিষ্ট ফ্যাকটর। এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য উপাদানগুলি তৈরিই থাকে, শুধু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায়। কখনও তা মসজিদের আশেপাশে শুয়োর, কখনও মন্দিরের সামনে গোমুণ্ড কখনও বা সংবাদপত্রের কোনও লেখাই যথেষ্ট। যেমন ব্যাঙ্গালোরের 'ডেকান হেরাল্ড'-এ একটি লেখা ছাপার ফলশ্রুতিতে কর্ণাটকে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গার তাণ্ডব। কাশ্মীরের একটি পত্রিকা 'ওয়াদি কি আওয়াজ' যখন উর্দু ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশ করে তখনই শ্রীনগরের বাদশাহ, জাহাঙ্গীর চক এলাকায় শুরু হয়ে যায় দাঙ্গার প্রস্তুতি। সম্পাদক গুলাম নবী সাইদার গ্রেফতার থেকে শুরু করে মাইসুমা বাজার এলাকায় পত্রিকার অফিসে পলিশ হানা পর্যন্ত ঘটনা ঘটে যায়।

শুভবুদ্ধি আর মানবিকতা কি স্রেফ প্রতিশ্রুতি হয়েই রয়ে যাবে?

ছবি: সুনীল সাক্সেনা, মুকেশ পারপিয়ানি

চা বাগান, পেছনে চায়ের ফ্যাকটরি

৭৯ পৃষ্ঠার পর

বেব দিন। শননুড়ি সাদা চুল নেড়ে বিড়বিড় করল এতোয়ারী। অতীত ওকে ঘিরে রয়েছে বহুকাল ধরে। শোনাবার লোক পায় না। আজ আমাদের পেয়ে মনের দরজা উজাড় করতে চায় এতোয়ারী। কতদিনই বা বাঁচবে আর। বলুক, ওকে বলতে দাও। সব মুখ চুপ মেরে গেল। চটের মধ্যিখানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসল বুড়ি এতোয়ারী। এক সময়ে চা বাগিচায় কামিনদের মক্ষিরানী, খোদ সাহেব ম্যানেজারদের বেডরুম সিরিজের টপ হিরোইন এতোয়া।

হ, বিশোয়াস কর রিপোর্টবাবু: হপ্তাভর সভ আশমানের দিকে চেয়ে চেয়ে চাঁদ গুনতো বাগিচায় কবে শনিবর আসবে। লাল মুখ সাহেবদের ভিড় জমতো। রঙীন পোষাকের বাহার লাগতো। দিনভর হৈ হুল্লোড়টা জমে উঠতো রাত নামলেই। কত বোতল লাল পানি যে খালি করেছে দিনভর লালমুখোরা কে জানে। সন্ধ্যে সন্ধ্যে আর কারো কারো পা চলে না, 'কিলার' ঘর থেকে বাংলো যেতেই পা হড়কে যায়। রঙীন চোখে জড়ানো গলায় তখন পছন্দ কামিনের নাম ধরে ডাকাডাকি ....চাই টাট্‌কা তাজা মদেশী যোয়ানী—না হলে শনিবরের দিনটাই মাটি হয়ে যাবে সাহেবদের। মেম বিবি তো দূর মুল্লুকে রয়েছে, তা এমন বুনো আসনাই কি আর সাদা চামড়ার বিবিদের কাছে পাওয়া যাবে। রোজদিনকার ব্যাপার আর শনিবর ভিন্ আছে। রোজদিন কাজ কাম, বাগানে টহল, ম্যানেজার আর বড়বাবুর উপর খবরদারি, সাম্ টাইমে বোতলের মুখ খোলা। কিন্তু শনিবর দিন ভর আমেজ।

ফি শনিবর সন্ধ্যে নামলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেত এতোয়ারীকে নিয়ে। সব সাহেবই ওকে নিয়ে বাংলোয় যেতে চায়। বেচারা এতোয়ারীর কঠিন অবস্থা। শেষে মহারাজার মাথাওয়ালা চাঁদির টাকা আশমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লটারি করত সাহেবেরা। যে জিতবে সে এসে হাত ধরত এতোয়ারীর। মুখে বুলি: ডারলিং ডারলিং। ব্যাস আকাশ ফর্সা হলেই সাহেবের নরম বিছানা ছেড়ে কুলি লাইনে ছোট, থলি রুমালি নিয়ে ডিব্‌টিতে যাও, দিনভর রোদ আর হিমে ঝুঁকে নুয়ে পাতি তোল, জমা ঘরে ছোট। তখন দিনমানে তোমাকে দেখলে
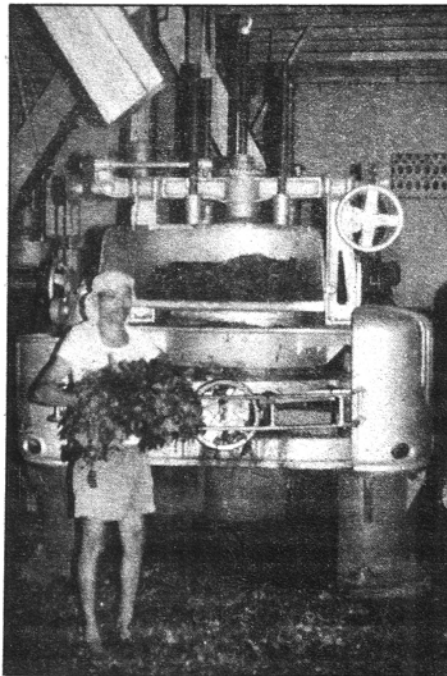
চায়ের প্রস্তুতি পর্ব

রাতের সেই পাগল হওয়া সাহেবটি চিনবেই না, পাতি তোলায় হাত আলগা হলে লাল মুখ বাঘের মতো গাক্ করে উঠবে: এ্যাই মাগ্‌গী কাম কর।

তা এর মধ্যে মনেও ধরেছে কোন মদেশী কামিন মেয়েকে সাহেবদের। এই তো আটিয়া বাড়ি চা বাগিচার সি সাহেবটা ছিল। কি নাম যেন। স্মৃতি হাতড়াতে যাবে বুড়ি এতোয়ারী। ওর স্মৃতির টুকরো জুড়ে দেয় মেহরাই বুড়ো: হ্যাঁ, উঃ সাহেবটার নাম ছিল ম্যাকেনজী সাহেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ ওই নামছিল সাহেবটার। কিরতা কামিনের যোয়ানী 'মনচলি'কে খুব পেয়ার করতো সাহেবটা, তো শেষমেশ আইন মাফিক তাকে সাদীই করে নিল। সাদা সাহেব তার কালা বিবি নিয়ে ক'মাস ছিল বাগিচায়, তারপর কোন বাগিচায় চলে গেল আসাম না কোথায় কারুর আর মালুম নেই।

বুড়ি এতোয়ারীর গরমেন্টের কাছে আর্জি: ও কত সাল আগে অবসর নিয়েছে, কিন্তুক পাওনা-গণ্ডা এখনও সব পায়নি। পি.এফ—টি.এফ. কি সব আছে। ওর বেটা কাজ করে বটে। কিন্তু কপাল, চা বাগিচার ধরম হাটবারে হপ্তার পাওনা নেশার খেয়ালেই চলে যায়, বাকিটা যায় বাগিচার গেটের বাইরে কুর্তা পরা দাঁড়িয়ে থাকা খান সাহেব কাবুলিওয়ালার সুদ মেটাতে। উরিবাব্বা রুপিয়ামে মাহিনায় রুপেয়া সুদ। ব্যস্ হপ্তার মজুরি খতম। শুধু ওর বেটা নয় হপ্তার মজুরি এভাবেই অন্যসব কুলি কামিনদের চলে যায় ভাঁটিখানার শুড়ি আর কাবুলিওয়ালার জেব্বায়। আজ জনম ভর খেটে পাতি তুলে, ওজন করে, দেহ বেঁকে বুড্ডা বুড্ডি বনে গেলেও জান কবুল করে এখনও খেটে যেতে হয়, হকের পাওনা গণ্ডার হিসাব ঠিক মতো মেলে না কেন বল্ রিপোর্টবাবু, তুই তো গরমেন্ট আছিস। এতোয়ারীর গলায় সুর মিলিয়ে অন্য সব গলাগুলো সাড়া মিলালো—হাঁ, ঠিকবাত। উত্তর কি দেব? গয়ারকাটা ছাড়িয়ে বানারহাটের দিকে আসতে চোখে পড়েছে পথের দুধারে চা বাগানের সারি। বড় গেট, আর প্রায় প্রত্যেক গেটের সামনে কাবুলিওয়ালাদের জটলা। দু-এক জায়গায় হাটের ভিড়, হাটবারে হাঁড়িয়া আর বোতলী সরাবের ঠেকে কুলি কামিনদের মেলা। চা-বাগিচায় হাটবারে ছুটি, হপ্তা মেলে আগের দিন। হপ্তার টাকা নেশা আর কাবুলির কাছে দিয়ে খালি হাতে হাটফেরতা হয়ে আবার হাত পাততে হয় কাবুলির কাছে ধমক আর চড়া সুদ কড়ার করে।

কি রিপোর্টবাবু গরমেন্ট? নিবু নিবু হয়ে আসা তেল ফুরানো টেমির আলোয় এতোয়ারী ফের জিজ্ঞাসা করে। ভাবি কি উত্তর দেব। পরিবার পিছু দু'তিনজনে আয় তো কম করে না। কিন্তু সব আয় যে কোথায় যায়, এতো গত ক'দিনে বাগিচা বাগিচা ঘুরে নিজেই বুঝেছি। আর পাওনা গণ্ডার হিসাব? তার হিসাব কে জানে? কোন খাতায়, কোন রেকর্ডে তা লেখা থাকে নি। জীবনভর যারা 'জনম পাতা' বাঁচিয়ে দুটি পাতা বেছে বেছে নিপুণ হাতে তুলে চামিন, শ্রীমতী টুল আর হরিনাথের মতো দশ এগারো বছর বয়সের শিশু শ্রমিক থেকে একদিন

কলাবতী, ইগনে শিয়া, মায়ালী, বুঠো, রোপনা বা দুখনীর মতো বুড্ডা বুড্ডি হয়েও চা বাগিচায় বা কলঘরে কাজ করে যায়, কাঁচা পাতি থেকে প্যাকিং চা হয়ে লরি লরি বোঝাই পেটি পেটি চা, দুনিয়ার বাজার থেকে মালিকের ঘরে পয়সার পাহাড় জমাতে জীবনভর ঝরে যাদের তাজা রক্ত, তাদের পাওনা গণ্ডার হিসাব সত্যি থাকে কি? ক'পুরুষে রক্ত জল করা খাটুনির কোন হিসাব এরা পায় কি? এ বড় কঠিন প্রশ্ন, এ বড় বাস্তব প্রশ্ন। হাঁ করে তাকিয়ে আছি টেমির আলো কমে আসা সব ক'টা মুখের দিকে। শেষ রক্ষা করে চুট্টুই। তরতাজা চুট্টুর নওজওয়ান মগজে বুদ্ধির ছিঁটেফোঁটা তৈরি হয়েছে চারদিক দেখে শুনে। মদেশীর ভাষায় ও সকলকে বুঝিয়ে দিল এ বাবুরা গরমেন্টকে সব রিপোর্ট লিখে দিবে, তা বাদে সব কিছু দেখভাল করবে গরমেন্ট, এরা তো আখ্‌বরী বাবু আছে।

হাত চেপে ধরেছে বুড়ি এতোয়ারী: ওর শিরা বের করা রোগাটে হাতে হাড়ই সম্বল। হাতে চাপ লাগছে, এতোয়ারীর মুখে একই কথা: সাহেবেরা গেল, গরমেন্ট এল, আমাদের পাওনা গণ্ডার হিসাব পায় না এ রিপোর্টবাবু। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ি, তেল শেষ হওয়া টেমিটা দু'বার দুপদাপ করে নিবে যায়। চারদিক এখন ধুম অন্ধকার, বাগিচাগুলো ভেলভেট চাদর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। টুপ্‌টাপ্ ঝরা শিশির মাখতে মাখতে। হঠাৎ এক বুনো সুর তুলে ধামসায় ক'বার ঘা মারলো বোওধ বুড়ো। অন্ধকারকে দু টুকরো করে দিল সেই শব্দ। দূরে ভুটান পাহাড়ের বুকে ঘা খেয়ে ফিরে এলো সেই ঢেউ। গোটা রেড ব্যাংক টি-স্টেট ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে ধরনীপুর, ডায়না, সুরেন্দ্রনগর বাগিচা, শুধু তাদের কানে রুমঝুম নূপুর বাজিয়ে চলেছে ডায়না নদী। ধামসায় সেই বোওধা বুড়ো আজকের মতো আসর খতম ঘোষণা করে দিয়েছে। আবার কাল ভোরের ভোঁ শুনেই ছুটতে হবে বাগানে। চুট্টু এসে সামনে দাঁড়াল—চল বাবু, মনুবাবুর কোয়াটার যাবি তো চল।

চুট্টুর হাত চেপে ধরি, কুলি লাইনের অন্ধকার কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি তিনজনে, মনুবাবু-মনু পালের কোয়ার্টারের দিকে। রেড ব্যাংক বাগিচার দক্ষ কর্মী সুঠাম যুবক মনু। দু'পুরুষ কাটছে তাঁর এই বাগিচায়। বাবা রোহিনী পাল জীবনভর কর্মী ছিলেন ভুঁই রেড ব্যাংক বাগিচায়। এখন তার জায়গায় মনু। হাঁটতে হাঁটতেই এক জব্বর খবর দেয় চুট্টু: পরশু বাপ বেটার বিয়ার আসরে নিয়ে যাব তোদের, যাবি?

বাপ-বেটার বিয়ে! অবাক হই। চুট্টু হাসে। হ্যাঁ বটে। চা বাগিচায় এলি, ইখানকার আইনকানুন, জীবন দেখবি না! হ্যাঁ, বাপ বেটার বিয়া দিখাব তোদের পরশু দিন। আমরা অবাক হই, চুট্টু হাঁটতে থাকে। কুলি লাইনের নর্দমাগুলোতে শুয়োরের পাল মহাআনন্দে ভোজের খোঁজে নেমে পড়েছে। হাঁটছি, আমরা হাঁটছি মনু পালের কাঠের কোয়াটারের দিকে। গোটা বাগান গভীর ঘুমে ডুবে আছে। বাগিচার মধ্যে শেডট্রীর মাথায় রাতচরা পাখির

চা বাগানের কর্মী-পরিবার

ডাক ট্রে...ট্রে...ট্রে..., বহু দূরে ভূটান পাহাড়ের মাথায় সামচির আলো উঁকি মারছে। ওয়াচম্যান রামদাস বাল্মিকী লাঠি হাতে ঘুরছে, আমাদের দেখে টর্চের আলো ফেলল। দু'ধারে শালের সাজান সারির মধ্যে দিয়ে বাগিচার সুরকি ঢালা বুক ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। গোটা বাগান আর তাবৎ মানুষ এখন ঘুমোচ্ছে, কালকের ভোঁ বাজার অপেক্ষায়।

ভোঁ...ও...ভোঁ...ও। প্রায় একটানা আর্তনাদ

কাজে ঢিল দেখলেই ধমক। তবে ধমকের চেয়েও বড় বেশি ভয় কখন কার দিকে বাগানবাবুর 'নজর' পড়বে। সীমাহীন আদিগন্ত সবুজ বাগিচায় হঠাৎ বাবুর 'শিকার' হওয়া বিচিত্র নয়। নীল আকাশের নিচে নিরীহ মেয়ের ইজ্জত লুঠ হয়ে যায়, সাক্ষী শুধু আদিগন্ত সবুজ বাগিচা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি।

ভেসে যায় ভোরের আকাশে। সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে আকাশ, শান্তভাবে ঘুমিয়ে আছে সবুজ পাহাড়। ঠিক তক্ষুণি ঘুম চটকে ছুট-ছুট—। কাঁধে রুমালি, বস্তা, পিঠের সঙ্গে পিট্টু বাঁধা বাচ্চা। শেষ ভোঁ বাজার আগে হাজিরাবাবুর সামনে সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাবু লম্বা খাতা নিয়ে গুনতি করে যাবে সোমারী, বিরসি, বুধনা, সনচারিয়া, কিংবা চামরু, বড়িয়া, ফ্রান্সিস, শিবরণ....হ্যাঁ হাজির দিয়েই 'ডিবটি' বুঝে নিয়ে ছুটতে হবে বাগিচায়। হাত তখন দুরন্ত হরিণ হয়ে তুলে যাবে 'জনম পাতা' বাঁচিয়ে দুটি পাতা। মাথার উপরে আগুনে রোদ, কখনো হিমঝরা উত্তুরে পাহাড়ি হাওয়া বা তুষারকণা মেশানো ঝুর-ঝুর ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি। কিচ্ছুতেই রেহাই নেই। দিনভর, শেষ ভোঁ—র মধ্যে বাইশ কেজি পাতি জমা ঘরে বোঝাই করতেই হবে। নীল হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফ সার্ট, পায়ে কেড্‌স পরা বাগানবাবু কখন হঠাৎ এসে হাজির হবে তার কিছু ঠিক আছে! কাজে ঢিল দেখলেই ধমক। তবে ধমকের চেয়েও বড় বেশি ভয় কখন কার দিকে বাগানবাবুর 'নজর' পড়বে। সীমাহীন আদিগন্ত সবুজ বাগিচায় হঠাৎ বাবুর 'শিকার' হওয়া বিচিত্র নয়। নীল আকাশের নিচে নিরীহ মেয়ের ইজ্জত লুঠ হয়ে যায়, সাক্ষী শুধু আদিগন্ত সবুজ বাগিচা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি।

তবে হ্যাঁ, খচরাই মাগীভিও আছে। রাঙা বাবুটাকে তার মনে ধরল, ব্যস এক দুপুরে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিল—বাবু ওর হাত টেনেছে। দু'পাঁচ মিনিট, আনাচে কানাচে পাতি তোলারা যেখানে ছিল ছুটে আসে। বাবুটির বেইজ্জতের এক শেষ। দিন ফুরানোর আগেই বাগান ছেড়ে উধাও হতে

হয়। তবে সি সব দিন এখন অনেক বদল হয়েছে। সাহেববাবু সব সমঝে গেছে দিনকাল।

দৈনিক আট ঘন্টায় ৬ পয়সা রোজে কুলির কাজ শুরু করেছিল শেহরাই। সেই মাটিয়া সাহেবের আমলে। শেহরাই তখন সর্দার। ওর বাবা ঠাকুর্দা সকলেরই জনম কেটেছে চা বাগিচায়। বিয়ে সাদী, জন্ম মৃত্যু সবই জড়িয়ে আছে বাগানের সঙ্গে। ঠাকুর্দার মুখে শোনা গল্পটাই বলছিল শেহরাই সর্দার। ওকে ঘিরে রয়েছে মদেশীয় মেয়ের ঝাঁক। একটু ফুরসৎ পেলে শেহরাই বুড়োকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা মস্করা করতে ছাড়ে না। তা, আমাদের দেখে মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল, হাসছিল মুখ টিপে। এক ধমকে তাদের চুপ করিয়ে দিল শেহরাই। তারপর বলতে লাগল ওর ঠাকুর্দার মুখে শোনা চা বাগিচার প্রাণপুরুষ রহিম বক্সের গল্প। গল্পের শুরুতে প্রচলিত সেই এক ছড়া:

'নোয়াখালি করি খালি
আসি জন পাট
বিবির আঁচল ধরি
চুয়া পানি খাই।'

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি থেকে এসে রহিম বক্স ১৮৯২ সালে পত্তন করেন ডুয়ার্সে তোতাপাড়া বাগান। আর এর পরেই ১৮৯৬-তে নিজের নামেই পত্তন হয় ইংরেজদের দেওয়া খাস জমিতে রহিমাপদ চা বাগিচা। 'চা' তখন ছিল এক আজব জিনিস। রহিম বক্সকে নিয়ে মুখে মুখে ঘুরতে থাকে ছড়ার পর ছড়া। কিন্তু শুধু রহিম বক্সেই থেমে থাকল না....। পূর্ববঙ্গ, চব্বিশ পরগণা থেকে ধনী মানুষদের ভিড় আর রাঁচী, দুমকা, হাজারীবাগ থেকে কালো কালো অভাবী মানুষদের ভিড় শুরু হলো তামাম ডুয়ার্স জুড়ে। বাবুদের টাকা আর বুদ্ধিতে বাগান, কলঘর রমরম করে বাড়তে লাগল, পাল্টাতে লাগল বাগানের চেহারা আর মালিকবাবুদের চালচলন। অন্যদিকে সুদূর বিহার, মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে আসা মানুষগুলোর শিকড় ও গাছের মতো গেঁথে গেল উত্তর বাংলার ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আর উপায়ও তো নেই, যাবে কোথায়? চারদিকে পাহাড় জঙ্গল, হিংস্র জন্তু, বিভীষিকার মতো ম্যালেরিয়া আর অন্যদিকে চাবুকের ভয়। উঃ কি সেই চাবুকের জ্বলুনি। তা খোদ লালমুখো সাহেবদের পাশাপাশি বাঙালি বাবুদের বাগানগুলোও বেশ রমরমা হয়ে উঠেছিল। ভবানী প্রসাদ রায়, জে.সি. ঘোষ, বিহারী গাঙ্গুলী, মুসারাফ হোসেন এগিয়ে আসেন জোর কদমে। চা বাগানে ডুয়ার্স অঞ্চলে বাঙালী কোম্পানিগুলো মাথা উঁচিয়ে উঠতে থাকে সাহেবদের পাশাপাশি। আর দেশ স্বাধীন হবার পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পর সাহেবরা প্রায় সব বাগানই ছেড়ে দেয়, কয়েকজন টিকে থাকেন, হয় শেয়ার নিয়ে বা কর্মচারী হিসাবে। কিন্তু এখন প্রায় বাগানই বাঙালী মালিকদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। দাপট চলছে আগরওয়াল, কেজরিওয়াল, জয়সোয়াল বা টিবরেওয়াল গোষ্ঠির।

বাঙালী মালিকানায় বাগান আঙুল গুনে বলা যায়। এই তো এস পি রায় বাবুদের কত্তো বাগান ছিল। আর এখন, গড়গড় করে বলে যায় শেহরাই সর্দার: আটিয়াবাড়ি, কলাবাড়ি, কাঠালগুড়ি, মধু আর মথুরা ব্যস। মুখ দিয়ে একটা ফুঁ শব্দ ছুঁড়ে দিল শেহরাই। ওকে ঘিরে থাকা পাতি তোলা মেয়েগুলো খিলখিল করে হেসে উঠতেই এক ধমক লাগালো শেহরাই সর্দার–বেসরম, কাম কর জলদি, লাগা হাত লাগা। এক ঝাঁক পাখির মতো বিচিত্র রঙের ঘাঘরা পরা মেয়ের দল পাতি তোলা থলির ভারে ঝুঁকে তরতর করে ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক সারা বাগানে, সবুজের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে ওরা ক্রমশ দূরে, মৃদু হয়ে আসছে ওদের হাসির শব্দ খিল... খিল...

চা বাগানের 'ক্রেশ'

হঠাৎ সে হাসির রেশটুকুও ঢাকা পড়ে যায়। কানে ভেসে আসে মোটর সাইকেল ছুটে আসার শব্দ। শেহরাই সর্দার ব্যস্ত হয়ে এক পাশে সরে যায়, বলে–ম্যানেজার সাহেব, সুর সাহেব আসছেন ধরনীপুর বাগিচা থেকে। একটু পরেই চারদিক কাঁপিয়ে হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট, মাথায় টুপি ম্যানেজার সুর সাহেব মোটর সাইকেলে ঝড় উঠিয়ে ছুটে গেলেন কলঘরের দিকে। যাবার সময় হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন কলঘরের দিকে যেতে। কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলের এককালের ডাকসাইটে ছেলে পি, সুর এখন ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগিচায় একটা উল্লেখযোগ্য নাম। দুদিন আগেই মনু পালের মাধ্যমেই আলাপ হয়েছে। প্রায় অনেক রাত পর্যন্ত বাগান, ম্যানেজার ও ম্যানেজারের বিচিত্র কাহিনী শুনেছি অনেকের মুখে পান-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে। রাতের নিত্য সঙ্গী তো এখানে একটাই। সারাদিনের দাপানী, ক্লান্তি, আর নিঃসঙ্গতা দূর করার যাদুমন্ত্র!

ম্যানেজার! হ্যাঁ, অনেকের মুখেই আশ্চর্য ভাব দেখে গত ক'দিন বাগানে বাগানে ঘুরে নিজেও কম আশ্চর্য হয়নি। সাজানো বাংলো, বাগান, আয়া, বাবুর্চি, বিজলীবাতির রোশনাই কোন কিছুরই কমতি নেই, কিন্তু তবুও প্রতি মুহূর্তে চা বাগানের ম্যানেজার চোখের সামনে ঘোর অনিশ্চয়তার ছায়া দেখেন। কেন? এক চটপটে তরুণ সহকারী ম্যানেজার বললেন, শুনুন তবে, আর বলুন কুলি লাইনের চেয়ে কি খুব ভালো থাকি আমরা? খোদ মালিকের মর্জির উপর আমাদের চাকুরি ঝুলে থাকে। সকাল বেলা বাইক হাঁকিয়ে দাপিয়ে বেড়ালাম। সন্ধ্যে বেলায় অন্ধকার বাংলোয় বসে ভোরের অপেক্ষায় থাকতে হয়। কেন? ঠিক দুপুর বেলায় মালিকের তরফ থেকে আদেশ-নকরি নট। ব্যস সুখ হাওয়া। আর নকরি যেই খতম, বাংলোয় বিজলীবাতিও বন্ধ। শুধু রাতটুকু কাটিয়েই পরদিন খোঁজ করতে হবে কোন বাগানে যাওয়া যায়। তা, কাজ মিলতে সময় লাগে না। কারণ ম্যানেজারের চাকুরি যাওয়া আর পাওয়া নিত্যদিনের খেলা।

এই তো কিছুদিন আগেই রেড ব্যাংক বাগিচার থেকে হঠাৎই নির্মূল হয়ে গেলেন ম্যানেজার দিলীপ বসু, আর আমবাড়ি বাগিচা থেকে নির্মূল হলেন ম্যানেজার ধর সাহেব, পি কে ধর। অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো মাত্র কয়েকদিন পরেই। আমবাড়িতে ম্যানেজার হয়ে চলে গেলেন দিলীপ বসু, আর ধর সাহেব চলে এলেন তাঁর জায়গায় রেড ব্যাংক বাগিচায়।

ব্যাপারটা এই আজকে যাকে দেখে বাগিচার বাবু থেকে শুরু করে শিশু শ্রমিক পর্যন্ত পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকে, অবস্থার ফেরে দু'দিন পর তাকে দেখে ডোন্ট কেয়ার ভাব ফুটে ওঠে সকলের আচার আচরণে।

আবার 'বাবু' যে এখানে কত আছেন: বাগান বাবু, মাল বাবু, রেশন বাবু, মশা বাবু, গুদাম বাবু। তবে দাপট বেশি বড়বাবুর। এরাও চাকুরিতে আসেন পারিবারিক সূত্রে।
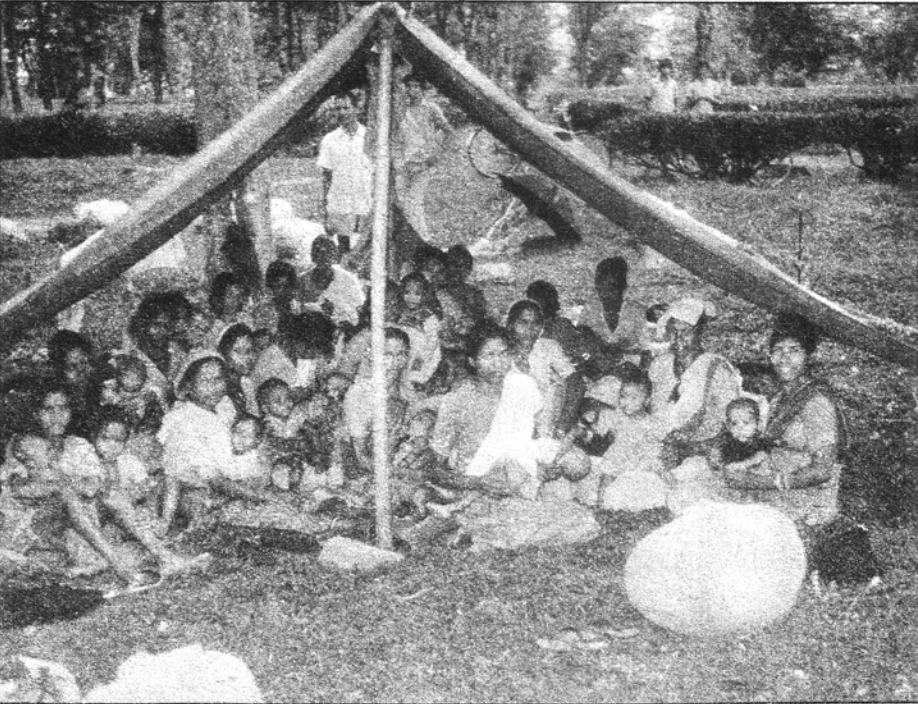
কিন্তু শ্রমিকদের বেলায় চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে একবার এসে পড়েছে কোন বাগানে তার শিকড়ও গেঁথে গেছে একটা বাগানেই পুরুষানুক্রমে। মাতৃকুল পিতৃকুল মিলিয়ে তিন জেনারেশন কাজ করে যাচ্ছে, পাতি তুলছে, কলঘরে কাজ করছে একই বাগানে একই সঙ্গে। শুধুমাত্র চা বাগিচায় এ দৃশ্য সম্ভব। সবুজ গালিচা আর হপ্তার মজুরী। সস্তায় নেশা আর যো খুশ সাঙ্গা করার জালে এখানে যে ভিনপ্রদেশী পুরুষটি বা ঘর সংসার ভাসিয়ে যাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে সেই জেনানা, একবার জড়িয়ে ফেলেছে তার জীবন–সে আর ফিরতে পারে না। জনমভর জনম পাতা বাঁচিয়ে পাতি তুলে, বাচ্চার জন্ম দিয়ে, কুলি লাইনের অন্য জীবনে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। সবুজ বাগিচার নেশা বড় ভয়ংকর নেশা। ম্যানেজার সাহেবদের অফিস ঘরে আর কলঘরে চা তৈরির বিচিত্র কাণ্ডকলাপ দেখে পা বাড়ালাম। বিরাট বিরাট যন্ত্র দানব প্রতিদিন কাঁচাপাতি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এক্‌কেবারে শুকনো চা তৈরি করে ১৪০০ কে.জি.। লরি বোঝাই পেটি চলে যায় শিলিগুড়ি অকশন হাউসে। সেখান থেকে কলকাতা। আর তার পরেই সারা ভারত, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায় চা। ডুয়ার্সের নিঝুম বাগিচায় কোন কামিনের নরম তোলা পাতি, যে পাতির সঙ্গে হয়তো বা জড়িয়ে আছে কান্না, তাই চা হয়ে মর্নিং টি, বেড টি হয়ে হাজির হয় দূর বিদেশে ঘরের কোণে–রথী মহারথী থেকে শুরু করে ফুটপাতবাসীর কাছে পর্যন্ত। একটু স্বস্তি, একটু আমেজ–চাই এক কাপ, এক গ্লাস, এক ভাঁড় গরম চা।

কলঘরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। চারধারেই সবুজ বাগিচা রোদ্দুরে চোখ ধাধিয়ে দেয়। দূর থেকে ভেসে আসছে ডায়না নদীর চঞ্চল নূপুর রুমঝুম। হঠাৎ কয়েকটা বাচ্চার আকাশ ফাটানো চিৎকার কানে এল। চিৎকারটা বেশ দূর থেকেই ভেসে আসছে। কারা কাঁদে! কাদের বাচ্চারা কাঁদে? থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছি। গার্ড রামদাস বাল্মিকী এগিয়ে এল সামনে। ওকেই জিজ্ঞাসা করি–কোন্ রোতা?

রামদাসের ছোট্ট উত্তর: কিরিচ্।

কিরিচ্! অবাক হই। রামদাস হাতছানি দিয়ে ডাকে। এগিয়ে চলি ওর সঙ্গে। বাগিচা একটা, একটা উঁচু টিবিতে। চারধারেই শুধু চা গাছ। তারই মাঝখানে খোলা আকাশের নিচে ছোট্ট একটা শতছিন্ন তাঁবু, হাত দুয়েক উঁচু। তার নিচে চটের টুকরোর উপর একগাদা ছোট্ট বাচ্চা অসহায়ভাবে কাঁদছে, কেউ বা হামাগুড়ি দিয়ে মাটি চাটছে, কেউ বা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, হ্যাঁ, এটাই 'কিরিচ' মানে কিনা 'বেবি ক্রেচ্' এক্‌কেবারে শিশু বাচ্চাটাকে পিঠে নিয়ে কাজ করা যায় না, পাতি তোলা যায় না, তাই এক টুকরো তাঁবুর নিচে এই কিরিচে তাকে রেখে বাগানে পাতি তুলতে যেতে হয়। না, দূর বহু দূর চা পাতি তোলা শ্রমিক মায়ের কানে সেই কান্না পৌঁছায় না, আর পৌঁছালেও উপায় নেই, তার হাত তখন ব্যস্ত থাকে পাতি তুলতে, মন থাকে ভোঁ শব্দ শোনার অপেক্ষায়। দিনভর ২২ কেজি পাতি জমা-ঘরে দিতেই হবে। খোদ

বাগানের শিশুদের ক্লাস চলেছে

কোম্পানির শ্রমিক হলে মজুরি দিনে ১১ টাকা ২৫ পয়সা। ঠেকা শ্রমিকের মজুরির ঠিক নেই।

কাঁদছে বাচ্চারা ক্ষিধের জ্বালায়। চলিয়ে সাহেব, হাঁক দেয় গার্ড রামদাস। হ্যাঁ, চলি। স্বল্পভাষী রামদাস বলে, সাহেব এই তো বাগিচা কা জনম। আচমকা বাগিচার ওপাশে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা হায়না, চিতা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কোন বাচ্চা, একটা শিশুর আর্তনাদ বাতাসে ভাসে। অনেক পরে তার সঙ্গে মিশে যায় মায়ের বুকফাটা কান্না। একদিন, দু'দিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। শিশুহারা মা আবার যথারীতি নুয়ে, ঝুঁকে পাতি বোঝাই করতে থাকে দিনভর, আর উদাস চোখে কিরিচটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চলতে চলতে বাপ ব্যাটার বিয়ের রহস্যটা রামদাসের মুখ থেকেই শুনে নিই।

অনেক অনেক আগে ভিনদেশ থেকে ভেসে আসা যোয়ান যোয়ানী যারা ঘর বাঁধতে কাজ খুঁজতে এসে বাগিচায় ছুটে গিয়েছিল–কুলি লাইনের খোপরি আর নকরি পেয়ে নতুন জীবন শুরু করল। বাচ্চার জন্ম দিল। সেই বাচ্চারা এখন বড় হলো। তাদেরও যোয়ান বয়স। এবার কুলি পাতি তোলা যোয়ানীকে মনে ধরেছে। তারা ঘর বাঁধবে। তা, সমাজ তো মানবে না বাপ মাকে। তাদের তো বিয়েই হয়নি, তাই শুদ্ধ করে নেওয়া। একই আসরে বাপ মা আর বেটা বেটার বৌ। বিয়ের আসর বসে কুলি লাইনে। আগে বাপ মায়ের বিয়েটা শুদ্ধ করে পরে বেটার বিয়ের মন্তর বলে ভগনাইবুড়ো। তা জোর খানা পিনা চলে দু' তিন রোজ। ব্যস নতুন জুটি জোড় বেঁধে গেল। চা বাগিচা থাকে নতুন প্রজন্মের অপেক্ষায়। বাগিচার ভাবী শ্রমিক বাড়তে থাকে পাতি তোলা মা শ্রমিকের পেটে একটু একটু করে তা দিন কাল একটু বদল হয়েছে এখন বাগানে প্রাইমারী স্কুলে শ্রমিকদের বাচ্চারা পড়তে যাচ্ছে। তা ওই দু'এক সাল যাবে, ব্যস তারপর জমা ঘরে নাম লিখিয়ে ছোট্ট রুমালী নিয়ে বাগানে ছুটবে, মিশে যাবে কুলি কামিনের ভিড়ে। ডিব্‌টি শেষেই নেশা, ধামসা মাদল, হপ্তার টাকা কাবুলিওয়ালার পকেটে দেবার জন্য সে তৈরি হতে থাকবে দিনে দিনে। তারপর একদিন বুড়ো হয়ে বড়বাবুর কাছে ভিখ মাগবে, আমার বেটা কিংবা বিটিটাকে কামে জুড়ে দে বাবু। কাজ তো আকছার রয়েছে। ব্যস, শিশু শ্রমিক বৃদ্ধ হয়ে লাল চোখ জড়ানো গলায় নতুন কোন শিশু শ্রমিককে শোনাবে নিজের জীবনের বিচিত্র কথা, বাগানের গল্প। চলছে একই দৃশ্য। চলছে বাগিচার সেই সাহেবদের কাল থেকে আজও। অনেক ছবি বদলেছে। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থাটা সেই আদ্যিকালের মতোই রয়ে গেছে। ছিঁটেফোঁটা বদলাইনি।

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে দূরে বহুদূরে শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত উত্তরবঙ্গের শুধু ডুয়ার্সেই মোট ১৪৫টা চা বাগিচায় এভাবেই বয়ে চলেছে এক অদ্ভুত জীবন প্রবাহ। নীল আশমানের নিচে সবুজ গালিচা বিছানো রয়েছে মাইলের পর মাইল আদিগন্ত। আমাদের দেশ বছরে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, তার ২৭.৭৩ ভাগ আসে এই চা থেকে। আর তারই মাঝখানে কত ব্যথা, বেদনা, কান্না আর রক্তের অদৃশ্যলিপি নীরবে গুমরে মরছে। 'চা', হ্যাঁ বড় স্বাদের, বড় আমেজের এই 'চা'য়ের সঙ্গে যে জীবন রহস্য-জড়িয়ে আছে তা বাইরে থেকে কিচ্ছুটি বোঝা যাবে না। এখানে রয়েছে সবুজের নরম ছোঁয়া আর পাথুরে কঠিন জমাট বাঁধা দুঃখ। এখানের বাতাসে রয়েছে অদৃশ্য কান্নার সুর, খুব কাছাকাছি না এলে এ আশ্চর্য বাগিচার জীবন রহস্য অজানা অচেনাই রয়ে যাবে। ছবি: দেবব্রত ব্যানার্জী

বিখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক ও 'যুগান্তর' –এর সফল সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী বাংলা সংবাদ সাহিত্যে কিংবদন্তী-পুরুষ। আজকের বাংলা সাংবাদিকতায় তারুণ্যের যে সব উজ্জ্বল নামগুলি দেখা যায়, তার অনেকেই শ্রী চৌধুরীর সৃষ্টি। এখানে তিনি স্মৃতির শহর থেকে তুলে এনেছেন মার্কিন মুলুকের সাংবাদিক বন্ধুর অনিন্দিতা সেই নারীকে তাঁর স্মৃতিজর্জর মুহূর্তগুলি সহ।

সেই মেয়ে

আলোচনার বিষয় মুখরোচক। মারকিন নারী। মারকিন দেশের ক'জন অবিবাহিতা অসতী এবং সহজলভ্যা, সে বিষয়ে রসমধুর গবেষণা চালাচ্ছে গ্যালাঘার। তার সঙ্গে ফোড়ন কাটছে রাল্‌ফ। দু'জনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সেই আলোচনাকে আরও সারগর্ভ ও আরও সরস করে তুলেছে। আমি শ্রোতা।

দরজার গোড়াতেই রাল্‌ফকে জড়িয়ে ধরে

রাল্‌ফ সোজ আর নীল গ্যালাঘার—দু'জনেই আমার সহকর্মী, নিউ ব্রানসউইকের 'দি হোম নিউজ' কাগজের রিপোর্টার। ১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির এই শিল্পপ্রধান শহরের খবরের কাগজটিতে আমি কাজ করতে এসেই রাল্‌ফ আর গ্যালাঘারের মত দু'জন মাই ডিয়ার বন্ধু পেয়ে যাই। নিউ ব্রানস-উইক নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল চল্লিশ দূর।

গ্যালাঘার বললে, গত বছর সমীক্ষা চালানো হয়েছিল মারকিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। দেখা গিয়েছে, শতকরা ৭৬টি মেয়ে বিয়ের আগেই বিয়ের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস-গুলোয় যা কাণ্ড চলে, বুঝলে ভায়া, কিছুদিন ঘুরলেই দেখতে পাবে।

রাল্‌ফ বললে, না নীল, শুধু ক্যাম্পাসগুলোর দোষ দিও না, বাড়িতেও একই অবস্থা। শুক্রবার রাত্তিরে মেয়ে বাড়ি থাকলে মা ভেবে সারা। কি ব্যাপার, কিছু অঘটন ঘটল নাকি! শুক্রবার উইক এণ্ডের রাত শুরু। মা ভাবেন অন্য বাড়ির মেয়ে ছেলে-বন্ধু নিয়ে ফূর্তি করতে বেরিয়েছে, ফিরবে রাত কাবার করে। আমার মেয়ে কিনা পড়ার ঘরে বসে সময় মাটি করছে!

কথায় কথা বাড়ে। আমি রাল্‌ফকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ শ্রীমান। আজ আমার তোমার ওখানে যাওয়ার কথা, ভুলে গেলে নাকি? তোমার বউয়ের সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ করব যে!

আমার কথায় হুঁশ হল দুজনের। পাঁচটা বাজে। সান্ধ্য কাগজ, অফিস ছুটি হয়েছে চারটায়। আড্ডা মারতে মারতে এক ঘন্টা কাবার।

তিনজনে বেরোলুম। গ্যালাঘার ওর গাড়িতে উঠে বাড়ির পথ ধরল। ও যাবে প্রিন্সটনের দিকটায়, কেনভাল পার্কে। আমি উঠলুম রাল্‌ফের গাড়িতে। সোজা চলে এলুম আমার আস্তানায়।

আমি থাকি ইউনিয়ন স্ট্রিটে। খাস রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায়। যাকে বলে ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস। গ্যালাঘার জানে না, ইতিমধ্যেই কলেজ ছাত্রীদের কাণ্ডকারখানা অনেক কিছু আমি দেখে ফেলেছি।

ইউনিয়ন স্ট্রিটে আমি থাকি পেয়িং গেস্ট হয়ে। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুচার জন ছাত্র থাকে ওই বাড়িতে।

আমার ঘরে রাল্‌ফ মারকিন মেয়ে সম্পর্কে আর এক দফা জ্ঞান দিল, এ দেশের মেয়েদের নৈতিক অবনতি কত সুদূরপ্রসারী সে বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতাই প্রায় সে ফেঁদে বসল। বলল, এক সময় তাই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, ভাবি এদেশ ছেড়ে পালাই। আমার স্ত্রীরও ঘেন্না ধরে গিয়েছে এখানকার সমাজে। লানার সঙ্গে তোমার একদিন আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে ও অন্যরকম। শুনেছি তোমাদের ইনডিয়ায় এসব নেই। ওখানে জায়গা দেবে আমাদের দু'জনের?

নিশ্চয় নিশ্চয়—আমি সানন্দে সম্মতি দিয়ে বলি—ঠিকই বলেছ রাল্‌ফ, আমাদের দেশের নীতি-জ্ঞান অন্যরকম, বিশেষ করে গ্রামে, তবে তোমার বউকে মাথায় সারাক্ষণ দেড়হাত ঘোমটা টেনে থাকার জন্য তৈরি হতে বল।

ঘোমটা! সে আবার কী, রাল্‌ফ আকাশ থেকে পড়ে। আমি সবিস্তারে আমার দেশের বিপ-রীত দিকটি বলি। রাল্‌ফ হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, এও কম মারাত্মক নয় দেখছি, তার চেয়ে বরং চল, আপাতত একটু বাইরে বেরোই।

বেরোতে পারি এক শর্তে।

কিরকম?

গাড়ি নয়, হাঁটব। তোমাদের দেশে হাঁটার সুযোগ পাচ্ছি না।

রাল্‌ফ হেসে বলে—ঠিক আছে, চল খানিকক্ষণ হেঁটেই আসি, তারপর ফিরে এসে বাড়ি যাব, আমার বাড়ি তো বেশিদূরে নয়। গাড়ি এখানেই থাকুক।

দু'জনে আবার বেরোলুম। রাটগার্স বিশ্ববিদ্যা-লয়ে দিনান্ত-ছুটি খানিক আগে হয়েছে। যেযার ঘরে ফিরছে। বইখাতা হাতে সব জোড়া জোড়া। মেয়েদের কেউ বাহুলীনা, কেউ বক্ষলগ্না। ওদের খিলখিল হাসির আওয়াজ পেছনে ফেলে আমরা শহরের দিকে এগিয়ে চলি।

অক্টোবরের শেষ। হৈমন্তী 'ফল'—এর গাছে পাতার রঙ বদলানোর পালা শেষ। এবার পাতা খসানোর সময়।

ইউনিয়ন স্ট্রিট, আর কলেজ এভিনিউ ছেড়ে সামনে খানিক এগিয়ে পৌঁছলুম লাইব্রেরির সামনে। চারধারে গাছ আর গাছ। গাছের তলায় বেঞ্চি। বেঞ্চিতে আবার সেই জোড়া জোড়া, দু'জনে মুখো-মুখি কিংবা বলতে পারেন বুকোবুকি। রাল্‌ফকে বললাম—না এখানে আর নয়, বেশিক্ষণ থাকলে চিত্তে বিকার দেখা দিতে পারে।

কেন ভয় কিসের—রাল্‌ফ বলে, চাও তো তোমার সঙ্গে, এসো, কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আমি ভয় পেয়ে বলি—না বাবা কাজ নেই। শিকাগোর সেন্টক্লেয়ার হোটেলে রাত দেড়টায় আমার ঘরের দরজায় কে যেন টোকা মারে। দরজা খুলে দেখি জলজ্যান্ত একটি মদিরাক্ষী মারকিন যুবতী। কোথায় ঘরে এনে আদর করে বসাব, আমার তখন বুক দুরুদুরু। ভয়ের চোটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কাওয়ার্ড—রাল্‌ফ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে।

না হে না, কাওয়ার্ড নই, বিদেশ বিভুঁইয়ে কোন প্রকার এড্‌ভেনচারে আমি নারাজ—আমার সাফ জবাব।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হব-হব। নিউ ব্রানসউইক আলোর মালায় উজ্জ্বল। আর গাছের অজস্রতায় আলো আঁধারির খেলা। আমরা এদিকে রেলপুলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। পুল পেরিয়ে সামনে এগোতেই রেল স্টেশন।

রাল্‌ফের আবার সকৌতুক জিজ্ঞাসা, কোন লাস্যময়ী মারকিনীর সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করতে তোমার আপত্তি নেই তো?

তা থাকবে কেন—আমি বীরপুরুষের ভাব দেখিয়ে বলি।

আমার কথা শেষ হল না। রেল স্টেশনের টেলিফোন বুথ থেকে ফিটফাট একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ঠিক আমাদের সামনের পথ দিয়ে, সোজা হনহন করে চলল। পেছন থেকে দেখেই টের পেলুম অসামান্য সুন্দরী। হাঁটার ধরনে যৌবন উপচে পড়ছে। আমি তন্ময়।

আমার ধরনধারণ দেখে রাল্‌ফ মুচকি হাসল। বলল—ওহে ইনডিয়ান ইয়োগী, কী ব্যাপার, চোখে তোমার কিসের নেশা?

রাল্ফের প্রশ্নে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলুম। রাল্ফ আবার বলে, জানা আছে সব সাধুপুরুষকে। আলাপ করবে নাকি মেয়েটির সঙ্গে?

দূর, আলাপ করব কেন? আর আমরা আলাপ করতে চাইলে ওই বা রাজী হবে কেন?

চাও তো আলাপ করিয়ে দি। চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি সুবিধের নয়। চল ওকে 'ফলো' করা যাক।

রাল্ফের কথাবার্তায় মনে হল, আজ সন্ধ্যায় ওর কোন একটা এ্যাডভেনচার করার মতলব।

ওদিকে মেয়েটি এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসের সামনে দাঁড়িয়ে উইনডোশপিং শুরু করেছে। রাল্ফের পরামর্শে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লুম। মেয়েটি আবার চলতে শুরু করল।

রাল্ফের নির্দেশমত আমরাও পেছন পেছন চললুম। মেয়েটি থামে তো আমরা থামি। মেয়েটি চলে তো আমরা চলি। এবার মেয়েটি ডাইনে বাঁক ঘুরল। আমরাও ঘুরলুম। বলা বাহুল্য, মেয়েটি আমাদের দেখতে পায়নি।

রাল্ফের মুখে দুষ্টুমির হাসি। বলে, মেয়েটি দারুণ খুবসুরৎ দেখছি, যেমন চাউনি, তেমনই চলন। মনে হচ্ছে ডাকলেই সাড়া দেবে।

কী করে বুঝলে?—আমি ততক্ষণে রাল্ফের অধীনে এসে গিয়েছি।

বুঝব না কেন?—রাল্ফের চটপট জবাব—এদেশের মেয়েদের নাড়ীনক্ষত্র চিনি। কে ভাল, কে খারাপ, আমরা এক ঝলকে বুঝতে পারি। দেখ, দেখ, মেয়েটা ঝুঁকে কী যেন দেখছে। আঁটো-সাঁটো পোশাকে এই রকম ঝুঁকলে যা দারুণ....

রাল্ফের উচ্ছ্বাস হঠাৎ বাধা পেল। মেয়েটি আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। রাল্ফ আর আমি একটু আড়াল করে দাঁড়ালুম। না, আমাদের দেখতে পায়নি। মেয়েটি চৌমাথা পার হয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে।

আমরাও আবার পিছু ধরলুম। রাল্ফ বললে, একটা হেস্তনেস্ত করবই।

সিনেমা হলটার সামনে মেয়েটা দাঁড়াল। ষণ্ডা চেহারার দুটি লোক ওখানে ছিল। খানিক দূর থেকে আমরা দুজনেই দেখলুম—হাসতে হাসতে কী সব কথা বলল মেয়েটি ওদের সঙ্গে। একজনের কাঁধে হাত পর্যন্ত রাখল কথা বলতে বলতে।

রাল্ফ ফিসফিস করে বলে—কী ঠিক বলেছি কি না। মেয়েটি নির্ঘাত ফ্লারটিং টাইপ।

আবার যাত্রা শুরু। মিনিট দুই পর একটা ছোট রাস্তার লাগোয়া দোতলা বাড়ির ভেতরে মেয়েটি ঢুকে পড়ল।

রাল্ফ বলল, চল! আমরাও ঢুকে পড়ি।

না-না-না, দরকার নেই—আমি প্রবল আপত্তি জানাই—বরং চল, আমার বাড়িতে ফিরি। কথা ছিল খানিকক্ষণ বেড়াবার। প্রায় এক ঘন্টা কাবার হয়ে গেল অনর্থক এই মেয়েটার পেছন পেছন।

অনর্থক কেন বলছ—রাল্ফ উত্তর দেয়—এসো না, আজ তোমাকে একটা ভালো অভিজ্ঞতা করিয়ে দিই। এদেশে এলে, আর কিছুই করলে না, তোমার দেশি বন্ধুরা পরে বলবে কি?

আমার কোন ওজর না শুনে রাল্ফ আমাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলল বাড়ির ভেতর। সামনেই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

এক একটা সিঁড়ি ভাঙছি, আর আমার বুকের ধুকপুকুনি বাড়তে শুরু করছে।—আচ্ছা রাল্ফ, সত্যি যদি মেয়েটি খারাপ না হয়। তাহলে তো ভীষণ বিপদে পড়ব।

আরে না-না, ভয় পাবার কিছু নেই। রাল্ফের উত্তরে কোন উত্তেজনা নেই।

আচ্ছা রাল্ফ, মেয়েটি কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলব?

রাল্ফ হাসে, বলে, ও। ইচ্ছেটা এতক্ষণে চাগিয়ে উঠেছে দেখছি। তা তোমার কিছু করতে হবে না। আমিই সব ম্যানেজ করব।

আমার অনবরত প্রশ্নে রাল্ফ্ খেঁকিয়ে ওঠে—চুপ করতো দেখি, আমার পকেটে ঢের ডলার আছে। অবশ্যি তার একটিও লাগবে না। মেয়েটি এমনিতেই ধরা দেবে, দেখলে না, সিনেমা হলের সামনে কী-রকম ঢলে ঢলে কথা বলছিল।

আচ্ছা রাল্ফ, মেয়েটি টাকাকড়ি চাইবে না তো, আমার কাছে কিন্তু বেশী ডলার নেই।

আমার অনবরত প্রশ্নে রাল্ফ খেঁকিয়ে ওঠে—চুপ করতো দেখি, আমার পকেটে ঢের ডলার আছে। অবশ্যি তার একটিও লাগবে না। মেয়েটি এমনিতেই ধরা দেবে, দেখলে না, সিনেমা হলের সামনে কী রকম ঢলে ঢলে কথা বলছিল।

সিঁড়ি ভাঙা শেষ। দু'জনেই দোতলায় হাজির। দোতলায় একটি মাত্রই ফ্ল্যাট। রাল্ফ দেখেছে মেয়েটি দোতলাতেই উঠেছে। আর ফ্ল্যাট যখন একটি মাত্রই তখন খোঁজাখুঁজির ঝামেলাও নেই। রাল্ফ কলিং বেল টিপতে যাচ্ছে। আমি বাধা দিলুম। ধরো, ওর মা-বাবা যদি বাড়ি থাকে। আর আমাদের দেখে তাড়িয়ে দেয়—

রাল্ফ—আমি জানি, কেউ নেই।

আমি—ধরো, যদি মেয়েটির অন্য কোন বন্ধু ভিতরে থাকে?

রাল্ফ—আমি জানি, তাও নেই।

আমি—কিন্তু, কিন্তু—

রাল্ফ—আবার কিন্তু কিসের?

আমি—না ভাই, ফিরে চল।

রাল্ফ—তা কী করে হয়? এত কাছে এসে ফিরে যাওয়া যায় না।

আমি—কিন্তু—

সর্বনাশ, আমার কিন্তুর অপেক্ষা না করে ওদিকে রাল্ফ বেল টিপে দিয়েছে।

বাজনা থেমেছে। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়—এখনই দরজা খুলে যাবে—হায় ভগবান, রাল্ফ হতভাগা আমায় কী বিপদের মধ্যেই না টেনে আনল। এখন উপায়? বরং পালিয়ে যাই...

আমার মুহূর্ত ভাবনার মাঝখানেই চিচিং ফাঁক—দরজা খুলে সেই সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব। এবং দরজার গোড়াতেই রাল্ফকে জড়িয়ে ধরে—

আমি চোখ বুঁজে ফেলি। সত্যিই তো, রাল্ফ তো ঠিকই বলেছে। বেটা পাকা জাদুকরী।

ওদিকে রাল্ফ চেঁচাচ্ছে—ছাড় ছাড়, সঙ্গে গেস্ট আছে। মেয়েটি হাত সরিয়ে থমকে দাঁড়াল। কটাক্ষ হেনে তাকাল আমার দিকে।

রাল্ফ আমাকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েটির সামনে। তারপর বললে, আলাপ করিয়ে দিই,—আমার ইনডিয়ান ফ্রেণ্ড, যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি। আর ইনি হলেন গিয়ে আমার এই ফ্ল্যাটের গৃহিণী লানা-লানা সোজ, আমার বউ।

আমি ধপ্ করে বসে পড়লুম। মাথা বন বন ঘুরছে।

সেই মেয়েটি, থুড়ি, লানা হতভম্ব। আমাদের দুজনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আমি অতি কষ্টে উঠে সোফায় বসে অস্ফুট স্বরে খাস মাতৃভাষায় বলি—হতভাগা! তোর মনে এতসব ছিল?

লানা রাল্ফের কাছে গিয়ে সবিস্ময়ে তখন প্রশ্ন করছে—ডারলিং কী ব্যাপার বলতো, তোমার গেস্ট কেন অমন করছেন, ফিটের ব্যারাম আছে নাকি?

আলোকচিত্র: কুমার রায়

৩১ পৃষ্ঠার পর

কলকাতা মহিলা পুলিশের ইতিবৃত্ত

একরাশ ফাইল আর জরুরী কাগজপত্রের মাঝখানে ডুবে থাকা পাবলিক রিলেশান ব্যুরো এবং ল'য়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার লীলা চৌধুরির টেবিলে ঘনঘন ফোন বাজছে। রিসিভার ধরে নম্র স্বরে বলতে বলতে চোখেমুখে ফুটে উঠছিল ব্যস্ততা। রিসিভার নামিয়ে স্মিত হেসে বললেন, আমার জীবনের শুরুটাই ছিল চরম নাটকীয়তায় ভরা। একটা অকাল মৃত্যু আমাদের পরিবারকে তছনছ করে দিয়েছিল। সেই ভাঙা ঘরে দাঁড়িয়েই চেষ্টা করেছিলাম নতুনভাবে এগোতে। সেইসঙ্গে দায়িত্ব ছিল অনেকগুলো অসহায় প্রাণকে বাঁচানোর।

লীলা চৌধুরি বলতে লাগলেন, আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান পুরোপুরিভাবে কারোকে মারেন না। চেষ্টা থাকলে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বাবা বলতেন, বাইবেলে লেখা আছে—পাওয়ার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি না থাকে তবে তুমি পাবেই। ইতিমধ্যে ফোন বেজে ওঠে। রিসিভার কানে তুলে বললেন, আমি এ সি উইমেন বলছি। ... বললেন ? হ্যাঁ, অবশ্যই চেষ্টা করব। আজ শনিবার কোর্টে যাওয়ার ব্যাপার নেই। আমি ডি সি ডি ডি ওয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইতিমধ্যে লীলা চৌধুরি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বেরিয়ে গেলেন এ সি ই এম ডি'র কাছে। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ফাইল নিয়ে চললেন ব্যস্ত মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার লীলা চৌধুরি। চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে, টেবিলের একধারে সারি-সারি ফাইল। নোট বুক। কখনও ছুটছেন কোর্টে। তাকে ক'টি কাজ একই সঙ্গে চালাতে হয়। পার্ক সার্কাসের বাড়ি থেকে প্রতিদিন বেরোন ন'টা নাগাদ। বাড়ি ফিরতে রোজই আটটা হয়ে যায়।

কলকাতা পুলিশে মহিলা পুলিশের আবির্ভাব ১৯৪৯ সালে। ৩২ জন মহিলা পুলিশ নিযুক্ত হয়। প্রথম মহিলা পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মীরা সরকার। মীরা সরকারের পর লীলা চৌধুরি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আর যাঁরা কলকাতা পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে পূরবী গুহ, প্রতিভা বাগচি, শেফালি ব্যাপারী, জ্যোৎস্না ঘোষ, মমতা মুখার্জি, কণিকা ব্যানার্জি, অবলা সরকার, পান্না দত্ত, শেফালি মুখার্জি প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই অবসর নিয়েছেন। ওই ৩২ জনের মধ্যে ২৩জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনসপেকটর। বাকি ৯জন ছিলেন সাব-ইনসপেকটর। ৯ জনের সকলেই স্নাতক। এখন লালবাজার মহিলা পুলিশ বাহিনীতে আছেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ৪জন ইনসপেকটর, ৩৭জন সাব-ইনসপেকটর, ৩৬জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনসপেকটর। এই বাহিনীতে কোনও কনস্টেবল নেই। তবে ৫০জনকে ট্রেনিং দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

এই লালবাজারের হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিটি ইউনিটেই মহিলারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছিলেন। ল অ্যাণ্ড অর্ডার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সার্চ, ল অ্যাণ্ড ভায়োলেশান, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, এনকোয়ারি, রিসেপশান, পি আর ও, প্রেস পুওর বক্স, মিসিং পার্সন স্কোয়াড থেকে ক্রিমিনাল রেকর্ড সেক্শান, ট্রাফিক সেক্শান—সর্বত্রই তারা রয়েছেন। ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স সেকশান, কম্পিউটার সেল, অ্যান্টি রাউণ্ডি সেক্শানেও মহিলারা যোগ্যতাগুণে জায়গা করে নিয়েছেন।

লীলা চৌধুরি তখন সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। চাকরির চেষ্টা করছেন। হঠাৎই কাগজে সাব-ইনসপেকটরের চাকরির বিজ্ঞাপন। ন'টি পদের জন্য ১০০টা দরখাস্ত পড়েছিল। ডাক পেয়েছিল ত্রিশ। লীলা দেবী ইন্টারভ্যুতে পাশ করে চাকরি পেয়ে যান। 'কলকাতা মহিলা পুলিশ বাহিনীর জন্ম থেকেই আমি রয়েছি।' তাঁর চোখে মুখে এক আত্মতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠল।

১৯৪৯ সাল। দু'বছর আগে স্বাধীন হয়েছে ভারত। দলে দলে শরণার্থী আসছে বাংলাদেশে। অভাব আর খিদের তাড়নায় অনেকেই নেমে পড়েছে পথে। শুরু হয়েছে নানারকম অপরাধ। এ ব্যাপারে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সেই সময় এই ধরনের অপরাধ ঠেকাতে মহিলা পুলিশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সে সময়ে কমিশনার ছিলেন এস এন চ্যাটার্জি। ডেপুটি পলিশ কমিশনার (হেড কোয়ার্টার্স)—এর উদ্যোগেই এই মহিলা পুলিশের আবির্ভাব।

সাধারণভাবে ফোর্সের সবাইকেই বেলা এগারোটার মধ্যে অফিসে হাজিরা দিতে হয়। ছুটি হতে হতে রাত আটটা। আগের দিন তাদের ডিউটির পজিশান জেনে নিতে হয়। তবে হঠাৎ কোন কাজের ডাক পড়তে পারে। টেলিফোনে বা ম্যাসেজে তাদের স্পেশাল ডিউটির কথা জানানো হয়। নিয়মানুযায়ী, মহিলাদের নাইট ডিউটি নেই। তবে বিশেষ কারণে নাইট ডিউটি পড়তে পারে। বাইরে যাওয়ার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে সার্চের কারণে কলকাতার বাইরে অবশ্যই যেতে হয়।

এই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে, কাকে কাকে পাঠান হবে, তা ঠিক করেন এই লীলাদেবীই। ধরা যাক, ডেকার্স লেনে ল ভায়োলেশন। ওখানে মেয়ে বিক্ষোভকারিণীও আছেন। তাদের গ্রেফতার করবেন মহিলা পুলিশেরা। এছাড়া কোন হাসপাতালে মহিলা আসামী আছে অসুস্থ অবস্থায়। তাকে সার্চ করার জন্য মহিলা পুলিশের ডাক পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভাইস-চ্যান্সেলারকে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘেরাও করেন, তখন ছাত্রীদের সরাবার দায়িত্ব মহিলা পুলিশদের। এই ধরনের কাজে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কর্মীদের নাম ও ঠিকানা কন্ট্রোলরুমে পাঠান। বাকি কাজ কন্ট্রোল রুমের। তবে তাদের ডিউটি ভাগ করে দেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা পি আর বি সেকশানের।

যেসব মহিলা ভাল চাকরি খোঁজেন, তাদের কাছে এই চাকরি লোভনীয়। মাইনে ভাল, ইউনিফরম বিনামূল্যে, রেশন সস্তা, হাউস অ্যালাউন্স রয়েছে। সেইসঙ্গে মেডিকেল আছে। সুযোগ রয়েছে প্রমোশনের। সেইসঙ্গে কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য।

লালবাজারের মহিলা পুলিশদের প্রথম দিকে শাড়ি পরার প্রথা ছিল না। ছেলেদের মত প্যান্ট শার্ট পরতে হত। কিন্তু এই পোশাক নিয়ে নানা সমালোচনা শুরু হয়। এরপরেই শাড়ি পরার ব্যাপারটা চলে আসে। মহিলা পুলিশ বাহিনীর নিজস্ব শাড়ি সরু নীল পাড়, সাদা শাড়ি। আচমকা আউটডোরে ডাক পড়লে ওই শাড়ি পরতে হয়। তবে সেটা রোজ পরতে হয় না। শুধু প্রয়োজন পড়লেই। আর হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে হোমগার্ডরা। ফোর্সের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদের প্রতিদিনের কাজের হিসেবে রোজ।

লীলাদেবী যে সময়ে পুলিশ বাহিনীতে এসেছিলেন, সে সময় অনেক ধরনের সামাজিক সংস্কার ছিল। ফলে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সমালোচনা। কেউ কেউ বলেছিলেন, বাড়ির মেয়েরা আবার পুলিশে কি করে চাকরি করবে! অনেক অস্বস্তি জয় করেই তবে এই পদে উঠে এসেছেন লীলাদেবী। প্রথম মহিলা পুলিশ-বাহিনী বলে তখন প্রত্যেকেই সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে উর্ধতনরা।

সূচনা থেকে তাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। আসলে ট্রেনিং নেবার ফলে জড়তা কেটে যায়। লীলাদেবীদের সময়ে রাইফেল ট্রেনিং ছিল না। এখন প্যারেড, পিটির সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল এবং রিভলবার ট্রেনিং নিতে হয়। তবে এখনও পর্যন্ত মেয়েদের আর্মস ব্যবহার করতে হয় না। তাছাড়া আর্মস ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। আর্মস চুরি গেলে চাকরি পর্যন্ত চলে যায়।

লীলাদেবীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শেষ নেই। বিশেষত ক্রিমিনাল কেসে তিনি নানারকমের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। ওই কাজে শুধু খারাপ ঘরের ছেলে মেয়েরাই জড়িত নেই, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও অপরাধে লিপ্ত থাকে। ক'দিন আগেই শোনা গেল, এক ভাল বংশের মেয়ে, বাড়ির চাকরের সঙ্গে প্রেম করে পালিয়ে গেছে। বাড়ির লোক এসেছে থানায় ডায়েরি করতে। এ ধরনের ঘটনায় পরিবারের প্রতি স্বভাবতই মমতা আসে।

এরকম বহু ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের চাকরি জীবনে। সব সময়ই উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য। সেই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ এবং রিস্ক। সেই চ্যালেঞ্জ আর রিস্কের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করার জন্য কলকাতা মহিলা পুলিশ বাহিনী সর্বদাই তৎপর। সেই সঙ্গে উন্মুখও।

—প্রীতি গুহ মজুমদার

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী, কুমার রায়, বিকাশ চক্রবর্তী, শঙ্কর নাগ দাস, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ব্যানার্জি

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

ঔষধ না পাওয়া–এইগুলিই রসায়ন সেবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সব চেয়ে সহজ ভাবে যে রসায়ন সেবন করা সম্ভব, বিশেষত আজকের এই হাঁস-ফাঁসানি টেনশনের যুগে–সেই রকম কয়েকটা অতি সহজ রসায়নের কথা জানাই।

১) প্রত্যূষে জলের নস্য নাকে নিলে রসায়নের কাজ হয়।

২) অশ্বগন্ধা চূর্ণ ২২ গ্রাম মাত্রায়–পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুধ দিয়ে। বায়ু প্রকৃতিতে (অর্থাৎ যাদের পেটে অতিরিক্ত গ্যাস হয়) তেল দিয়ে। বাতপৈত্তিক (পিত্তির ধাত) ধাতুতে ঘি দিয়ে বাতশ্লৈষ্মিক (অতিরিক্ত কফ) প্রকৃতিতে গরম জল দিয়ে ১৫ দিন খেতে হবে।

৩) বিড়ঙ্গের মূল চূর্ণ করে শতমূলের রস দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে ৭ দিন ৬ গ্রাম মাত্রায় ১ মাস খেতে হবে।

৪) হরিতকী বর্ষাকালে সৈন্ধব নুন দিয়ে, শরৎকালে চিনি, হেমন্তকালে শুঠের গুঁড়ো, শীতকালে পিঁপুলের গুঁড়ো, বসন্তে মধু, গ্রীষ্মে আখের গুড়ের সাথে খেতে হয়। প্রথমে ২২ গ্রাম মাত্রায় শুরু করে ২০ গ্রাম পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে।

৫) পিঁপুল–৫।৬টা থেকে ১০টা ঘি–এর সাথে খেতে হবে।

৬) আগের দিনের খাবার হজম হয়ে যাবার পর রোজ সকালে ১টা হরিতকী ভোজনের আগে, ২টি বহেড়া ভোজনের পর, ৪টি আমলকী মধু ও ঘি–এর সাথে এক বছর খেয়ে যেতে হবে।

৭) আমলকী, কালো তিল, ভৃঙ্গরাজ–এদের সমান ভাগে উপযুক্ত মাত্রায় নিয়ে বেঁটে দীর্ঘদিন খেয়ে যেতে হবে।

৮) ঠাণ্ডা জল, মধু, ঘি এদের মধ্যে একটা, দুটো, তিনটে বা সবগুলো পূর্ব বয়সে (৫০ বছরের আগে) পান করে গেলে বয়ঃস্থাপন হয়।

৯) প্রথমে অন্ন ত্যাগ করে ব্রাহ্মীরস (ব্রাহ্মী শাকের রস) সাধ্যমত পান করতে হবে। হজম হয়ে গেলে নুন ছাড়া যবের মণ্ড খেতে হবে। এই নিয়ম ৭ রাত্রি পালন করতে হবে। এটা ঐভাবে খেয়ে গেলে অশেষ উপকার পাওয়া যায়।

১০) প্রথমে ভাত না খেয়ে থানকুনির রস সহ্যমত দুধের সাথে খেতে হবে। হজম হলে যবান্ন দুধ সহযোগে বা তিল দিয়ে খেতে হবে। এটা হজম হবার পর ঘি যুক্ত অন্ন খেতে হবে। এই রকম তিন মাস করতে হবে।

১১) প্রাতঃকালে স্নান করে বেলমূলের ছাল ক্বাথ দুধ দিয়ে খেয়ে যেতে হবে।

রসায়ন সেবনের ফল যে কি তা সুন্দর করে বলে গেছেন ভাবপ্রকাশ–

'গতং স দেবর্ষিনিষেবিতং শুভং প্রপদ্যতে ব্রহ্ম তথৈব'–

অর্থাৎ যিনি বিবিধ রসায়ন সেবন করেন তিনি যে কেবল দীর্ঘায়ু লাভ করেন তাই নয়, পরিণামে দেবতা ও ঋষিদের জন্য অক্ষয় ব্রহ্মপদকেও লাভ করেন।

এইবার বাজীকরণ ব্যাপারটা কি জানতে হবে।

যদদ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাজিরেৎ সুরতক্ষমম্।
তদ্বাহীকরণমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষহাৎ বরৈঃ।।

অর্থাৎ যে দ্রব্য পান করলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় যৌন পারদর্শী হয় সেইটেই হল বাজীকরণ। ক্লীবতা অর্থাৎ শিথিলতা উপস্থিত হলেও বাজীকরণ ঔষধি খেতে হবে। ঐ যে ক্লীবতার কথা বললাম ওটা সমস্ত রকমের হতে পারে। তার মধ্যে দু'রকম অর্থাৎ 'সহন ক্লৈব্য' অর্থাৎ জন্ম থেকেই যে ক্লীবতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, আর বীর্য্যবাহিনী শিরা যার ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তারা ছাড়া আর এক রকমের ক্লীব ঔষধের প্রভাবে সেরে উঠবে নিশ্চয়ই। তবে যে দুটো অসাধ্য ক্লীব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে অসাধ্য বলা হলেও আজকের শল্য চিকিৎসার দৌলতে অঘটন যেভাবে ঘটতে চলেছে তাতে যে কি হতে পারে তা বলা খুব মুশকিল।

ওই পাঁচ রকমের ক্লীব যাঁরা তাঁদের কিন্তু 'নিদান পরিবর্জন'। অর্থাৎ রোগের কারণটাকে আগে হটাতে হবে। মানুষ মাত্রেরই ১৬ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বাজীকরণ ঔষধ খাওয়া উচিত। সাধারণত ঘি, দুধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার পরিমিত মাত্রায় খেলেও বাজীকরণের কাজ হয়। কিন্তু এই তিন দ্রব্য তো আজকের সামাজিক অবস্থায় ত্র্যহস্পর্শ। শতকরা ৫ জন ভাগ্যবান মাত্র ওই সুযোগ পেতে পারেন। এ অবস্থা যে একদিন আসবে এটা বুঝেছিলেন আয়ুর্বেদের ঋষিরা। তাই তারা যে সকল জিনিস মধুর রসযুক্ত স্নিগ্ধ পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিদায়ক সেইগুলিকেও বৃষ বা বাজীকরণ দ্রব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। আর সুন্দরী, প্রিয়তমা, অনুরক্তা আর যৌবনমদে মত্তা নারীই হল বাজীকরণের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান উপাদান। আয়ুর্বেদে বলাও হয়েছে–

ভোজনানি বিচিত্রানি পানানি বিবিধানি চ।
পীতং শোত্রাভিরামাশ্চ বাচঃ স্পর্শমুখাস্তথা।।
কামিনী সাম্প্রতিলকা কামিনী নবযৌবনা।
গীতং স্রোতমনোজ্ঞণ্বত তাম্বুলং মদিরাস্রজঃ।।
গন্ধ্যা মনোজ্ঞ রূপানি চিত্রান্য পবনানি চ।
মনগশ্চা প্রতীঘাতং বাজী কুর্বন্তি মানবম্।।

যাই হোক, অতি সাধারণ এবং সহজলভ্য কিছু বাজীকরণ যোগ জানিয়ে দিই, যাতে সাধারণ মানুষের কাজে আসে। একটা কথা মনে রাখতে হবে–অত্যন্ত গরম, বেশি তেতো, কষাটে টক কিংবা অধিক লবন খেলে বীর্য হানি হয়–কাজেই বাজীকরণ যোগ সেবন মানে ঐ দ্রব্য অধিক পরিমাণে খাওয়া চলবে না।

১) মাসকলাই ঘিতে ভেজে–দুধে সিদ্ধ করে চিনি মিশিয়ে খেলে রতিশক্তি বাড়ে।

২) শতমূল ২০ গ্রাম, দুধ ২৫০ গ্রাম, জল ১ কিলো, একসঙ্গে সিদ্ধ হবে। জল ফুটে মরে গেলে ছেঁকে ঐ দুধটা খেতে হবে। (শতমূল বাজারে কিনতে পাওয়া যায়)।

৩) ছোট শিমূলের মূল আর তালমূলী একসঙ্গে চূর্ণ করে ঘি ও দুধের সাথে খেলে উপকার হবে।

৪) ভুঁই কুমড়ার মূল চূর্ণ–ঘি, দুধ বা যজ্ঞ ডুমুরের রসের সাথে খেলে অপূর্ব সামর্থ্য আসে।

৫) আমলকী চূর্ণ-আমলীকর রসে ভাবনা ১২৫ গ্রাম দুধ খেলে বীর্য বৃদ্ধি হয়।

৬) ভূমি কুষ্মাণ্ডের অর্থাৎ কুমড়োর চূর্ণ-দিয়ে (৭ বার) ঘি, আর মধুর সাথে খেতে হবে। পরে ভূমি কুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়ে ঘি আর মধুর সাথে খেতে হবে।

৭) ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল ও যজ্ঞডুমুর একসঙ্গে পিষে ঘি ও দুধের সাথে খেলে খুব উপকার হবে।

৮) আমলকীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ-চূর্ণ মধু, চিনি ও হাত সওয়া গরম দুধের সাথে খেলে শুক্রক্ষয় বন্ধ হয়।

৯) শতমূল ও কুচমূল চূর্ণ অথবা কেবল কুচমূল চূর্ণ দুধের সাথে খেলে উপকার হবে।

১০) যষ্টিমধু ও চূর্ণ ৫ গ্রাম মত ঘি, আর মধুর সাথে খেলে বীর্য বৃদ্ধি হয়।

১১) সরপুঁটি মাছ ঘি-তে ভেজে প্রত্যহ খেতে হবে।

১২) ছাগলের অণ্ডকোষদ্বয় অল্প পিঁপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব নুনের সাথে গাওয়া ঘি-তে ভেজে খেলে উপকার হয়।

১৩) পুরান শিমূল গাছের মূলের রস সমপরিমাণ চিনির সাথে খেলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

১৪) আলকুশীবীজ ও কুলেখাড়া বীজ চূর্ণ করে মধু ও চিনির সাথে মিশিয়ে কবোষ্ণ দুধের সাথে খেতে হবে।

১৫) ছাগলের অণ্ডকোষ দুধে সিদ্ধ করে-সেই দুধ তিল ভাবনা (৭ বার) দিয়ে খেলে উপকার হবে।

১৬) কৃষ্ণ তুলসীর শিকড় পানের সাথে খেলে শুক্রস্তম্ভন হয়।

১৭) চড়ুই পাখির ডিম মাখনের সাথে পেষণ করে পা দ্বয় প্রলিপ্ত করিলেও শুক্রস্তম্ভন হয়।

১৮) আলকুশীর বীজ সুক্ষ্ম চূর্ণ করে দুধ আর চিনি মিশিয়ে রোজ খেলে উপকার হবে।

১৯) শুধু শতমুখ চূর্ণ ১০ গ্রাম, চিনি ১০ গ্রাম ও দুধের সর ২০ গ্রাম খেলে খুব উপকার হবে।

২০) শিরীষের বীজ ১ ভাগ, ২ ভাগ মিছরি ১ গ্রাম দুধের সাথে খেলে বীর্য ঘন হয়।

সার্থক ফলপ্রদ ঔষধ আয়ুর্বেদের ঋষিরা যা জানিয়ে গেছেন, তা যদি নিখুঁতভাবে তৈরি করে প্রয়োগ করা হয় তো ব্যর্থ হতে হবে না। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে শরীরের অবস্থার উপর। যার লিভার খারাপ, পেটের দোষ আছে, কিছু হজম হয় না এই অবস্থায় বাজীকরণ করতে গিয়ে যদি ঘি দুধ বেশ করে খাওয়া হয় তো বাজীকরণ নয়, একবারে বাজীতে (ঘোড়ায়) চেপে সশরীরে ইন্দ্রলোকে চলে যেতে হবে। তাই শরীর বুঝে–নিজের প্রকৃতি বুঝে দরকার মত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চললে ফল পাওয়া যাবেই।

এই ব্যাপারে আরও একটু সাবধান হতে হবে। কারণ এর লোভে তরুণ থেকে বুড়ো প্রায় সকলেই দৌড়চ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার এসেছিলেন সেই বড় কোম্পানির একজিকিউটিভ মহাশয়। এসেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আমার স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ বশীভূত। আমাকে ছেড়ে নড়তেই চায় না।' ভদ্রলোকের মুখে লাজুক হাসি। তার রোগ সেরে গেছে। আর তা কবিরাজির কৃপায়।

শ্রী দেবী

বোম্বাই মার্কা প্রেম : স্রেফ কেরিয়ারের জন্য ?

বম্বের ফিল্মী মহল্লায় শিল্পকর্মের বাইরে বেশকিছু রঙীন শিল্প-কেরামতি চলছে। বিবাহিতা স্টাররা উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপন করছেন পরপুরুষের সাথে। পুরুষরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কেন এই প্রেম প্রেম খেলা ? সেকি শুধু শরীর-বিলাস ? না কেরিয়ার গড়ার কায়দা ? বিচিত্র বোম্বাই - এর গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড থেকে অনেক অজানা কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অভিমণ্যু গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে মীনাকুমারী বা মধুবালার নাম কে-না জানে। এইসব নায়িকারা কিন্তু হাল আমলের তরতাজা নায়িকাদের মত নয়, দেহ কিংবা সেক্স-আপীল এদের মূলধন নয়, বরং আলাদা এক প্রতিভা ছিল এইসব অভিনেত্রী-দের মধ্যে লুকিয়ে। সুসময়ে তার প্রকাশ, ওদের যথার্থ আসনটি চিনিয়ে দিয়েছিল। মীনাকুমারীরা কোনদিনই বিস্মৃতির অতলে ডুববেন না। যুগ যুগ ধরে তাদের নাম মানুষ মনে রাখবেন। তাদের অভিনয় ছিল গভীরতায় ভরা, প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে কিরকম অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারতেন। সিনেমার পর্দায় প্রাণবন্ত, একাত্ম। এইসব নায়িকা-দের ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু রীতিমত জমজমাট। সংঘাত আর উত্তেজনায় টগবগ করত তাদের জীবন যাপন। যে ক'জন পুরুষ তাদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও তাদের উষ্ণ আবেগ, দুরন্ত কামনায় অস্থির হয়ে উঠতেন। কি বিপজ্জনক ভাবেই না কাটত তাদের দিনগুলো।

রেখা

আপনার সঙ্গে আজ মা দূর্গাও
দশ হাতে এঁটে উঠবে

SAA/MP/24

না সন্দেহ!

আজ আপনাকে কত বাড়তি কাজই না করতে হয়। সকালে কুকুরটাকে নিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসা, ছেলেমেয়েদের স্কুল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, কর্তার ব্রিফকেস গুছিয়ে নিজেও অফিসের জন্যে তৈরী হওয়া.... দিনভোর ব্যস্ততার পরও রেহাই নেই—ঘরদোর গোছানো, অতিথি আপ্যায়ন, হরেক রকমের রান্নাবান্না, ক্যালরি-কোলস্টরেলের হিসেব রাখা, সেলাই-বোনাই, শিশুপালন, ব্যাংকে ছোটা, টেলিফোনের বিল জমা দেওয়া, দোকানপাট সারা—আরও কত কি! আজ আপনার সঙ্গে মা দূর্গাও এঁটে উঠবেন কিনা সন্দেহ!

আপনার ভাবনা চিন্তা জিজ্ঞাসা ও স্বপ্নের খোরাক যোগাতে ব্যক্তিত্ববিকাশী ও প্রয়োজনভিত্তিক পত্রিকা মনোরমার আত্মপ্রকাশ। প্রিয় লেখকের লেখা ও বিশেষজ্ঞের মতামতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে মনোরমা আজকের নারীর পরিপূর্ণতার প্রতীক। ৬২ বছরের হিন্দি মনোরমার উত্তরাধিকারী মিত্র প্রকাশনের বাংলা মনোরমা আপনাকে একবিংশ শতকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

দামঃ ৫ টাকা

মনোরমা

মহিলাদের একমাত্র সম্পূর্ণ পত্রিকা

মিত্র প্রকাশনের নিবেদন

আজকের দিনে রেখা, শ্রীদেবী কিংবা রাখীর বেলায়ও তাই। এরা সিনেমার পর্দায় সত্যিই জাদুকরী হয়ে ওঠেন। নিখুঁত অভিনয় আর সহজাত ক্ষমতার গুণে প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে নিপুণভাবে মিশে যেতে পারেন। বলতে বাধা নেই, এরাও কিন্তু আবেগ নির্ভর হয়ে জীবন যাপন করেন। যুক্তির চেয়ে আবেগই এদের জীবনের মূলমন্ত্র। কোন সংস্কার এদের ধাতে সয় না। যা ভালো লাগে তাই চেখে দেখতে কোন আপত্তি নেই। অথচ এরা যখন পর্দায় কোন চরিত্রকে ফোটান তখন কি এক আশ্চর্য ম্যাজিক ঘটে যায়। কিন্তু যখন চার দেওয়ালের মধ্যে, নিজের ঘরে বসে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তখন কোথায় থাকে যুক্তি কিংবা কোথায় সেই মাপা চলাফেরা। জীবন যেন তখন বিশৃংখল এক নৌকো। গন্তব্য কোথায় তা বোঝাও বড় মুশকিল।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, এই বিশৃংখল বেহিসেবি জীবন যাপনের মানেটা কি? এ কি শুধু আবেগের প্রশমন বা আবিষ্কারের আকাশকে খুঁজে বেড়ানো? রাখী তো প্রায় অর্ধেক জীবন জুড়ে বহু প্রেমিক বদল করে এক পাকাপোক্ত নিরাপত্তা খুঁজে বেড়িয়েছেন। রেখা খুঁজেছেন সত্যি-কারের পুরুষদের। কখনও অমিতাভ কখনো আবার সঞ্জয় দত্তের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে পেতে চেয়েছেন আবিষ্কারের আনন্দ। স্মিতার বেলায়ও ছিল তাই। তবে স্মিতা বারবার পোশাক বদলানোর মত প্রেমিক বদলাবার পাশাপাশি নিজের জীবনকে আরো জোরে দুরন্ত ঘোড়ার মত ছুটিয়েছিলেন শুরু থেকেই। এই বহু পুরুষ সান্নিধ্য কিন্তু প্রত্যেককেই অনেক পরিণত করেছে, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সিরিয়াস করে তুলেছে।

এই উষ্ণ জীবনযাপন কিন্তু এদের জীবনে কখনও সুখ, কখনও বেদনা দিয়েছে। কখনও সুরের শেষ সীমায় এরা পৌঁছেছেন, আবার কখনো যন্ত্রণায় হয়ে পড়েছেন কাতর। আসলে এই ধরনের জীবন যাপন সব সময়ই উত্তেজনায় ভরা। টেনশান, রাগ কিংবা সেন্টিমেন্টে পেণ্ডুলামের কাঁটার মত দুলে উঠেছে জীবন। এইসব কারণেই তারা তাদের অভিনয়ে অনেক বাড়তি ক্ষমতা পেয়েছেন। জীবনের এই টানাপোড়েন থেকে জন্ম নিয়েছে দক্ষ অভিনয়। আসলে বিশৃংখলভাবে বাঁচার মধ্য থেকেই রাখী কিংবা রেখা, স্মিতারা ভালো কিছুর খোঁজ পেয়ে যান। আর পাঁচটা মানুষের মত এরা আইনমাফিক সাদাসিধেভাবে বাঁচতে পারেন না বলেই বোধহয় এরা অভিনয়ের জগতে এমন নামী আর বিশিষ্ট। আবেগ দিয়ে জীবনকে বোঝবার জন্য ক্ষমতা এক আলাদা শক্তি, তাই জীবন এখানে অন্যরকম।

রাখী তো একবার বলেওছিলেন যে, তিনি যাঁকে ভালোবাসেন, তাঁকে গভীরভাবে পেতে চান। আবার যাকে ঘৃণা করেন তার মুখই দেখতে চান না। প্রত্যেকটি নতুন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের শেষে তিনি আবিষ্কার করেন একেকটি নতুন দিক, যা শুধুমাত্র আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দ্রুত ছড়িয়ে যায় সমস্ত চিন্তা ভাবনায়। আরেকজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির সূচনায় এটা একটা অভিজ্ঞতা। পুরুষ সম্পর্কে যাবতীয় ধারণাগুলিও তাই ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসতে থাকে।

ফ্রান্সের এক নামী অভিনেত্রী জাঁ মোরে একটা দারুণ কথা বলেছিলেন। তিনি তার পুরুষ বন্ধুদের বলেছিলেন যে, তাঁর খুবই ইচ্ছে যে তিনি একটা ঘর বানাবেন, যে ঘরে তাঁর সমস্ত প্রেমিকরা একসঙ্গে হাজির থাকবে। ব্যাপারটা হলে হত খুবই মজার, কিন্তু জাঁ মোরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত

স্মিতা পাতিল

জীনাত আমন

হয় নি। তবে এটা বারবার স্বীকার করতেই হবে যে কি অসম্ভব আবেগ আর প্রেম ছিল তাঁর মনের গভীরে।

শিল্পীদের পৃথিবীটাই অন্যরকম। সেখানে কোনও মধ্যবিত্ত মানসিকতা নেই, আইনের অহরহ চোখ রাঙানি নেই। শিল্পীরা নিজেরাই যেন এক একটা আইন। এরা নিজেরাই নিজেদের নীতি-নৈতিকতা তৈরি করেন। সেইসঙ্গে নিজেদের তৈরি করা মূল্যবোধ হয়ে ওঠে সব সময়ের সঙ্গী। রাখীর ব্যাপারটাই ধরা যাক। তিনি তো সব সময়ই নিজেকে একাকী মনে করেন। কারণ রাখীর পুরুষ সঙ্গীরা নাকি কিছুতেই তার মনের নাগাল পান না। অথচ তিনি তার মনের কথা কাউকে বলতে চান। সুপ্ত কথাগুলি তার মনের গভীরে তোলপাড় শুরু করে দেয়। তাই মনকে শান্ত করার

শাবানা আজমী

জন্য রাখী সব সময়ই একজন মনের মত পুরুষ খুঁজে চলেছেন। এই সব সাহসী নায়িকারা অবশ্যই এই বিশৃংখল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে অনেকদূর পৌঁছতে পারবেন। তুলনায় রক্ষণশীল নায়িকারা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে সত্যিকারের শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ শিল্পীরা অবশ্যই সাড়া জাগাতে পারবেন।

কিন্তু সব উচ্ছৃংখল নায়িকারাই যে জগত তোলপাড় করবেন—এমনটি ঠিক নয়। মহেশ ভাটের মতে, তাহলে শহরের সব উচ্ছৃংখল মেয়েরাই দারুণ নায়িকা হতো। এমন কি উদ্দাম জীনাতকেও কেউ বড় দরের নায়িকা বলবেন না। সেদিক থেকে সারিকাকে একজন মাঝারি মাপের অভিনেত্রী বলা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সারিকা বড় মাপের অভিনেত্রী হতে পারেনি।

আবার একদল অভিনেত্রী আছেন যারা খুব ভালো টাকা রোজগার করতে পারেন। এরা পরিচালক-প্রযোজকদের মর্জি মাফিক কাজও করে থাকেন। এরা খুবই প্রফেশনাল, তবে কেউই যথার্থ শিল্পী বলতে যা বোঝায়, তা নন। এদের কাছে একটাই কথা, যতক্ষণ গ্ল্যামার আছে ততক্ষণ সব। গ্ল্যামার ফুরোলে সব কিছু শেষ। এই বিরাট প্রতিযোগিতাতে এক সেকেণ্ড থামবার সুযোগ নেই। থামলেই তো হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। এরা নিতান্তই সাদামাঠা অভিনেত্রী। ওরা নিজেরাও এই চরম সত্যটা জানেন। কিন্তু স্মিতা কিংবা

রাখী

শাবানার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা হঠাৎই অভিনয়ে এসেছেন। অভিনয়কে আবেগ দিয়ে ভালোবেসেছেন। তাই এই ধরনের অভিনয় আর সকলের থেকে আলাদা।

'তেরে শহর মে' ছবির এক শুটিংয়ে স্মিতা একজন বারবনিতার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। ছবির পরিচালক সাগর সারহাদি। একটি দৃশ্যে ছিল যে, কুলভূষণ খারবান্দা স্মিতাকে মারছেন। কুলভূষণ অবশ্য স্মিতাকে মারতে চান নি। প্রথমে সতর্ক করে, পরে ধাক্কা মেরে দেয়ালে ঠেলে দেন তিনি। কিন্তু ধাক্কাটা একটু জোরেই হয়ে গেছিল। স্মিতা রেগে কুলভূষণকে পা-ই চালিয়ে দিলেন। শেষে ক্রুদ্ধ স্মিতাকে সামলাতে ছুটে এলেন সকলে। কিন্তু তাঁকে সামলানো কি চাট্টিখানি কথা? এটা নিয়ে বেশ শোরগোলও হয়েছিল। এর পরে গোটা ফিল্মি দুনিয়ায় গুজব উঠেছিল যে, রাজ বব্বর স্মিতাকে প্রায়ই মারধোর করেন। সেদিন ওই রাগারাগি তারই একটা নমুনামাত্র। ওই সিনেমায় স্মিতার অভিনয় অবশ্য খুবই ভালো হয়েছিল কারণ স্মিতার ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতাই অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

আরেক পরিচালক রমেশ তলোয়ার রাখীর অভিনয় নিয়ে একই কথা বলেছিলেন। বাস্তব জীবন থেকে নিয়ে নেওয়া অভিজ্ঞতা রাখীকে অনেক পরিণত করেছিল। তলোয়ার অবশ্য রাখী-কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মেশার সুযোগও হয়েছে। একসময় তলোয়ারের সঙ্গে রাখীকে জড়িয়ে গুজবও শোনা গিয়েছিল। রমেশ পরে স্বীকারও করেছিলেন। তবে এরই সঙ্গে তলোয়ার বুঝতে পেরেছেন রাখী যে অভিনয় করেন, তার অনেকটাই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। তুলনায় শাবানা খুবই বুদ্ধিমতী। সব কিছু চট্ করে বুঝে ফেলেন। চোখের ইশারায় শাবানা বুঝে ফেলেন কি করা উচিত। কিন্তু রাখীর ব্যাপারটাই আলাদা। তিনি যা করেন তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই করে থাকেন। কোন অবস্থাতেই আবেগ ঝেড়ে মুছে হঠাৎ করে চনমনে হয়ে ওঠা রাখীর সাজে না। এ কারণে গুলজারের স্ত্রী হয়েও তিনি স্বতন্ত্র, একটু অন্য জাতের।

রেখার অভিনয়ের ব্যাপারটা আবার অন্য রকম। সম্প্রতি তিনি অনেকটাই পাল্টেছেন। কারণ মানসিকভাবে রেখা বেশ পরিণত। সেইসঙ্গে যতদিন বাড়ছে ততই তার অভিজ্ঞতা বাড়ছে। ফলে আগে তার যে অভিনয়ের ঘাটতি ছিল, তা ইতিমধ্যেই পূরণ হয়েছে। একজন পরিপূর্ণ নারী হবার পর অবশ্যই রেখা এখন অনেকটাই উঁচুদরের শিল্পী। অথচ পুনম্ ধীলন কিংবা রঞ্জিতা কম দিন এ লাইনে আছেন, তা নয়। ওরা কেউই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি, কারণ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ওদের নেই। এইসব অভিনেত্রীরা আগামী দিনে কেউই বোধহয় দর্শকদের মধ্যে অনুরণন তুলবেন না।

আসলে পেশাদারি নায়িকা কিংবা অভিনেত্রীরা সব সময়ই এক ধরনের ভয়ার্ত মানসিকতায় ভোগেন। সেটা পেশাগত ভয়। সেইসঙ্গে মনের দুর্বলতাকে চাপা দেবার জন্য প্রায়শই নানা অজুহাত খুঁজতে থাকেন। অথচ এদের এই পেশাগত আতঙ্ক নিতান্তই হাস্যকর। কেউ যদি ঠিকঠাক কাজ করেন, তবে কাউকে ভয় পাবার কি আছে? তবু ওদের ভয় কিংবা আতংক কমতে চায় না। একজন অভিনেত্রী মদ খেতে পারেন কিন্তু তিনি যখন তার কাজটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যান তখন কারোরই কিছু বলার থাকে না।

নায়িকাদের মধ্যে আবার নানা ধরনের ব্যাপার থাকে। যেমন কিছুদিন আগে পদ্মিনী কোলাপুরি প্রায়ই বলতেন, আমি একজন কুমারী। ব্যাপারটা হাস্যকর, কারণ চিম্পু কাপুরের সঙ্গে পদ্মিনীর একটা অ্যাফেয়ার ছিলই। সেই সূত্রে তাকে কি আর তেমনভাবে কুমারী বলা যায়? আবার পুনম ধীলন তো স্মিতা পাতিলকে একচোট নিয়েছিলেন। স্মিতার অপরাধ তিনি একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অথচ মজার ব্যাপার, পুনম নিজেই বিবাহিত ও বয়সে অনেক বড় রাজ সিপ্পির সঙ্গে লটঘট পাকিয়ে ফেলেছিলেন। আর সে ব্যাপারে পুনম একবারও লজ্জিত হন নি, বরং প্রকাশ্যে সিপ্পির সঙ্গে ঘুরেও বেড়িয়েছেন।

তবে জীবনে যদি বিশৃংখলতা কিংবা উদ্দামতা নাই থাকল তবে তো সেটা একজন সাধারণ মহিলার নিতান্তই আটপৌরে জীবনের মত হয়ে গেল। যারা নিয়ম ভাঙতে জানে না, জানে না ঝুঁকি কিভাবে নিতে হয় তাদের একেবারে বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন, সব কিছুই রুটিন মাফিক। যে সমস্ত সাধারণ অভিনেত্রী রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই নিতে পারেন না—এরা যখন অভিনয় করেন তখন হয়তো প্রফেশনালের মত ভাল কাজ দেখান কিন্তু অভিনয়ে যে একটা নিজস্বতা থাকে—সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটু পেছনের দিকে তাকালে মীনাকুমারীর অভিজ্ঞতার কথাগুলো জানা যায়। এটা তো স্বীকার করতেই হবে মীনাকুমারী সেরা অভিনেত্রী ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বড় ছিলেন একাকী। রাখীর ব্যাপারটিও তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন তাদের নিয়ে মাতামাতি করছে তখন তারা একাকীত্বের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন। আসলে যে কোন সৃজনশীল ব্যক্তিই সাধারণভাবে ভীষণ একা। হয়তো খুব কম সময়েই তাদের বোঝা সম্ভব। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক এলেও একটা ফাঁক থেকেই যায়। কখনও বা এই সম্পর্ক শুধুই তিক্ততা নিয়ে আসে। অথচ একজন মনের মতো সঙ্গী পাবার জন্য তারা কি কম উৎসুক? অবশ্যই তা হবে মানসিক বন্ধুত্ব। তবে এ ধরনের মানুষেরা প্রত্যাখ্যান কিংবা অন্যান্য আশংকায় প্রায়শই ভোগেন। আর এইসব ঘটনা তাদের নতুন পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে বাধ্য করে।

'মনক মডুচু' তে অভিনয় করা ছাড়াও শ্রীদেবীকে স্টারের সম্মান দিয়েছিল যে ফিল্মটি, তার নাম হলো, 'নিশানা' (তেলেগু)। তারপর একে একে হিন্দিতেই তিনি অনেক ছবির শীর্ষনায়িকা। শুধু জিতেন্দ্রর সঙ্গেই নয়, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, নতুন অভিনেতা সানি দেওল (সুলতানত), জ্যাকি শ্রফ (কর্মা), অনিল কাপুর (মিঃ ইন্ডিয়া), মিঠুন চক্রবর্তী (জাগ উঠা ইনসান

ও অন্যান্য ফিল্ম)—র সঙ্গেও অভিনয় করার পর মোহময়ী চোখ নাচিয়ে হয়ত আমাদের এখন প্রশ্ন করে উঠবেন, 'কি আর কোনও তারকা বাকি রয়ে গেল নাকি ?' তার অভিনেত্রী জীবনের চার বছরের মধ্যেই 'ধরম অধিকারী'তে দিলীপ কুমারের সঙ্গে অভিনয় করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনি। অথচ শর্মিলা ঠাকুর, রাখী ও রেখার ভাগ্যে এই সৌভাগ্য মিলেছিল বেশ দেরিতে। এখন তো তার এমন অবস্থা যে পছন্দসই ভূমিকা ছাড়া তিনি অভিনয় করতেই রাজি হন না। ঠিক এই কারণেই দেব আনন্দের অফার তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন, এমন কি রাজ কাপুরকেও 'খোলামেলা ড্রেস আর পরব না' এরকম একটা তুচ্ছ অজুহাতে বিমুখ করেছেন।

ঘর সংসারের কথাবার্তা প্রসঙ্গে শ্রীদেবী বললেন, 'আমার জন্ম মাদ্রাজে। বাবা একজন নামকরা অ্যাডভোকেট। আমার জন্মের দু'বছর পর লতা, মানে আমার বোনের জন্ম হয়। আমরা শুধু দু'বোন হওয়ায় বাড়িতে আদরের কোন কমতি ছিল না। অবশ্য আমি ছোটবেলা থেকেই খব লাজুক, ইন্ট্রোভার্ট ধরনের মেয়ে ছিলাম। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে, মায়ের পেছনে গিয়ে মুখ লুকোতাম। একটু বড় হওয়ার পর কেউ এলেই অন্য ঘরে পালিয়ে যেতাম। পাঁচবছর বয়সেই 'থুনৈবন'—এ অভিনয় করলাম। বাবা চেয়েছিলেন, আমি বড় হয়ে অ্যাডভোকেট হবো, তবু 'থুনৈবন'—এ অভিনয় করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন আপত্তি তোলেন নি।

শ্রীদেবী হলেন সিলওয়েস্টর স্টালোন, এম. জি. আর ও বৈজয়ন্তীমালার ফ্যান। 'স্টালোন-কে আপনি আমার 'স্বপ্ন—পুরুষ' ও বলতে পারেন। ওঁর 'রকি'—র তিনটি খণ্ডই আমি অজস্রবার দেখেছি, তবু মন ভরেনি। এখনও যখন আমার হাতে কোন কাজ থাকে না, একঘেয়ে লাগে, তখন আমি বসে বসে স্টালোনের ফিল্ম দেখতে ভালোবাসি। এম.জি. আর ও বৈজয়ন্তীমালার ফ্যান তো আমি ছেলেবেলা থেকেই।'

একবার এক সাংবাদিক বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করায় শ্রীদেবী চমকে দিয়ে বললেন, 'আমি তো সিলওয়েস্টর স্টালোনকেই বিয়ে করতে চাইব, আমি ওঁর চতুর্থ, পঞ্চম অথবা দশম স্ত্রী হিসেবে অন্তত একদিনের জন্য হলেও ওঁকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। আমি ওঁকে স্বপ্নেও দেখেছি।'

মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্রীদেবীর রোমান্সের পেছনের ঘটনা বোধহয় মিঠুনের স্টালোনের মত চেহারা, ম্যানরিজম্, ও ধরনধারণ। এক্ষেত্রে শ্রীদেবী সুরাইয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ, যিনি গ্রেগরী পেকের মত চেহারা ও ধরনধারণের জন্যই দেব আনন্দের প্রচণ্ড ফ্যান ছিলেন।

যখন একজন নায়ক কোন নায়িকার সঙ্গে সিনেমায় কাজ করেন তখন তাঁরা নিজেদের কাজে বেশি করে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সিনেমার টেকনিক কিংবা থীম নিয়ে পরস্পর আলোচনা করেন। ভাবের আদানপ্রদানও চলে। তাঁদের একাত্মতা কিংবা কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা থেকে জন্ম নেয়ে এক একটা ভালো ছবি। এই কারণেই তারা

অবিস্মরণীয়া মীনাকুমারী

চরিত্রের সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েন। তারপর সিনেমার শুটিং শেষ হবার পর সবাই আবার আলাদা হয়ে যান। যে সূক্ষ্ম তারে তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তা ছিঁড়ে যায়, কেটে যায় সুন্দর বোঝাপড়ার তালটি। তখন অবশ্য নায়ক—নায়িকা বা পরিচালকদের মনের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। হয়তো বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। কিন্তু যারা খুব ঘনিষ্ঠ তারা একটু আধটু বুঝতে পারেন। সুতরাং এই একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে শুরু হয় নতুন সম্পর্ক, নতুন মানুষের জন্য ফের খোঁজাখুঁজি। আবার তৈরি হয় সম্পর্ক।

মেয়েদের পক্ষে একাকীত্ব ভীষণ কণ্টকর। একজন নায়িকা সারাদিন লাগাতার পরিশ্রম করে যখন বাড়ি ফিরে এসে আয়নায় মুখ দেখেন, ঠিক তখন তিনি ওই ক্লান্ত মুখ দেখে চমকে ওঠেন। কারণ আয়নায় তার নিঃসঙ্গ মুখের অন্যরকম প্রতিচ্ছবি। চারদিকে দেয়ালেরা যেন বিদ্রুপ করছে —বড় একা, নিঃসঙ্গ সে জীবন। শুধু নির্ভরতা খুঁজে বেড়ানো। শুধু নানা পুরুষের সঙ্গ থেকে স্বস্তি, নির্ভরতার, উষ্ণতার সন্ধান।

নায়িকাদের এই একটু উষ্ণতার জন্য ছোটাছুটি তাদের উজ্জীবিত রাখে। তবে শিল্পীরা কেউই যন্ত্র নন। তাদের সুখবোধ আছে, পিপাসা আছে, চাহিদাও বিরাট। একজন নিখুঁত শিল্পী সব সময়ই নিয়ম ভেঙে কাজ করেন। আবার কোন কোন শিল্পী আছেন তারা কেবল বাইরের চটক দেখাতে ভালোবাসেন। এরা যে আসল শিল্পী নন, এটা অনেকেই বুঝতে পারবেন। এইসব বাইরে চটকদারদের জন্যে অবশ্য একটা উপকার হয়েছে, তা হলো আসলকে চেনা, সত্যিকারের নায়িকাদের বুঝতে পারা। তাদের আভিজাত্য, আবেগ, অভিমানে চিনে নিতে হয়। সেইসঙ্গে সুস্থির জীবনকে এইসব শিল্পীরা আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেন। যেন এই আঘাত থেকে তারা পরম সন্তোষ পান। তাদের এই আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই যেন সব থেকে বড় পাওয়া। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা যেতে পারে। একজন রাজার হঠাৎ খুব শখ হয়েছিল একটা দারুণ বাগান তৈরি করবেন। অতএব নামী মালীকে ডাকা হল। রাজা তাঁর ইচ্ছের কথা জানালেন। শুরু হল বাগানের কাজ শেখা। একসময় রাজা নিজে চমৎকার একটা বাগান তৈরি করলেন। পৃথিবীর সবাই খুব প্রশংসা করতে লাগল। রাজা তখন জানালেন এটা তাঁর কীর্তি নয়। তিনি একজন ভালো মালীর কাছ থেকে শিখেছেন। ডেকে আনা হল মালীকে। মালীকে রাজা বললেন, 'এত সুন্দর বাগান তুমি কি দেখেছ ?'

—'না। এটা খুব ভালো বাগান হয় নি। কারণ মৃত পাতাদের তো দেখতে পাচ্ছি না। মৃত পাতা না থাকলে বাগান কখনোই সম্পূর্ণ হয় না।'

হয়তো মালীটির কথাই ঠিক। জীবনের বাগানেও এরকম মৃতপাতার মত ক্ষত বিক্ষত হৃদয়, দুঃখ যন্ত্রণা না থাকলে জীবন কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। কি যেন বাকি থেকে যায়! কোথায় যেন ফাঁক রয়ে যায়। আর সেটাই হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য জীবন।

ছবি : দুর্গাপ্রসাদ, রাজু উপাধ্যায়, হরিওম পলিআল, প্রদীপ এন রাজ
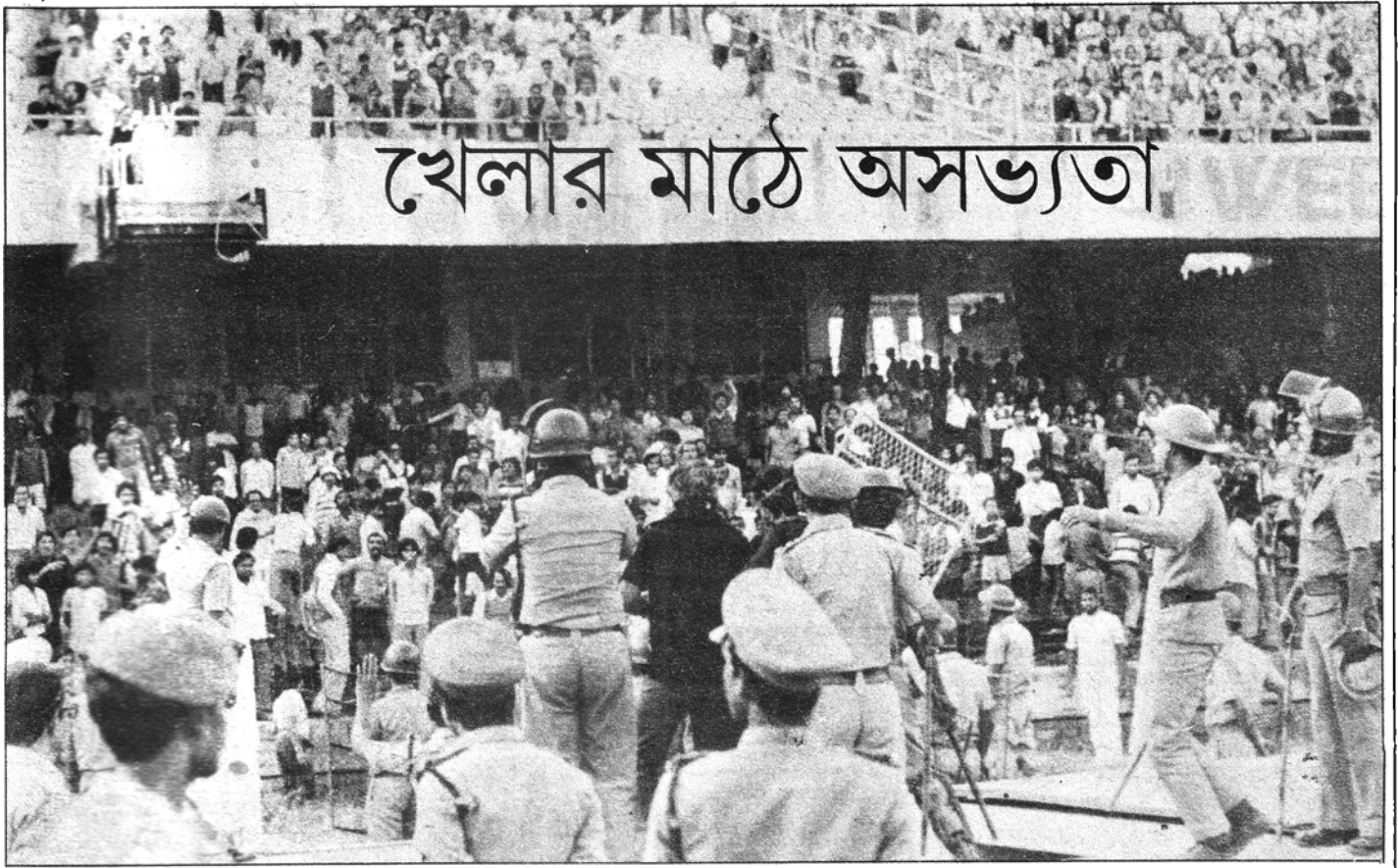
খেলার মাঠে অসভ্যতা

শুক্রবার [illegible] ডিসেম্বর, ১৯৮৬। ক্রীড়াঙ্গনের হাজারো দর্শক খেলা শেষে তখন বাড়ি ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ঠিক সে সময়েই ঘটে গেল আরেক অদ্ভুত খেলা। এ খেলার প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় নয়, সাংবাদিক। ফুটবলার বনাম সাংবাদিকের এ খেলায় ফুটবল ছিল না, ছিল ইঁট-পাটকেল, কিল, চড়, ঘুষোঘুষির একতরফা প্রতিযোগিতা।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন উপচে পড়েছিল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর তুমুল লড়াইয়ের শেষে ফলাফল শূন্য-শূন্য। সমর্থিত দলের সমালোচনা করতে করতে দর্শকরা বেরিয়ে আসছেন মাঠ থেকে। সাংবাদিকেরা ঢুকেছেন ইস্টবেঙ্গলের ড্রেসিংরুমে। সাংবাদিকদের দেখে ফিরেই এমেকা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি শুরু করল। বিকৃত মস্তিষ্কের মত আচরণ করার সাথে সাংবাদিকদের অভদ্রজনোচিত ভাবে বলা হল ড্রেসিংরুমের বাইরে চলে যাবার জন্য। কিন্তু এরপর যা ঘটল, এমন দৃষ্টান্ত ভারতের ফুটবল ইতিহাসে বিরল। ভারত-অধিনায়ক সুদীপ চ্যাটার্জি 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিকের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ ও প্রহার পর্যন্ত চালালেন। আর সুদীপের এই কুকীর্তির সঙ্গী হিসেবে এগিয়ে এল ইস্টবেঙ্গলের বেশ কিছু চেলা-চামুণ্ডা। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, অশ্রাব্য গালমন্দ এবং মারদাঙ্গায় ইডেনের ষোলই আগস্টের কলঙ্কিত দিনটির পুনরাবৃত্তি ঘটল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

কুৎসিতভাবে সাংবাদিকদের বেরিয়ে যাবার কথা বলতেই অবস্থা সামাল দেবার জন্য ক্লাব-সচিব ডাঃ বি.আর. সেনগুপ্ত এগিয়ে এসেছিলেন। তখুনি কিছু চ্যালা-চামুণ্ডা তাঁকেও লক্ষ্য করে বলে— যান যান, এই সব সাংবাদিকদের নিয়ে বাইরে যান।

ভেতর থেকেই তখন নন্দীভৃঙ্গীসহ সুদীপের হুংকার—'এদের মারা উচিত।'

অপমানিত সাংবাদিকরা বেরিয়ে আসছিলেন ড্রেসিংরুম থেকে। সে সময় কোচ শ্যামা থাপা, এবং দুই সিনিয়র ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও বলাই মুখার্জি করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন সাংবাদিকদের কাছে। ড্রেসিংরুমে ফের তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন। সাংবাদিক পার্থসারথি এমেকার সাথে কথা বলা শুরু করতেই সে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি শুরু করল। ম্যাচ চলাকালীন ঠিক যেমন রেফারির কাছে অশ্লীল ভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আর অভিযোগে প্রকাশ, সে সময়েই পেছন থেকে রুদ্রমূর্তিতে মার মার শব্দে তেড়ে এল সুদীপ। গোটা কয়েক চেয়ার ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক। অপ্রকৃতিস্থের মত হাত পা কিল ঘুষি ছুঁড়তে লাগল। রুমের চার দেওয়ালে আছড়ে পড়ছিল সুদীপের হুংকার। ম্যাচ চলাকালীন এমনি উগ্রমূর্তিতে সে বার কয়েক তেড়ে গেছিল সুব্রত ভট্টাচার্যের দিকে। সুদীপ তাতিয়ে দিচ্ছিল সাঙ্গোপাঙ্গোদের—

খেলার মাঠ এখন লাথালাথি, ঘুষোঘুষি, খিস্তি-খেউড় আর গায়ের জোর খাটাবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কোচ, কর্মকর্তা, রেফারি সবাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এমন কি ফুটবলারের দুর্ব্যবহারে ক্রীড়া-সাংবাদিকরা পর্যন্ত অপমানিত হচ্ছেন। উগ্র সমর্থককের উন্মত্ততায় দর্শকের গ্যালারিতে একটা না একটা অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই আছে। পুরনো দিনের খেলোয়াড়দের সেই নীতিনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা আর খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা এখনকার খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছে। খেলার মাঠের বর্তমান হালচাল নিয়ে আলোকপাতের ক্রীড়া সাংবাদিক বিবেক আনন্দের আলোকপাত।

'এদের দেখলেই মারবে। শ্লো দেম, হিট দেম। আমি সঙ্গে আছি।' ভদ্রতার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল অন্য রূপ। ভারত অধিনায়কের এই সভ্যতা বোধ যে কোন দেশেরই লজ্জার কারণ। আর সব চাইতে লজ্জার ব্যাপার অধিনায়কের বিরুদ্ধে খেলার মাঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য থানায় অভিযোগ লেখাতে হয়। সুদীপের বিরুদ্ধে ১২ তারিখেই বিধাননগর থানায় ডায়েরি লেখানো হয়—জি.ডি.ই. নং ৫০৩। পুরো ঘটনা জানানো হয় ২৪ পরগণার এস.পি., আই.এফ.এ. সচিব, এ.আই.এফ.এ. সচিব, জি.ডি. স্বরাষ্ট্র সচিব, মুখ্য সচিব, ক্রীড়ামন্ত্রী, বিশিষ্ট কোচ ও প্রাক্তন ফুটবলারদের। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকেও পর্যন্ত।

শুধু সুদীপ কেন—এমেকাও একই পর্যায়ের। অভিযোগ—'ও তো ফ্রি-স্টাইল রেসলার। ফুটবলের বেসিক এথিক্স পর্যন্ত মেনে চলে না মাঠে। যেনতেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য লাথালাথি ঘুষোঘুষিতেও অনীহা নেই। ১২ তারিখেই সুব্রতর ডান চোখে মেরেছে, সত্যজিতের হাঁটুতে, অমিতের কাঁধে, তনুময়ের ও অলোকের মুখে অসম্ভব মার মেরেছে। বারবার রেফারি সাগর সেনকে উদ্ধত ভঙ্গিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এমন ভাবে যে, যে কোন রেফারির পক্ষে তা অসম্মানজনক।'

কলকাতার খেলার মাঠ দুর্ব্যবহার আর অসভ্যতার মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠছে দিনকে দিন। ফুটবল খেলা আর খেলা থাকছে না, লাথালাথি ঘুষোঘুষির জমাটি আখড়া হয়ে উঠছে। দিকপাল ফুটবলারদের ঐতিহ্য নেই, এক কথায় স্পোর্টিং স্পিরিট এখনকার ফুটবলের মধ্যে থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। সুশোভন বসুর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন মোহনবাগান সমর্থক হেস্টিংস থানায় ডায়েরি লেখালেন জর্জ টেলিগ্রাফের কোচ সুভাষ ভৌমিকের বিরুদ্ধে। দাবি—২৪ ঘন্টার মধ্যে সুভাষকে গ্রেপ্তার না করলে জর্জ টেলিগ্রাফ টিমকে কোনদিন মোহনবাগান মাঠে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কারণ সুভাষ ভৌমিক ও জর্জ টেলিগ্রাফের কয়েকজন খেলোয়াড় মোহনবাগান সদস্য সমর্থকদের গ্যালারিতে উঠে যেভাবে মারপিট করেছেন, তা কোন কোচের সম্মানের পক্ষে শোভনীয় তো নয়ই বরং কলঙ্কময়। সুভাষ ভৌমিক ও জর্জ টেলিগ্রাফের ফুটবলারদের যৌথ আক্রমণে আহত হয়েছেন—বুলু ঘটক, বিপ্লব দাস, প্রদীপ বিশ্বাস ও রবি হালদার। কিন্তু পুলিশ নাকি আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব থেকে তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটে মোহনবাগান মাঠে জর্জ টেলিগ্রাফ বনাম রেলওয়ে এফ সি'র ম্যাচ শেষ হবার পর। সুভাষ এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের ফুটবলাররা মাঠ ছেড়ে বেরোবার মুখে বেশ কিছু সমর্থক সুভাষ ভৌমিকের নামে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকে। গ্যালারি থেকে সারাদিনই গালিগালাজ শুনেও সুভাষ টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা ও স্ত্রী টেনে অশ্লীল গালিগালাজ করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। থমকে দাঁড়ান মুহূর্তের জন্য। জিজ্ঞাসা করেন—কে বলল?

খেলার মাঠের অসভ্যতা

হয়তো ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যেত, যদি গ্যালারির সবাই নীরব থাকত এক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু একজন মাঝবয়সী মোহনবাগানের সমর্থক নিজের বীরত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় এগিয়ে এসে বলে—আমি বলেছি।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন সুভাষ। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় মুহূর্তেই। মোহনবাগান সমর্থকদের অভিযোগ, এর পরেই সুভাষ চোখের সানগ্লাসটা নামিয়ে নিয়ে হাত চালান। আক্রান্ত সদস্যটিকে অন্যরা বাঁচাতে যাওয়ার সিভালরিতে নেমে গেলে জর্জ টেলিগ্রাফের খেলোয়াড়রা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। মোহনবাগান সমর্থকরাও তেমন নিরীহ ভূমিকা পালন করেন নি।

জর্জ টেলিগ্রাফ দলের এক কর্মকর্তা ঘটনার প্রসঙ্গে বলেন—মোহনবাগান মাঠে বেশ কিছু সদস্য, সমর্থক আমাদের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরেই দুর্ব্যবহার করেই আসছেন। শান্ত মিত্র যখন জর্জের কোচ ছিলেন তখনও তাকে চরম অপমানিত করা হয়েছিল এই মোহনবাগান মাঠেই। মোহনবাগানের সেই চিরাচরিত অপমান করার প্রথা থেকেই আজকের এ ঘটনার সূত্রপাত।

মোহনবাগানের উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ সদস্যের প্রায় ১০০ জন, কংগ্রেস নেতা সুশোভন বসুর নেতৃত্বে কার্যত হেস্টিংস থানা ঘেরাও করেন সুভাষ ভৌমিকের গ্রেফতারের দাবিতে।

সুভাষ বলেন—খেলা চলাকালীন আমার উপর চলছিল অকথ্য গালিগালাজ আর টিপ্পনী। আমার মা ও স্ত্রীর নামে ক্রমাগত অপমানকর মন্তব্য

এমেকা এজুগো : ফ্রি-স্টাইল রেসলার?
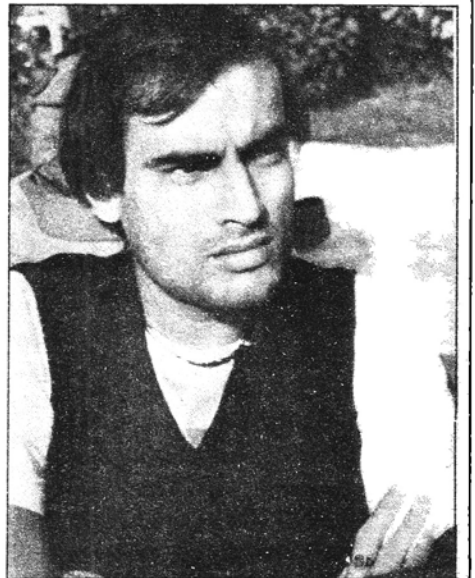
সুদীপ চ্যাটার্জি : মারকুটে অধিনায়ক?

সুব্রত [illegible] ইনিও কম যান না

করে [illegible] বলতে কি এমন অশ্লীল কথা আমার [illegible] জীবনে শুনিনি। যতক্ষণ খেলা চলছিল [illegible] ছিলাম জর্জের কোচ। খেলার শেষে আমি [illegible] একজন। মাথার উপর আধলা ইঁট ছুটে [illegible] মা ও স্ত্রীর সম্মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে যেখানে, [illegible] না করাটাই সেখানে কাপুরুষতা। এককালে [illegible] খেলেছি বলে মা স্ত্রীর সম্মান রাস্তায় বিক্রি করে দিতে হবে? আমার শরীরের রক্ত-টা যতদিন [illegible] হয়ে না যায়, আমার মা ও স্ত্রীকে যে অপমান [illegible] তাকে এভাবেই মারব। সেজন্য জেলে [illegible] আমি প্রস্তুত। বরং সেজন্য গর্বিতই [illegible] মা ও স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট হবে আর আমি [illegible] নিয়ে ধুয়ে খাব? কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে [illegible] উপেক্ষা করা যায়, ঘাড়ে এসে পড়লে তো মেরে [illegible] দিতে হয়। আসলে ডায়রি করা উচিত [illegible] ওদেরই।

[illegible] ফুটবলের হাল দিনকে দিন এই দাঁড়াচ্ছে [illegible] কোচের কোন নিরাপত্তা নেই, ক্রীড়া [illegible] কোন সম্মান নেই, এমন কি রেফারিদের [illegible] একশ্রেণীর ফুটবলাররা তোয়াক্কা করে না [illegible] এথিক্স-এটিকেট নেই, নিয়ম-কানুন [illegible] নেই, খেলার মাঠ গায়ের জোর [illegible] ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কল-কাতার [illegible] সেইসব ফুটবলারদের দিকে আজ [illegible] করুণার চোখে তাকিয়ে দেখে। কারণ [illegible] একটা ভাল শিল্প সে কথাটাই যেন [illegible] বসেছে। খেলার মাঠের অসভ্যতা [illegible] মাঠেই আর সীমাবদ্ধ নেই, [illegible] কুপারেজ স্টেডিয়ামের পুরস্কার বিতরণী [illegible] তার রেশ। এভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে [illegible] ফুটবল মাঠের কিস্সা।

১ ডিসেম্বর ১৯৮৬। সভাতে মাথা নিচু করে বসেছিলেন [illegible] বাগান ফুটবলাররা। কারণ
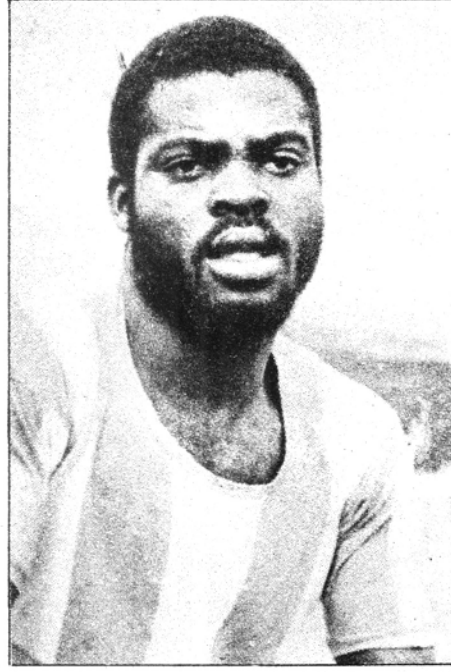
চিমা : একদা বিতর্কের নায়ক

অমল দত্ত

সেদিনের খেলায় তারা ২—০ গোলে শোচনীয়-ভাবে পর্যুদস্ত হয় ব্যাপতিস্ত ডেম্পো দলের কাছে। তাঁদের দিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছুটে আসছিল গ্যালারি থেকে। উড়ে আসছিল ইঁট ও কাঠের টুকরো। মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়ার সময় সুব্রত চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন। একটি ইঁট কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারলেন গ্যালারিতে। অবাক হবার কথা, বাংলার সম্মান রক্ষার দায়িত্ববোধ নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগল না তাঁর কাছে। এখন কিছু কিছু ফুট-বলারদের মধ্যে স্বার্থচিন্তা যতটা, খেলায় নিষ্ঠা তার শতাংশেরও কম। আগে ফুটবলাররা টিমের জন্য প্রাণপণ লড়াই করতেন আর এখন একে অপরকে দোষারোপ ছাড়া কিছুই করতে শেখেন নি। দুই বিখ্যাত কোচ অমল দত্ত এবং পি.কে. ব্যানার্জির কাগজে বিবৃতির লড়াই তারই হালফিল প্রমাণ।

৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬। শনিবার। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের হাতে চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হল মোহনবাগানের কোচ অমল দত্তকে। খেলা শেষ হবার পর ফেরার জন্য তিনি গাড়িতে উঠতেই কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক তাঁকে ঘিরে ধরে। কথায় কথায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ভিড় জমে যায় চারদিকে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা অশালীন ভাষায় আক্রমণ করে অমল দত্তকে। গাড়ির পেছনে বসে থাকা অমল দত্তের সাড়ে সাত বছরের দৌহিত্র হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সুরঞ্জন মল্লিককে চুল ধরে টানাটানি চলে, এমন কি মৃদু চড় চাপড়ও পড়ে তার উপর। দ্রুত গাড়ির কাচ তুলে চালককে গাড়ি নিয়ে পালাবার নির্দেশ দিয়ে সম্মান বাঁচান তিনি। কিন্তু অবাক কাণ্ড! মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এখন কর্মকর্তা ও কোচের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন উঠেছে। ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে মোহনবাগান কোচ, কর্মকর্তা গেলে তাকে অপ-মানিত হতে হবে, এ ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে মাঠের মধ্যেই কর্মকর্তাদের ও সমর্থকদের হাতে খেলোয়াড়কেও মার খেতে হয়। যেমন চিমা।

খেলার মাঠে অসভ্যতা ও দুর্ব্যবহারের জন্য দক্ষ রেফারিরা সম্প্রতি নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একজন নামী রেফারি বললেন—এরপর হরিপদ দাসের মত রেফারিদেরই মাঠে দেখা যাবে। কে আর মার খেতে মাঠে যায়? ভালো রেফা-রিরা এখন যে যার বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবেন সেও ভি আচ্ছা, সি আর দ্র টেন্টমুখো আর হবেনই না।

খেলোয়াড় এবং অন্ধ ও উগ্র সমর্থকদের অসভ্যতায় ক্রীড়া-সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর ঘোষ এবং জয়েন্ট কমিশ-নার কমলেশ রায়ের কথায় পুলিশের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হলেও এবং প্রেসবক্সের সামনে পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করা হলেও ১২ ডিসেম্বরের কলঙ্কিত দিনই প্রমাণ করে দেয় ক্রীড়া সাংবাদিক-দের কেমন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাজ করতে হয়।

ভাবতে অবাক লাগে এ আমরা কোনদিকে এগিয়ে চলেছি। ক্রীড়া যেখানে শিল্প এবং কৃষ্টি, সেখানেই আমাদের ফুটবলারদের চরম অ-খেলো-য়াড়চিত মনোভাব কিভাবে নিজেদেরই শুধু কলং-কিত করছে না বাংলার সম্মান মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে। যে সুদীপ চ্যাটার্জি ভারতের অধিনায়ক-তাঁর বিরুদ্ধে অসভ্যতার অভিযোগে ডায়েরি লেখাতে হয়, পাড়ার ছেলেরা এসে সুদীপের কেলেংকারির কথা শুনিয়ে যায়। এই আমাদের ফুটবল! এই আমাদের নীতিজ্ঞানহীন অধিনায়ক—যার মাথায় ভারত অধিনায়কের মুকুট শুধু বেমানানই নয়, অশোভনীয়। কবে আবার সেই সব নীতিনিষ্ঠ খেলোয়াড়দের ঐতিহ্য আর উদারতার মহিমা নিয়ে বাংলার ফুটবল এগিয়ে আসবে, আমরা প্রত্যেকে তারই অপেক্ষায়।

ছবি : পার্থসারথি, সজল মুখার্জি

সারথির যাত্রাশেষ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পলিসি অ্যাডভাইসরি কমিটি–র চেয়ারম্যান জি পার্থসারথি কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী গান্ধীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। খবর, শেষপর্যন্ত তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রীর 'নেকনজরে' পড়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতেই এই পদত্যাগ।

জওহরলাল নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী–পুরো তিন দশক ধরে পার্থসারথি ছিলেন ভারত সরকারের প্রধান সারির পরামর্শদাতা। দুঃখের বিষয় যে, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহযোগীদের অবহেলা এবং অপমানের জন্যই সরে যেতে হল।

পদমর্যাদায় যদিও তিনি ছিলেন ভারত সরকারের ক্ষমতাশালী অ্যাডভাইসরি কমিটির প্রধান, কিন্তু কার্যত তাঁকে শেষের দিকে ডেক্স–এ বসে স্টাডি পেপার তৈরি ছাড়া আর কোন কাজই দেওয়া হত না। এমন কি সোভিয়েত ব্লকের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত, অভিজ্ঞ শ্রী পার্থসারথিকে মিখাইল গর্বাচেভের সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময়ও কোনরকম দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।

৭৬ বছর বয়স্ক পার্থসারথির শেষ কাজ ছিল গোর্খাল্যান্ডের উপর একটি স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করা। জানা গেছে, তিনি এই রিপোর্টটির সঙ্গেই তাঁর পদত্যাগ পত্রটি পেশ করেন।

দেশদ্রোহী সাংবাদিক?

দেশদ্রোহীতার দায়ে সম্প্রতি দায়ী হয়েছেন দিল্লির উর্দু দৈনিক 'মশরিক-ই আওয়াজ'–এর সম্পাদক আলহজ নাজ আনসারি। টেররিস্ট এণ্ড ডিসরাপটিভ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট–এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী দিল্লি পুলিশ শ্রী আনসারি সম্পর্কে একটি চার্জশীট দাখিল করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি 'খালিস্তানের' স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট লণ্ডন প্রবাসী গঙ্গা সিং ধিলন–এর একটি সাক্ষাৎকার তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করে দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ইন্ধন জুগিয়েছেন। সাক্ষাৎকারটি এর আগে অবশ্য বোম্বাই–এর 'মিড ডে' পত্রিকাতেও ছাপা হয়। পত্রিকা সম্পাদক খালিদ আনসারিকেও অনুরূপ একটি চার্জশীট দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, অবাধ সাংবাদিকতার এই যুগে সরকার বিরোধী কোনও পক্ষের বক্তব্য সংবাদপত্র মারফৎ সরকারকে কিংবা জনসাধারণকে অবগত করার ন্যূনতম স্বাধীনতাও কি ভারতীয় সাংবাদিকদের নেই? শুধুমাত্র একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তির মতামত প্রকাশের দায়ে এদেশে এখনও একজন সাংবাদিক কে দেশদ্রোহীতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়!

প্রধান বিচারপতি

২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬। রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে ভারতের অষ্টাদশ প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন মিঃ জাসটিস রঘুনন্দন স্বরূপ পাঠক। এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি শ্রী জৈল সিং।

উপ রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী, আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মিঃ জাসটিস পি.এন. ভগবতি এবং সুপ্রীম কোর্ট ও দিল্লি হাইকোর্টের বিচারকদের উপস্থিতিতে এই শপথ গ্রহণ কার্য সমাধা হয়। বিচারপতি পাঠক ঈশ্বরের নামে ইংরেজিতে শপথ নেন। প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতি পরলোকগত শ্রী জি.এস. পাঠকের পুত্র মিঃ জাসটিস রঘুনন্দন স্বরূপ পাঠক ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি।

বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মিঃ জাসটিস পি.এন. ভগবতি ভারতীয় আইনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন দিকের সূচনা করেন। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের 'লোক আদালত' গুলিও তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। কিন্তু শ্রী ভগবতির এই প্রয়াস কতটা সুদূরপ্রসারী হবে তা অনেকটাই নির্ভর করছে বিচারপতি শ্রী পাঠকের উপর।

অর্জুনের সুপারিশ

জনগণ যাই বলুক না কেন অর্জুন সিং কিন্তু বর্তমানে তাঁর নতুন দফতর যোগাযোগ–এ বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই দিন কাটাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি প্রতিদিন প্রায় ১০০০টি নতুন টেলিফোনের জন্য লাইনের অনুমোদন করে চলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: শ্রী সিং–এরই অনুমোদন প্রাপ্ত একটি চিঠি নিয়ে একজন সাংবাদিককে সম্প্রতি নিরাশ হতে হয়। টেলিফোন কর্মীরা তাঁকে জানান, এই রকম আরও হাজার দশেক চিঠি তাঁরা পেয়েছেন এবং সযত্নে রেখেও দিয়েছেন। কারণ এত লোককে একসঙ্গে টেলিফোনের লাইন দেওয়া কি সম্ভব?

ফোতেদারের গুরু

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেহরু পরিবারের বিশেষ আস্থাভাজন শ্রী উমাশংকর দীক্ষিত ইদানিং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মাখনলাল ফোতেদারকে নিজের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফোতেদার বর্তমানে সবরকম রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের ব্যাপারে উমাশংকরের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করছেন না। আজকাল প্রায়ই তাঁর গাড়ি দীক্ষিতের বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে।

খবর অনুযায়ী, উমাশংকর দীক্ষিতের নেহরু পরিবারের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণের জন্যই নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী ফোতেদারকে তাঁর অনুগত হতে নির্দেশ দেন। প্রথমদিকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই শ্রী দীক্ষিতের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। কিন্তু সম্প্রতি শারীরিক কারণে শ্রী দীক্ষিত চলাফেরায় অক্ষম হয়ে পড়ায় রাজীব ফোতেদারের মাধ্যমেই তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। জানা যায়, দীক্ষিতের পরামর্শ অনুযায়ীই নাকি পণ্ডিত কমলাপতি ত্রিপাঠীর বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তা না হলে রাজীব তো ত্রিপাঠীজির চিঠির ভাষা দেখে ভীষণ ভাবে চটে উঠেছিলেন। কিন্তু দীক্ষিত প্রধানমন্ত্রীকে বোঝান যে, পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাতে পুরনো কংগ্রেসীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। তাই তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পদত্যাগ করতে রাজী করানোর পেছনেও তাঁর হাতই নাকি বেশি করে কাজ করেছিল।

ভগতের গোঁসা
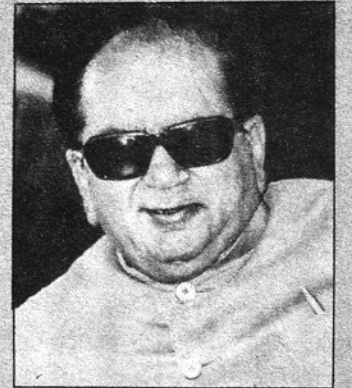
অরুণাচল প্রদেশকে পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা দান সম্বন্ধিয় সংবিধান সংশোধন বিলটি পার্লামেন্টে পাশ হয়ে যাবার পরই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এইচ কে এল ভগত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

জানা যায়, ভগতজীর উপস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী রিপোর্টটি পড়তে শুরু করেন। রিপোর্টটিতে অভিযোগ আনা হয় যে, হুইপ জারি করা সত্ত্বেও ৯২ জন ইন্দিরা কংগ্রেসের সংসদ সদস্য ভোটের দিন পার্লামেন্টে হাজির হন নি। তাই তাদের এই হুইপ লঙ্ঘনের ব্যাপারটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লোকসভার স্পিকার বলরাম ঝাখরের কাছে পাঠান উচিৎ ছিল।

প্রধানমন্ত্রী পুরো রিপোর্টটি পড়ার পর হাসতে হাসতে বললেন, 'কিন্তু ভগতজী স্পিকার মশায় যদি এই অপরাধে ৯২ জন সদস্যকেই লোকসভার সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করেন তবে তো এখনই এই ৯২ টি জায়গাতে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়।'

এতে ভগতজী ভীষণ রেগে যান। বলেন, 'তাহলে আপনিই বলুন কি করা যায়। এর আগে মুসলিম নারী বিল পাশ হওয়ার সময় ৫৩ জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২–এ। অবস্থা যদি এরকমই চলতে থাকে তবে তো হয়ে গেছে।'

এতে প্রধানমন্ত্রী হাসি চাপতে না পেরে বলেন 'কিন্তু মি. ভগত এ ধরনের সমস্যায় মাথা গরম করে কি লাভ? তার চেয়ে বরং আপনি শান্ত হোন। তারপর আসুন সবাই আলোচনা করে এর একটা সমাধান বার করি।'

ভগতজী আর কি করেন–কোনমতে রাগ চেপে গোঁ হয়ে বসে রইলেন।

'শূদ্র' ছত্রপতি
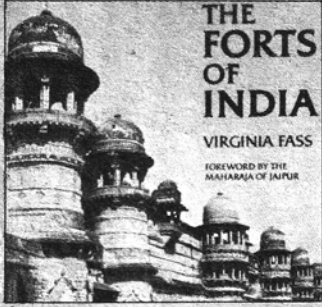
'দ্য ফোর্টস অব ইণ্ডিয়া', ভার্জিনিয়া ফাস–এর এই বইটি সম্প্রতি বোম্বাইয়ের মারাঠী অধিবাসীদের কাছে প্রবল অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রাচীন দুর্গের ইতিহাস এবং বর্তমান নিয়ে লেখা তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ লণ্ডনে বইটির 'স্পনসর' ওবেরয় টাওয়ার গ্রুপকে এজন্য ভারতে অযাচিত মূল্য দিতে হয়। বইটিতে 'ছত্রপতি শিবাজীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে' এই অভিযোগে বি জে পি–র রামদাস নায়েকের নেতৃত্বে একদল বোম্বাইবাসী পদযাত্রা করে পাঁচতারা হোটেল ওবেরয় টাওয়ারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বইটির কয়েকটি কপিও পোড়ান হয়, তারপর মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বইটিতে এক জায়গায় লেখা আছে 'ছত্রপতি শিবাজী ছিলেন অধিকাংশ মারাঠীদের মতই একজন নিচু জাতের শূদ্র'–তাতেই সমগ্র মারাঠী জনগণ ক্ষেপে ওঠেন। পুলিশ অনিবার্যভাবেই হস্তক্ষেপ করে উত্তেজনা প্রশমিত করতে। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো। বোম্বের পার্শীরা যখন টাইম-লাইফ সিরিজের একটি বইয়ে 'সাইলেন্স টাওয়ার'–এর ছবি ছাপা হওয়ায় প্রতিবাদ জানায় ও বইটির ওই অংশে কাল কালি লেপে দিতে বাধ্য করে তখন মারাঠীদের এই অসন্তোষ একান্তই স্বাভাবিক। জানা যায়নি, বইটির ভারতীয় বিতরক রূপা এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কিনা।

মস্তানের রাজনীতি

বোম্বাই 'আণ্ডারওয়ার্ল্ডের' ভূতপূর্ব দিকপাল হাজি মস্তান এখন কিছু রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক আমলা এবং কথিত ক্রিমিনালের সাহায্য নিয়ে উত্তরপ্রদেশে তাঁর পার্টির জন্য রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। কিছুদিন আগে তিনি 'দলিত মুসলিম মাইনরিটিস সুরক্ষা মহাসংঘ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাও করেছেন। তাঁর মতে: এই দলের কাজ হবে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। সম্প্রতি তাঁর এই পার্টির প্রথম কার্যালয়ের উদ্বোধন হয় উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা শহরে। তিনি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে অত্যন্ত সংবেদনশীল উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা, ফৈজাবাদ এবং আজমগড়ের মত জেলাগুলিতেই তাঁর রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে আগ্রহী।

জানা গেছে, তিনি নাকি সমর্থকদের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে অর্থ সাহায্যের মাধ্যমেই তাঁর পার্টির পরিচয় ঘটাতে চান। সমর্থকদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অর্থ সরবরাহের তাঁর এই প্রয়াস প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন জৌনপুর পুলিশের তৎপরতায় ৬.৭২ লক্ষ টাকা সমেত জৌনপুর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দু'টি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, সেই টাকা তারা গোণ্ডা জেলায় বিতরণের জন্য হাজির এক আত্মীয়র কাছ থেকে পায়।

সরকার হাজির এই সব কার্যকলাপ সম্পর্কে যে অবহিত নন, তা নয়। কিন্তু তাঁরা এখনই তাঁর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। কারণ, একতো সংখ্যালঘুত্বের বিতর্কিত প্রশ্নটি, দ্বিতীয়-জনান্তিকে মন্তব্য, সরকারও বোধহয় চান হাজির কালো টাকা এভাবেই দেশের 'মানি মার্কেট'–এ ফিরে আসুক!

সারিকার নতুন শিকার

বোম্বে স্টুডিও পাড়ায় আজকাল সারিকাকে ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। সেই বিমর্ষ ভাবও একেবারে উধাও। সব সময় সঙ্গে থাকছেন একজন কেতাদুরস্ত তরুণ। সারিকার নাকি নতুন শিকার। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি নায়িকার ভূমিকায় সারিকা একটি ফিল্মে সই করেছেন। আরও কিছু ফিল্মের ব্যাপারেও কথাবার্তা চলছে। সারিকার এক বন্ধু বললেন, হীরে যেখানেই থাকুক তাকে চেনা যায়ই–ছাইয়ে কিংবা গলায়। বলা বাহুল্য, ওই তরুণ ভদ্রলোক নাকি সারিকার ছবিতে টাকা যোগাচ্ছেন। কিন্তু বিপরীত ভূমিকায় কে? এই প্রশ্নে বন্ধুটির হাসি রহস্যময় হয় এবং তৎপরতায় 'নট আউট' থাকার ভঙ্গিতে ঠোঁটে হাসি বজায় রেখে বলেন–'ব্যস্ততার কি আছে? হলে! হলে!'

আমজাদের অসুখ

আমজাদ খানের ডাক্তার দু'দিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন আমজাদকে। গত সপ্তাহে একধাপে নাকি তাঁর ওজন পাঁচ কে.জি. বেড়ে গেছে। আমজাদ যে সেই বিছানা ধরেছেন, গত দু'দিন ধরে আর ছাড়েন নি। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার দিকেও কঠোর নজর রাখছেন তিনি নিজেই। কেবল আপেলের সরবৎ-আধসেরি গেলাসের এক গ্লাস–ঘড়ি মিলিয়ে তিনবেলা, ব্যস। অতশত জানতেন না আমজাদের এক বন্ধু। অসুস্থ শুনেই ছুটে এসেছেন একদম বেডরুমে। হাতে মধ্য কলকাতার এক বিখ্যাত ময়রার তৈরি নলেন গুড়ের সন্দেশ। আমজাদ নাকি ভীষণ ভালবাসেন।

আমজাদ খান অত্যন্ত করুণ চোখ মেলে সন্দেশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু ভায়া, সন্দেশে ফ্যাট কতটা থাকে?' বন্ধুবর পেটুক আমজাদের এই প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন, সম্ভবত কোনও নিউট্রিশিয়ানের খোঁজে!

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরাধিকার

এখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির যে ক'জনের মুখের দিকে প্রোজেকটর ঘুরছে, তার পয়লা নম্বরে আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তরুণ নেতা বুদ্ধদেব এ রাজ্যের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী। বুদ্ধিজীবী, তরুণ লেখক, কলাকুশলী, নাট্যকর্মী, হস্তশিল্পীদের কাছে তাঁর ইমেজ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রায় কাছাকাছি। শুধু কি তাই? গোর্খাল্যাণ্ডের সমস্যা, শিলিগুড়ি পার্টি অফিসে জেলা কমিটির বৈঠক আর অগ্নিগর্ভ দার্জিলিং-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের মোকাবিলার উপায় স্থির করার দায়িত্ব বুদ্ধদেবের উপর। সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় তরুণ বুদ্ধদেব। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী হাওয়া পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বুদ্ধদেবেরই। এক কথায় জ্যোতি বসুর পাশাপাশি যাঁকে তৈরি করা হচ্ছে তাঁর নাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। যুব ফেডারেশন থেকে উঠে আসা পার্টির একনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত নেতাকে জ্যোতি বসুর নির্বাচনী সফর সঙ্গী নির্বাচিত করা হয়েছে। বুদ্ধদেবের পূর্ব লড়াই-এর আসন উত্তর কলকাতার কাশীপুর কেন্দ্র থেকে সরিয়ে এনে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কেন্দ্র যাদবপুরে। রাজনৈতিক মহলের দৃঢ় ধারণা নির্বাচনের পর বুদ্ধদেবকেই করা হবে উপমুখ্যমন্ত্রী। উদ্দেশ্য—রাজ্য তথা প্রতিবেশী রাজ্যে বুদ্ধদেবকে লাইমলাইটে আনা। জ্যোতি বসুর বিকল্প হিসেবে বুদ্ধদেবকেই তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পার্টি। গতবার কাশীপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের যে জবরদস্ত নেতা প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হারিয়েছিলেন, তিনি প্রায়ই বলেন—সি পি এমের মধ্যে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখেন আমি সেই বুদ্ধদেবকেই পরাজিত করেছি। শুধু প্রফুল্লবাবুরই নয়, বর্তমান রাজনীতির ছবি যা দাঁড়িয়েছে তাতে এ ধারণাই স্পষ্ট—মুখমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দায়িত্ব নেবার দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বুদ্ধদেব ছাড়া কেউ নন। ■

অধিনায়কের অসভ্যতা!

সুদীপ, মানে সুদীপ চ্যাটার্জি। ভারতের ফুটবলের অধিনায়ক সুদীপ। দুঃখিত। ভুল বলা হয়েছে। সুদীপ, মানে সেই একমাত্র ছেলে যে ফুটবলকে বিষিয়ে দিচ্ছে। সভ্যতা-ভব্যতা শেখেনি জীবনে। সুদীপ সেই ফুটবলার যাদের জন্য ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। সুদীপ রুদ্রমূর্তিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের সামনেই সাংবাদিক পার্থ সারথি ঘোষকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং লাথি ঘুষি পর্যন্ত চালান তাতে ভদ্রতার আলতো প্রলেপটা খসে গিয়ে রঙচটা সমাজ বিরোধী রূপটা বেরিয়ে পড়ল। প্রমাণ হয়ে গেল ভারত-অধিনায়কের রাজমুকুট অপাত্রেই দেওয়া হয়েছে। বিধাননগর থানায় সুদীপের বিরুদ্ধে ডায়েরি করা হয়েছে—জি ডি ই নং—৫০৩। ঘটনা জানানো হয় ২৪ পরগণার এস.পি., আই.এফ.এ. সচিব, এ আই এফ এ সচিব, জি ডি, স্বরাষ্ট্র সচিব, মুখ্যসচিব, ক্রীড়ামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পর্যন্ত। ফুটবল ইতিহাসে এমন কলংকিত ঘটনা খুব বেশি নেই। সুদীপের জানা উচিত গুণ্ডামি করার জায়গা ফুটবল ময়দান নয়। শিষ্টাচারহীন সুদীপের ভারত-অধিনায়ক শিরোপা নিতান্তই অশোভনীয়। ■

রাজনৈতিক সত্যজিৎ!

শেষে সত্যজিৎও গোর্খাল্যাণ্ড বিষয়ে মুখ খুললেন। গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত একটি ইতিমূলক পদক্ষেপে সমাধান করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। কেন্দ্রিয় সরকার দ্বিধাহীন উদ্যোগে ও প্রকৃত দায়িত্ববোধের সাথে এই সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সাথে সহযোগিতা করবেন, এটিই তিনি আশা করেন। ভারতে অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয় এমন কোন ঘটনা বা আন্দোলনকে স্বীকার করা ভারতীয়ের পক্ষে আত্মঘাতের সমান। দেশের কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের বহুবিধ সমস্যা থাকতে পারে এবং সেই সমস্যা সারা দেশেরই সমস্যা—তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা যে কোন ধরনেরই সমস্যা হোক না কেন। জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে এসব সমস্যা সমাধান করতে গেলে সে আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে পড়তে বাধ্য। এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না। আজ পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় যে অস্থিরতা, উন্মত্ত হিংসার রূপ পেয়েছে তা সমগ্র রাজ্য তো বটেই, গোটা জাতীয় জীবনে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি ডেকে এনেছে। যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এতকাল এই অঞ্চলে বজায় ছিল তা সহসা বিঘ্নিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও অপূরণীয় ক্ষতি হতে বাধ্য।

এদিকে সত্যজিতের এই বক্তব্যে রাজ্যের অ-বামপন্থীরা কিছুটা উত্তেজিত। ফিল্ম জগতের প্রবাদপুরুষ বামপন্থীদের দিকে সায় দিচ্ছেন দেখে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন তুলেছেন—সত্যজিৎ তাহলে রাজনীতিতেও? ■

জননেতা থেকে অভিনেতা?

১৯৮৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। আকাশবাণী কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' নাটকটি। শিশির কুমার ঘোষের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অমিয় নিমাই চরিত' অবলম্বনে এই নাটকটির ন্যায়রত্ন চরিত্রে অভিনয় করলেন বর্ষীয়ান এক কেন্দ্রিয় মন্ত্রী। কিন্তু শিল্পীদের নাম ঘোষণার সময় মন্ত্রীর নামের বদলে বলা হল

অজিত ঘোষ। এখানেই শেষ নয়, ওই নাটকটিই প্রচারিত হতে চলেছে দূরদর্শনে। ডিসেম্বরের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে চিত্রায়ন হচ্ছে নাটকটির আর জানুয়ারি ২৭ তারিখে এটি দূরদর্শন থেকে প্রচার করা হবে। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য ওই ৭৪ বছর বয়স্ক মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। দেশের মুক্তি-সংগ্রাম, সমাজ সেবা, পত্রিকা সম্পাদনা, আইন-ব্যবসা, রাজনীতি, গ্রন্থ রচনার সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ হল কেন্দ্রিয় আইন মন্ত্রী অশোক সেনের জীবনে। লণ্ডনে সরস্বতী পূজা প্রবর্তনের মতই অভিনয়ও অশোক সেনকে আরেকবার নজির হিসেবে তৈরি করল। অভিনয় থেকে রাজনীতিতে এসেছেন এমন উদাহরণ দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে সহজলভ্য। এন.টি. রামা রাও, করুণানিধি থেকে সংসদের সদস্য তিন শিল্পী—বৈজয়ন্তীমালা, সুনীল দত্ত ও অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত। কিন্তু জননেতা থেকে অভিনেতা! দৃষ্টান্ত বিরল। প্রমথেশ বড়ুয়ার পর এই বোধহয় দ্বিতীয় নজির। কেন্দ্রিয় আইন মন্ত্রী অশোক সেন এখন অভিনেতা! ৭৪ বছর বয়সে শুরু হল জননেতার অভিনয় জীবন।

ছবি: পার্থসারথি, কল্যান চক্রবর্তি

ALOKPAAT February 1987 RNI No. 036049 Rs. 5.00 per copy